অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য
সম্পাদিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

দ্বিতীয় মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭
তৃতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫৮
চতুর্থ মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৬০
পঞ্চম মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৬৩
ষষ্ঠ মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৬৫
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
প্রচ্ছদপট-শিল্পী
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—হরলাল বর্ধন
বর্ধন প্রেস
৮।৪এ, কাশী ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬
ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

সূচীপত্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে জমিদার বংশে ১৩০৫ সালে, ৮ই শ্রাবণ, (ইংরেজী ১৮৯৮, ২৩শে জুলাই) শনিবার। প্রবেশিকা পাশের পর কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজে আই. এ. পড়ার সময় রাজনৈতিক কারণে পল্লীগৃহে অন্তরীণ। বন্দিদশার অবসানে পুনরায় সাউথ সুবার্বান কলেজে পড়ার চেষ্টা। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য কিছুদিন পরে তাও বন্ধ। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ। ১৯২৪-২৫ সালে ওলাউঠা-বিধ্বস্ত বীরভূমের গ্রামে গ্রামে সেবাব্রতী। চাকুরী-জীবন স্বল্পস্থায়ী. প্রথমে আত্মীয়-পরিচালিত কয়লা-ব্যবসায়ে কলিকাতায়, পরে কানপুরে মাস ছয়েক। সাহিত্য-সৃষ্টির নীহারিকা যুগ কাব্য ও নাটক নিয়ে আরম্ভ। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ত্রিপত্র' কয়েকটি গীতি-কবিতার সংকলন। নাটক 'মারহাট্টা-তর্পণ' স্বগ্রামে সমারোহে অভিনীত হলেও মুদ্রিত হয় নি। প্রথম উপন্যাস 'দীনার দান' সাপ্তাহিক 'শিশিরে' ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত, কিন্তু গ্রন্থাকারে আজো অপ্রকাশিত। প্রথম মুদ্রিত গল্প 'রসকলি', 'কল্লোলে' প্রকাশিত। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে গ্রন্থসংখ্যা বহু। তন্মধ্যে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' শরৎ-স্মৃতি-পুরস্কার লাভে গৌরবান্বিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসখানিকে ১৯৫৪-৫৫ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার দানে সম্মানিত করেছেন। এই বইখানিই ১৯৫৬ সালে সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে স্বল্পভাষী কিন্তু সুবক্তা। সু-অভিনেতা। বৈঠকী আলাপে অতীত যুগের ধারারক্ষী। সাহিত্যই ধর্ম, সাহিত্যই জীবিকা।

ভূমিকা

১

'বসুন্ধরা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিমানসের এক অপূর্ব স্বপ্নকামনার কথা বলেছেন। দেশ-দেশান্তরে সকলের ঘরে-ঘরে জন্ম নিয়ে সর্বলোকসনে স্বজাতি হয়ে থাকার ইচ্ছা সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। 'অরণ্য বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা'কেও তিনি ভালবাসতে চেয়েছেন। এমন কি অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল-বজ্রের-মত দীপ্তোজ্জ্বল দেহ নিয়ে হিংস্র ব্যাঘ্র যখন বিদ্যুতের বেগে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তার সে অনায়াস-মহিমা, হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত-গরিমারও স্বাদ একবার নিতে তাঁর ইচ্ছা হয়েছে। এমনি করে বিশ্বের সকল পাত্র হতে নব-নব স্রোতে আনন্দমদিরাধারা পান করার কবিকামনা ভাষা পেয়েছে এই অবিস্মরণীয় কবিতায়। কিন্তু এই নির্বিশেষ জীবনরস-রসিকতা বিশ্বকবির কল্পনায় স্থান পেলেও তাঁর কবিজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে সর্বাংশে সত্য হয়ে ওঠেনি। গোধূলি লগ্নের কাব্যে তাই তিনি অতৃপ্ত ক্ষোভের সঙ্গেই স্বীকার করে গেছেন, সমাজের উচ্চমঞ্চে সঙ্কীর্ণ বাতায়নে বসে বিপুলা এ পৃথিবীর ঐকতানে জীবনে জীবন যোগ করা সম্ভব হয় না।

বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উত্তর-সাধকগণ কিন্তু সমাজের উচ্চমঞ্চের সংকীর্ণ বাতায়ন থেকে নেমে এসেছেন একেবারে মাটির বুকে। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের নগরে-প্রান্তরে শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে যারা চিরকাল কাজ করে—দাঁড় টানে, হাল ধরে থাকে, মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—তাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আজকের সাহিত্য। সাহিত্যের এই নিঃশব্দ পটপরিবর্তন এ যুগের এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম দিকপাল

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমাজের উচ্চমঞ্চের অভিজাত-শ্রেণীরই সাহিত্য। রাজপুত ও নবাবদের ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে সামাজিক স্তরে নেমে আসার পরও তিনি পল্লীর অভিজাতকুলের কথাই বিশেষ করে বলেছেন। ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথ 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা, নিতান্তই সহজ সরল' কাহিনীর মধ্য দিয়ে পল্লীজীবনের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখকে ভাষা দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বাধিষ্ঠানক্ষেত্র প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর প্রাসাদশ্রেণীতে। তাই রবীনাথের উপন্যাসে নাগরিক অভিজাতদের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রেই প্রথম ভিড় করে এল সাধারণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারা অনুসরণ করে উপন্যাসে শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত সমাজের কাহিনীকেই উপজীব্য করলেন। তার পরে এল প্রথম-সমরোত্তর-কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির অধ্যায়। সাহিত্যের রাজপথে শুরু হল অভদ্র ইতরজনের আনাগোনা। সমাজের সবচেয়ে নীচের তলার-মানুষ সরস্বতী-মন্দিরের নিষিদ্ধ-পথে প্রবেশের অধিকার পেল। নগরকেন্দ্রিক অভিজাত-সাহিত্য বিকেন্দ্রিত হল সুদূর পল্লীর অখ্যাত-জনের মাটির কুটিরে।

এমনি দিনে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় দেখা দিলেন তারাশঙ্কর। কৃষাণের জীবনের শরিক, কর্মে ও কথায় তাদের সত্যকারের আত্মীয়; শুধু মাটির কাছাকাছিই নন, একেবারে মাটির বুক থেকেই উঠে এলেন তিনি। এল 'চৈতালি-ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ'। ক্ষয়িষ্ণু পল্লীর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠল সাহিত্যে। কিন্তু শুধু খণ্ডচিত্রই নয়, সমগ্র-ভাবেই তিনি পল্লীবাংলার রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। শুধু তার দারিদ্র্য ও দীনতাই নয়, তার ঐশ্বর্য ও মহিমাকেও তিনি আবিষ্কার করলেন। এ দিক দিয়ে তাঁর 'জলসাঘর' বাংলার গ্রামজীবনের এক অনাবিষ্কৃত মহলের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করল। জলসাঘরে সামাজিক ইতিহাসের এক বিলীয়মান স্বর্ণদিগন্ত। যে রাজোচিত ঐশ্বর্য একদিন বাংলার জীবনে একান্ত সত্য ছিল, তারই অস্তরশ্মি হৃতসর্বস্ব বাঙালীর চোখে এক অবোধপূর্ব বিস্মৃত-স্বপ্নের অঞ্জন পরিয়ে দিলে। অল্পদিনের ব্যবধানেই তারাশঙ্কর লিখলেন 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী'। এবার বাংলা তথা ভারতের সামন্ততান্ত্রিক-

সমাজের চিত্র পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠল। সসাগরা পৃথিবী বিজয়ে বেরিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছিল এই তো ছিল তার সমাজের গড়ন। এ সমাজ একান্তভাবেই সামন্ততান্ত্রিক। ভূস্বামী বা জমিদারেরাই তার সার্বভৌম অধিপতি। সমাজের সর্বস্তরেই তাঁদের অপ্রতিহত প্রভাব। তাঁদের জীবনকে কেন্দ্র করেই সমাজ-জীবন স্পন্দিত ও আবর্তিত হয়েছে। ভারতে ব্রিটিশ-আধিপত্যের সঙ্গে-সঙ্গে এই সব পল্লীসম্রাটের সামনে এসে দাঁড়াল ধনগর্বিত নাগরিক শ্রেষ্ঠী। বাধল সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর সংঘাত। সে সংঘাতে নবোদিত ধনিকশক্তির হাতে ঘটল সামন্ততন্ত্রের পরাজয়। সাম্রাজ্যবাদী বণিকের উদ্ধত রথচক্রতলে ভারতীয় সমাজ-জীবনের প্রাণকেন্দ্র গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। ভেঙে পড়ল ভারতের পল্লীসমাজ। বিদেশীয় পণ্যশালার ঐশ্চর্যগর্বে একদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল নগরের প্রাসাদমালা, অন্যদিকে পরাজয়ের চরম-গ্লানি বহন করে অনিবার্য ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলল ভারতের গ্রামীণ সভ্যতা। এতদিন বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ছিল নবগঠিত নাগরিক জীবনের সুখদুঃখের মধ্যে। কিন্তু দুশো বছরের বিদেশী-শাসনের অভিশাপ যে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশের ভিত্তিমূল পর্যন্ত ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, সে সর্বনাশের দিকে প্রবুদ্ধ দৃষ্টির অভাব ছিল। তারাশঙ্করের রচনা এই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ভারতের শেষ-দীর্ঘনিশ্বাসে অশ্রুসজল।

আধুনিক যুগে আঞ্চলিক সাহিত্যের পথিকৃৎ হলেন শৈলজানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের আঞ্চলিক সাহিত্য ব্যাপকতা ও পূর্ণতা পেয়েছে। উত্তর রাঢ়ের মাটি ও সমাজ ঐ অঞ্চলের মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে তাঁর রচনায় অবিনশ্বর হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'কালিন্দী' পর্যন্তও তাঁর দৃষ্টি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এ তিনি শুরু করলেন সাহিত্যের নতুন অধ্যায়। একটি বিরাট জনপদের পটভূমিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক জীবনের রূপ উপন্যাসের বিপুল আয়তনে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। বৈচিত্র্যে, বিশালতায় ও সামগ্রিকতায় তা মহাকাব্যের সঙ্গেই তুলনীয়। রাঢ়ের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তারাশঙ্করের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও নিবিড় আত্মীয়তার ফলে বাংলার এই বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক রূপও এক

অভিনব রসমূর্তি নিয়ে সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা এবং সামাজিক ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনীও রসের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। বস্তুত তারাশঙ্করের 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' বাংলার পল্লীজীবনের মহাকাব্য। তারও পরে 'পদচিহ্ন'-এর পথ ধরে আজ তিনি আমাদের কথাসাহিত্যকে যেখানে পৌঁছে দিলেন সেখানে ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখ নয়, এক বিপুলায়তন জনপদের লক্ষ মানুষের জীবনের কলধ্বনি তাতে শোনা যাচ্ছে। মাটির গন্ধ ও ঘ্রাণ এসেছে সাহিত্যে। প্রকৃতির প্রাণলীলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত হয়ে নতুন রূপ খুলেছে মানুষের। সাহিত্যের স্বাদ গিয়েছে বদলে। বাংলা সাহিত্যের তাই তারাশঙ্কর এক নতুন অধ্যায়।

কিন্তু তাঁর জীবনান্বেষণ ক্লান্তিহীন। তিনি ক্রমশই সমাজ-জীবনের আরো নিম্নে আরো গভীরে তলিয়ে গিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের উদার আমন্ত্রণের ফলেও যে সব ব্রাত্য ও গোত্রহীন মানুষকে সমাজ-গণ্ডির ভিতরে আনা সম্ভব হয় নি, অথচ যারা এই দেশেরই মাটির বুকে যুগ যুগ ধরে লালিত হচ্ছে, তাদের আদিম অসংস্কৃত প্রকৃতি নিয়ে একেবারে মাটির সঙ্গেই মিশে আছে, তাদেরও তিনি সাহিত্যের আঙিনায় আহ্বান করেছেন। ডোম-বাউরী, বাগদী-কাহার, বেদে-সাঁওতালেরা এই নতুন সাহিত্যের নায়ক হয়েছে। 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা'-য় তাদের অন্ত্যজ-জীবনের সঙ্গে রসিকজনের আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপুলা এ পৃথিবীর ঐকতানে জীবনে জীবন যোগ করার কবিস্বপ্ন চরম সার্থকতায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

২

তারাশঙ্করের সাহিত্যে এই আপামর মানবসাধারণের আবির্ভাবের মূলে একদিকে যেমন রয়েছে তাঁর সামগ্রিক জীবনবোধ, অন্যদিকে তেমনি আছে মানবের জীবনমহিমার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি। সহজ-সাধনের কবি চণ্ডীদাস একদিন যে প্রসঙ্গে 'সবার উপরে মানুষ 'সত্য'—এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গকে

অক্ষুণ্ন রেখে তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্পর্কেও বলা চলে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। মানুষেরই জীবন সর্বকালে সাহিত্যের উপজীব্য হলেও জীবন সম্পর্কে শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই সাহিত্যে মানুষের নতুন পরিচয়, জীবনের নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। বাংলার কথাসাহিত্য একশ বছরও অতিক্রম করে নি, কিন্তু এরই মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টিবদলের ফলে জীবনের মূল্যবদলের চিহ্নও তার মধ্যে সুপরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনামূলে ছিল জীবনের শিবচেতনা। এই শিববোধের ভিত্তিতে ন্যায়-অন্যায়, নীতি-দুর্নীতির মাপকাঠিতে গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনমূল্য। তাই তাঁর কল্পনায় প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে 'নৈতিক মানুষ' বা ethical man। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্বপ্নে ধরা পড়েছে সুন্দরের লীলা। তিনি আবিষ্কার করলেন 'রসিক মানুষ' বা Esthetic manকে। শরৎচন্দ্রের কল্পনামূলে আছে 'প্রেমিক মানুষ' বা emotional man। শরৎ-পরবর্তী শিল্পিমানস দেখেছে জৈবিক মানুষকে, অর্থ নৈতিক মানুষকে, জেনেছে, এই উভয়েরই সংমিশ্রণে সামাজিক মানুষের সত্তা। বঙ্কিমচন্দ্র নৈতিকতার শক্ত দেওয়াল গেঁথে আদর্শ মানবতার যে-মন্দিরে মানুষের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন, রবীন্দ্রনাথই প্রথম সে মন্দিরের দেওয়ালে আঘাত হানলেন তাঁর 'নষ্ট-নীড়', আর 'চোখের বালি'তে। নীতির দেওয়াল ভেঙে পড়ল, বড় হল সৌন্দর্যবোধ। মানুষের আচার-আচরণে সুন্দর-অসুন্দরের বিচারই প্রধান হয়ে উঠল। রসিক-মানুষের হল জয়। শরৎচন্দ্র এলেন আর একটু এগিয়ে। 'ভাবে অবশ হৈয়া, হরি হরি বোলাইয়া' তিনি 'আচণ্ডালে প্রেম' বিলিয়ে দিলেন। সুন্দর-অসুন্দরের মাপকাঠি তিনি মানলেন না, প্রেমের দৃষ্টিতে সুন্দর-অসুন্দরে ভেদাভেদ নেই ; প্রেম অসুন্দরকেও সুন্দর করে। তাঁর দৃষ্টিতে তাই মেসের ঝি সাবিত্রীর প্রণয়াকর্ষণও শ্রদ্ধা পেল, শ্রদ্ধা পেল বারবধূ চন্দ্রমুখী আর পিয়ারী বাইজী। কিন্তু যে প্রেমকে মহিমান্বিত করে শরৎচন্দ্রের জীবনকল্পনা, আধুনিক যুগ সে প্রেমেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে খুঁজে পেল মানুষের জৈব প্রবৃত্তিকে। যে দুটি আদিম প্রবৃত্তির বশে মানুষের জীবজীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—তার সমস্ত সুখদুঃখ ও আচারআচরণের মূলে সেই প্রবৃত্তিদ্বয়েরই বিশ্লেষণ মুখ্য হয়ে উঠল এ যুগের সাহিত্যে।

তারাশঙ্কর জীবনে এই প্রবৃত্তির লীলাকে স্বীকার করেন। এই প্রবৃত্তিরই আকার ও প্রকারভেদে ব্যক্তির স্বভাব ও চরিত্রের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন দেহের পাত্রে জীবনের বিচিত্র রস ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে ও বর্ণে সঞ্চিত ও ক্ষরিত হতে থাকে। কিন্তু তারাশঙ্করের দৃষ্টি জীববিজ্ঞানীর দৃষ্টি নয়, জীবনসত্য তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েনি, ধরা পড়েছে তাঁর তৃতীয় নয়নের সম্মুখে এক রহস্যময় উন্মেষণ-লীলার মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রাতিভ-দৃষ্টিতে সকল জীবনের মধ্যেই তিনি একই দুর্জ্ঞেয় জীবনশক্তির রহস্যলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রবৃত্তিরূপে প্রকাশিত মানুষের জীবনে এই জীবনীশক্তিকেই তিনি পূর্ণস্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি, সুন্দর-অসুন্দরের সমস্ত খণ্ডিত চেতনার ঊর্ধ্বে। যাকে সুন্দর বলি তাও যেমন এই শক্তিরই লীলা, যাকে বীভৎস বলি তার মধ্যেও এই একই শক্তির প্রকাশ। মধুরে ও মনোহরে যেমন এই শক্তি, ভীষণে ও ভয়ানকেও এই একই শক্তি। সর্বঘটে এই শক্তির লীলাকে স্বীকার করে নিলে জীবনে বর্জনীয় আর কিছুই থাকে না। তারাশঙ্করের সাহিত্যে এই অখণ্ড মানবজীবনই স্বমহিমায় প্রকাশিত। ভালমন্দ-বোধের ব্যক্তিসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি জীবনকে তার আপন স্বরূপে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই সর্বাত্মক জীবন রস-রসিকতাই তারাশঙ্করের সাহিত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এবং এ কারণেই তাঁর হাতে কোমলে কঠোরে বিচিত্র রসপরিবেশন সম্ভব হয়েছে। এ দিক দিয়ে শরৎচন্দ্র থেকে তারাশঙ্করের সাহিত্যের কি বিপুল পরিবর্তন! শরৎচন্দ্র কেবল কোমল, কেবল মধুর। জীবনের রসতীর্থে তিনি বৈষ্ণব-পন্থী। তাই বাৎসল্য ও মধুর রসই তাঁর সাহিত্যের মুখ্য রস। তারাশঙ্করের চিত্তবৃত্তি নয়, মানুষের ধাতু-প্রবৃত্তিরই দুর্দমনীয় বিকাশ। তাই তাঁর রচনায় মধুর ও করুণ-রসের সঙ্গে রৌদ্র, ভয়ানক, এমন কি বীভৎস-রসও সমান মর্যাদা পেয়েছে। শরৎচন্দ্রে জীবনের রাধিকামূর্তিরই আরাধনা, তারাশঙ্করের আরাধ্য জীবনের বিভীষণা নগ্নিকা কালিকামূর্তি।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি। এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই, অমোঘ নিয়তির অনিবার্য পরিণামকেও এড়িয়ে যাবার কোন শক্তি নেই তার। এই প্রবৃত্তিরূপিণী নিয়তির কাছে মানুষের অসহায়তাবোধের মধ্যেই তাঁর সাহিত্যের ট্রাজেডির স্বরূপ-লক্ষণ নিহিত। জীবনে সে-নিয়তির লীলা কখনো পরিদৃশ্যমান, কখনো অপরিমেয়। কখনো তা কার্যকারণ-পরম্পরায় গ্রথিত, কখনো একেবারেই জীবনরঙ্গমঞ্চের কৃষ্ণ-যবনিকার অন্তরালবর্তিনী। তারাশঙ্করের দৃষ্টি জীবনের অতলান্ত গভীরতায় তলিয়ে এই নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত চিরন্তন জীবন-রহস্যেরই সন্ধান করেছে। বিশ্লেষণ নয়, ব্যাখানও নয়; রহস্যের গ্রন্থিমোচনমাত্র। এই গ্রন্থিমোচনই জীবনশিল্পীর চিরকালের চেষ্টা। জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-কবলিত জীবনে যে মহাভয় মানুষের নিত্যসঙ্গী মানব-সাধারণের অনিবার্য পরিণাম প্রত্যক্ষ করে হতভাগ্য মানুষের প্রতি পরম-করুণায় বিগলিত হয়ে সেই মহাভয়কে জয় করার সাধনাই সর্বকালের মহৎ সাহিত্যের সাধনা। তারাশঙ্করের সাহিত্য এই মহৎ সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত।

উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'তারিণী মাঝি' গল্পটিকেই প্রথম গ্রহণ করা যেতে পারে। ময়ূরাক্ষীর গন্টিয়া ঘাটের পারাপারের মাঝি তারিণী। ময়ূরাক্ষী বৎসরের অধিকাংশ সময়ই মরুভূমির মত। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে রাক্ষসীর ন্যায় ভয়ঙ্করী। খরস্রোতা নিয়তির মতই সে ক্রূর হাস্যে প্রবাহিত হয়। তারিণী মাঝিও যেন এই নদীরই মানুষ; নদীর প্রাসাদেই তার জীবন; 'জলের শরীর তার, রোদে টান ধরে, জল পেলেই ফোলে।' শুধু তাই নয়, ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর গ্রাস থেকে নিমজ্জমান মানুষকে উদ্ধার করতেও সে অদ্বিতীয়। জলতলে কোথায় কোন মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে, তারিণী অবলীলাভরে খরস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাকে তুলে আনছে। তারিণীর তারিণী-নামটি যেন অক্ষরে অক্ষরে সার্থক। গল্পটি এই তারিণী মাঝিকে অবলম্বন করেই মানবজীবনে নিয়তির এক নির্মম পরিহাসের রহস্য উন্মোচন। সংসারে আপন বলতে

তারিণীর আছে একটি-মাত্র মানুষ,—তার স্ত্রী সুখী। পরম নির্ভরতায় সুখী তারিণীকে আঁকড়ে আছে। সুখে-দুঃখে এই দম্পতির জীবন চলে যাচ্ছিল। অবশেষে এল অগ্নিপরীক্ষার চরম মুহূর্ত। ময়ূরাক্ষীতে এল বন্যা। সে বন্যার জলে দিগ্‌দিগন্ত গেল ভেসে, তারিণীর ঘরও গেল তলিয়ে। এই সর্বনাশের মুখেও সুখী কিন্তু পরম ভরসায় স্বামীকে আশ্রয় করে আছে। তারিণী সুখীকে পিঠে চাপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্যার জলে। সাঁতরে চলেছে দুজনে। অকস্মাৎ রাক্ষসী ময়ূরাক্ষীর গ্রাসে পড়ল তারা। জলের ঘূর্ণিতে পড়ে পাক খেতে খেতে অতলে তলিয়ে যেতে লাগল দুজনে। মৃত্যু সুনিশ্চিত। তারিণী সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সুখীর পরম নির্ভরতা নাগপাশের মতই তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

'সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরো জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস—বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ! হাতের মুঠিতে তার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ—বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, 'আলো ও মাটি'।

এ গল্পে একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেম আর আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে পরম-নিষ্ঠুর জীবনসত্যের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির হাতে মানুষের প্রেমনির্ভরতার চরম পরাভবের ট্রাজেডিই এ গল্পের উপজীব্য। নিয়তির লীলা-রহস্য একেবারে অন্তিম মুহূর্তে একাগ্র অনিবার্যতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। জীবনের বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে ঘটনা-পরম্পরায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে অকস্মাৎ বিদ্যুৎবিকাশের মত জীবনসত্যের উন্মেষই ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। এদিক দিয়ে 'তারিণী মাঝি' ছোটগল্পের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ।

কিন্তু এই গল্প শেষ করে যে নৈরাশ্য, যে হতাশা পাঠকচিত্তকে আবিষ্ট করে তোলে তারাশঙ্করের দৃষ্টি সেইখানেই একাগ্রীভূত, এ

সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে। প্রকৃতির লীলা-রহস্যের একটা দিকমাত্রই এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে। এ গল্পে যেমন আত্মরতিই জয়যুক্ত হয়েছে, তেমনি আসঙ্গ-লিপ্সাও পরম-তৃষা হয়ে মানুষকে মানুষের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, প্রকৃতির এ সত্যকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। 'তমসা' গল্পে প্রকৃতির এই অপর দিকেরই রহস্যময় প্রকাশ। অন্ধ-ভিখিরী-ছেলে পক্ষী! 'কুৎসিত চেহারা, চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট অশক্ত।' সব কিছু মিলিয়ে বীভৎসতার প্রতিমূর্তি যেন। কিন্তু এই বীভৎস মানবকটির অন্তরে যে পরম-তৃষা লালিত হয়েছে তাই বীভৎসকে করেছে সুন্দর, অন্ধকে করেছে চক্ষুষ্মান। অন্ধ পক্ষী গান গায়, 'চোখে ছটা লাগিল, তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।' অন্ধের পৃথিবী শব্দ আর স্পর্শময়। সুরের মাধ্যমেই সে ধরতে চায় প্রাণকে, স্পর্শের মধ্যে পেতে চায় সুন্দরকে। এই শব্দস্পর্শের মধ্যেই পক্ষীর জীবনে এল খেমটা নাচের দলের এক তরুণী নাচনেওয়ালী। তারও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার মধ্যে তার অজ্ঞাতসারেই লালিত হচ্ছে সুরময় সুন্দরের সাধনা। তাই তারও কণ্ঠে গান, 'কালা তোর তরে কদমতলায় বসে থাকি'। যে তৃষা পক্ষীর অন্ধ চোখে রূপের ছটা লাগিয়ে দেয়, সেই তৃষাই তরুণীর প্রাণে কালার জন্যে আজীবন প্রতীক্ষা রচনা করে চলে। 'তারিণী মাঝি' গল্পে অন্ধ আত্মরতির আবেগ-তাড়নায় যদি বিশ্বাসের আলো নির্বাপিত হয়ে থাকে, তবে 'তমসা' গল্পে বীভৎস অন্ধকারের পরপারে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলন-তৃষার জ্যোতির্ময় বাসনা।

'নারী ও নাগিনী' গল্পে এই জীবন-সত্যেরই আরো বিস্ময়কর প্রকাশ নাগিনীর প্রতি পুরুষের রহস্যময় আকর্ষণের মধ্য দিয়ে। সাপের ওঝা খোঁড়া শেখ। শুধু পাখানিই তাঁর খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে তার নাকটা বসে গিয়ে সেখানে দেখা দিয়েছে এক বীভৎস গহ্বর। ঐ বীভৎস মুখে বসন্তের দাগ খোঁড়ারকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। তার জীবিকাও তার ভয়ঙ্কর রূপেরই উপযুক্ত। খোঁড়া শেখ সাপ নিয়ে খেলা করে। শুধু খেলাই নয়, সাপকে সে ভালও বাসে। ভোরবেলা পূর্বাকাশে প্রাতঃসূর্যের রক্তাভায়

উদয়নাগের নৃত্য তাকে মুগ্ধ করে। সর্পদেহের রক্তবর্ণের মধ্যে তার ফণার ঘনকালো চক্রচিহ্ন প্রজাপতির রাঙা পাখনার মধ্যে কালো বর্ণলেখার মত মনোরম হয়ে দেখা দেয় তার চোখে! কিশোর সর্পটির রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে যখন সে জানতে পারে যে, এটি সর্পিণী, তখন তার মনে এই সর্পিণীর প্রতি এক অদ্ভুত জৈব আসক্তি দেখা দেয়। নাকে অলংকার পরিয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর দিযে সে এই সর্পিনীকে নিকে করে। তাকে গলায় ঝুলিয়ে, হাতে জড়িয়ে সে আলিঙ্গনের সুখ আস্বাদন করে, আদর করে তার ঠোঁটে চুমু খায়। ওঝার জীবনে নারীর প্রতি আসক্তি তার স্ত্রী আর এই সর্পিণীর মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দেখা দেয। ওঝার স্ত্রী জোবেদা ওঝার 'জানের চেয়ে বেশি', কিন্তু স্বামীর এই অস্বাভাবিক আসক্তি দেখে সর্পিনীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়! নাগিনী প্রতিহিংসা গ্রহণ করে জোবেদাকে দংশন করে। স্ত্রীর মৃত্যুশিযরে বসে ওঝার চোখে জল উপচে 'ওঠে, কিন্তু একজন ওস্তাদ যখন বলে যে, সাপটি হয়ত তাকেই কামড়াতে এসেছিল, তখন সে পরম বিশ্বাসে তা করে অস্বীকার। সর্পিণীও ভালবাসায় বশীভূত হয়, হিংসাই তাকে হিংস্র করে তোলে। এই গল্পে তারাশঙ্কর ঘৃণালজ্জাহীন জৈব আসক্তির এক নতুন সুর আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু 'কালাপাহাড়' গল্পে এই আসক্তি অস্বাভাবিকতার স্তর থেকে উন্নীত হযেছে বলিষ্ঠ স্বাভাবিকতায়। রংলাল সম্পন্ন চাষী; গরু-মোষের প্রতি তার আসক্তি সঙ্গত ও স্বাভাবিক। সর্বাঙ্গসুন্দর গরু না হলে সে তৃপ্ত হয় না; চাষের গরুর কাঁচা বয়স হবে, হবে বাহারের রং, সুগঠিত শিং, সাপের মত ল্যাজ। হাটে গরু কিনতে গিয়ে রংলাল কিনে নিয়ে এল একজোড়া মোষ। নিকষের মত কালো, একই ছাঁচে ঢালা, যেন যমজ শিশু। সে মোষ-দুটোর নাম দিলে 'কালাপাহাড়' আর 'কুম্ভকর্ণ'। এদের সাহায্যে নতুন কৃষির রূপ তার মানস-নয়নে ভেসে উঠল—

'মাটির নিচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।'

যাদের কল্যাণে ক্ষেতের বুকে লক্ষ্মীর আসন পাতা হবে তাদের প্রতি রংলালের আসক্তি স্বাভাবিক, কিন্তু দৈত্যের মত জন্তু-দুটিও পোষ মানল রংলালের। সুখে দুঃখে কেটে গেল তিন বৎসর। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় মানুষ ও জন্তুর এই সখ্য হল খণ্ডিত! রংলাল নদীর ধারে মোষ চরাতে গিয়ে পড়ল চিতাবাঘের আক্রমণের মুখে। কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণ ই সেদিন তাকে রক্ষা করলে। কিন্তু প্রভুকে বাঁচাতে গিয়ে কুম্ভকর্ণকে দিতে হল প্রাণ। মৃত্যুসময়ে কুম্ভকর্ণের শেষ দৃষ্টি রংলালের দিকে; চোখ বেয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়ছে। রংলাল বালকের মত কেঁদে উঠল। কিন্তু বিপদ হল কালাপাহাড়কে নিয়ে। বন্ধুর শোকে সে অবিরাম চিৎকার করে আর কাঁদে। বিপর্যস্ত হল রংলালের চাষবাস। কালাপাহাড়কে সে ভালবাসে, কিন্তু চাষ বন্ধ হয়ে যে সমূহ ক্ষতি হল, তার মূল্য যে হিসেব নিকেশের বাইরে। বাধ্য হয়েই রংলাল কালাপাহাড়কে এক পাইকারের কাছে বিক্রয় করে এল।

গল্পের উপসংহার যেমন নাটকীয় তেমনি চমকপ্রদ। লেখক এই সখ্যবন্ধনের গ্রন্থিমোচন করতে গিয়ে একেবারে কালাপাহাড়ের চেতনায় অনুবিষ্ট হয়ে গেছেন। পাইকারের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে কালাপাহাড় উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে। কোথায় তার ঘর, কোথায় রংলাল! উন্মাদনায় পথ ভুল হল তার, চলে এল শহরের বুকে। তার উদ্দাম তাণ্ডবে বিঘ্নিত হল শহরের শান্তি। হঠাৎ তার দিকে এগিয়ে এল এক অপরিচিত জানোয়ার। একদিন প্রভুর জীবন রক্ষা করতে গিয়ে কালাপাহাড় চিতাবাঘের সম্মুখীন হয়েছিল। আজো প্রভুকে খুঁজতে এসে সে এই জানোয়ারের সম্মুখীন হল। প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হল সে তার দিকে। 'কিন্তু তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না; কিন্তু অত্যন্ত কঠিন যন্ত্রণা মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।' কালাপাহাড়ের অপরিচিত জানোয়ারটি আসলে রিভলবারধারী পুলিশ-সাহেবের মোটরগাড়ি। হতভাগ্য কালাপাহাড় রংলালকে আর খুঁজে পেল না, তার প্রেমোন্মত্ততার প্রত্যুত্তর এল নগরপালের গুলিতে। বাংলা সাহিত্যে 'কালাপাহাড়ে'র একটিমাত্র তুলনা শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'।

৪

'অগ্রদানী' গল্পে নিয়তির লীলা কার্য-কারণ-পরম্পরায় সুগ্রথিত। উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তী। জীবনের সর্বরস তার রসনাতেই একাগ্রীভূত হয়েছে। সাড়ে ছফুট লম্বা তার চেহারা দেখে সবাই যখন তাকে মই-এর সঙ্গে তুলনা করে ঠাট্টা করে, তখন সে উত্তর দেয়, মই তো বটেই, কাঁধে চড়লে স্বর্গে যাওয়া যায়। 'বেশ পেট ভরে খাইয়ে দিলেই, বাস্, স্বগ্‌গে পাঠিয়ে দোব।' উক্তিটি রসিকতা-মাত্রই নয়, এই একটি বাক্যের মধ্যেই যেন পূর্ণ চক্রবর্তীর জীবনের মূলসূত্রটি বিধৃত হয়েছে। ভোজনলোলুপতা তার প্রবৃত্তি নয়, একেবারে ধাতু-প্রকৃতি হয়ে উঠেছে। আহারের লোভে সে যে-কোনো কাজই করতে পারে। ব্রাহ্মণ হয়েও অন্যের উচ্ছিষ্ট খাবারের থালা খানসামার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গোগ্রাসে মিষ্টান্ন গিলতে তার লজ্জাও হয় না, বিবেকেও আটকায় না। এই লোভী ব্রাহ্মণটি কিন্তু সন্তানভাগ্যে বড়ই ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক শ্যামাদাস এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। বার বার তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে আঁতুড়েই মারা যায়। শ্যামাদাস তাই দশ বিঘে জমি আর আজীবন সিংহবাহিনীর প্রসাদের লোভ দেখিয়ে এই অমৃতসন্তান ব্রাহ্মণের আনুকূল্যে নিজের ভাগ্যদোষ খণ্ডনের জন্য সচেষ্ট হলেন। 'কিন্তু সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে চক্রবর্তীর উপস্থিতিতেও শ্যামাদাসের ভাগ্য-পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। নবজাত শিশুটিও তার অগ্রজের মতই কালব্যাধি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হল। শেষচেষ্টাও ব্যর্থ হবার পর শিশুটিকে সূতিকাগৃহের বারান্দায় মৃত্যু-প্রতীক্ষায় রাখা হল শুইয়ে। শিয়রে চক্রবর্তী প্রহরারত। এই শিশুটি যদি বেঁচে ওঠে, তা হলে তার দারিদ্র্য চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে। আজ তারও গৃহে একটি নবজাতকের আবির্ভাব হয়েছে। দরিদ্র সংসারে অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে জন্মেছে সে শিশু। আকাশজোড়া অন্ধকারের নীচে বসে হঠাৎ চক্রবর্তীর মনে হল, ধনীগৃহের এই মুমূর্ষু সন্তানটির সঙ্গে যদি তার আপন পুত্রের স্থানবদল করে নিতে পারে তা হলে শ্যামাদাসের

সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তারই সন্তান। সিংহবাহিনীর রাজভোগেও তার হবে চিরদিনের অধিকার। পূর্ণ চক্রবর্তী অন্ধকারে শিশুবদল করে নিজের ভাগ্যকে জয় করবার চেষ্টা করলে। দশ বিঘে জমি আর সিংহবাহিনীর প্রসাদ সে পেল, কিন্তু তাতেও তার লোভের নিবৃত্তি হল না। বৃহত্তর প্রাপ্তির প্রলোভনে শ্যামাদাসের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে অগ্রদানী সেজে আপন সন্তানের হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণ করতে হল তাকে। কিন্তু এই পাপকর্মা লোভী ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তিরূপিণী নিয়তি সর্বশেষে দেখা দিল চরম দণ্ডের আকারে। নিজের যে শিশুটিকে লোভের বশে শ্যামাদাসের সন্তান বলে চালিয়ে দিয়েছিল তারই শ্রাদ্ধে অগ্রদানী সেজে পিণ্ড গ্রহণের আহ্বান এল। নিয়তির এই নির্মম প্রহারে অসহায় মানবাত্মা আর্তনাদ করে উঠেছে। কিন্তু তার অমোঘ বিধানের হাত থেকে মুক্তি নেই।

'শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল। পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী।'

পুরোহিতের কণ্ঠে এ যেন নিয়তিরই চরম দণ্ডাদেশ উচ্চারিত হল।

'অগ্রদানী'তে নিয়তি নেমে এসেছে শাস্তিরূপে, কিন্তু 'না' গল্পে তার আবির্ভাব পরম ক্ষমায়। অনন্ত আর কালীনাথ মামাতো-পিসতুতো ভাই। অনন্ত কালীনাথকে গুলি করে হত্যা করেছিল। তারপর সে পাগল হয়ে যায়। আট বৎসর পরে দায়রা আদালতে সেই নৃশংস হত্যা-মামলার বিচার। নিহত কালীনাথের স্ত্রী ব্রজরানীর সাক্ষ্য গৃহীত হবে। তার অবৈধব্য-ব্রতের দিন তারই সম্মুখে অনন্ত তার স্বামীকে হত্যা করেছিল। স্বামীহন্তার শাস্তিবিধানের জন্যে সেদিন থেকে ব্রজরানী সুদীর্ঘ আট বৎসর অশৌচ পালন করে এসেছে। তৈলহীন স্নান, হবিষ্যান্ন আহার আর মৃত্তিকায় শয়ন করে সে এই দিনটির প্রতীক্ষা করে আছে। ঘুমতে সে পারেনি, চোখ বুজলেই হত্যা বিভীষিকা তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। স্বামিহন্তার চরম শাস্তি চাই। ক্ষমা সে কিছুতেই করতে পারবে না। কিন্তু কার অপরাধে কে কাকে ক্ষমা করবে? এই ব্রজরানীর যে অনন্তেরই স্ত্রী হবার কথা ছিল। একসঙ্গে দুভাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ঠিক হল একে অন্যের পাত্রী দেখতে যাবে। অনন্তর পাত্রী ব্রজরানীকে

দেখতে গিয়ে কালীনাথের পছন্দ হয়ে গেল তাকে। বেনামী চিঠি লিখে বিয়ের প্রস্তাব দিলে পাল্টে। তারই ফলে অনন্তের ভাগ্যে পড়ল সেই মেয়ে যার সঙ্গে কালীনাথেরই বিয়ের বন্দোবস্ত হয়েছিল। বিয়ের রাতেই শিক্ষাভিমানী বধূর হাতে পেল সে চরম লাঞ্ছনা। শ্বশুরগৃহে অপমান আর লাঞ্ছনার চরম হল নির্মম কশাঘাতে। পক্ষান্তরে ব্রজরানী কালীনাথের জীবনে এল লক্ষ্মীরূপিণী হয়ে। দিন দিন সুধায় ভরে তুলল তার জীবনের পাত্র। অনন্ত শ্বশুরগৃহ হতে কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে যখন আত্মহত্যার সঙ্কল্প নিয়ে নিজের বন্দুক হাতে করে নির্জন প্রান্তরের দিকে ছুটে যাচ্ছিল তখন কালীনাথের কৃতকর্মের নিয়তিই তাকে ডেকে নিয়ে গেল তার অন্তঃপুরে। অনন্তের জীবনের কুগ্রহ কালীনাথ। তারই ভাগ্যলক্ষ্মীকে অপহরণ করে নিজে পরম সুখে অমৃতপানে বিভোর হয়ে আছে। কিন্তু তার অপরাধের শাস্তি কি কেবল অনন্তই একলা ভোগ করবে! মৃত্যু গর্জন করে উঠল কালীনাথকে লক্ষ্য করে। অনন্ত আত্মহত্যার সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছিল; কিন্তু নিয়তি তখন নিজের কাজ শেষ করে ক্ষান্ত হয়েছে। বন্দুকের তিনটে গুলিই কালীনাথের দেহে নিঃশেষিত।

ব্রজরানীর এ ইতিহাস জানার কথা নয়। সে স্বামীহন্তাকে শাস্তি দেবার জন্যেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

'সম্মুখের কাঠগড়ায় একটি লোক—শুভ্রকেশ, শীর্ণ, ন্যুব্জদেহ, স্তিমিত চঞ্চল দৃষ্টি, হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।.....

পৃথিবীর বাদশা পুত্রবধূ হইবার আশায় জান দিয়াছে এ হতভাগা, হায় রে, গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে টানিয়া নিল। এ কি বিচার! এ কাহার বিরুদ্ধে বিচার! ব্রজরানীর যেন সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল।

সরকারী উকিল প্রশ্ন করিলেন—এই লোকটিকে দেখুন। অনেক পরিবর্তন হয়েছে অবশ্য। এই অনন্ত কি আপনার স্বামীকে খুন করেছে?

ব্রজরানীর অন্তরাত্মা আর্তস্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, তাহারই প্রতিধ্বনি জনতা স্তম্ভিত হইয়া শুনিল,—'না'।'

একটিমাত্র ধ্বনি। কিন্তু ওর মধ্যে দিয়েই মানুষের সকল সজ্ঞান প্রচেষ্টাকে পরাভূত করে নিয়তির বিধান জীবনের উপর নেমে এসেছে।

আপন কর্মের ফলভোগী মানুষকে হতেই হবে! পাপের শাস্তি পুণ্যের পুরস্কার মাথা পেতে গ্রহণ করতেই হবে তাকে। কিন্তু সজ্ঞানে হোক আর নির্জ্ঞানেই হোক, আপন স্বভাবের কোনো একটি বিশেষ ত্রুটি বা দুর্বলতাকে আশ্রয় করেই নিয়তি যখন মানুষের মর্মমূলে বাসা বেঁধে বসে তখন তার অসহায়তা করুণারই উদ্রেক করে। 'তাদের ঘর' গল্পে শৈলর ভাগ্যবিড়ম্বনা তার আপন স্বভাবেরই দোষে। বিনীত, নম্র, মিষ্টমুখী সুন্দরী বধূটি; সংসারেরর সমস্ত ভৎর্সনাই সে নীরবে সহ্য করে। কিন্তু তার স্বভাবের একটি দোষ: শ্বশুরগৃহে পিতৃগৃহের সম্পদ ও ঐশ্বর্য সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে দশখানা করে বলা। অপরাধের গুরুত্ব খুব বেশি নয় কিন্তু সংসারে অনেক সময়ই লঘু অপরাধেও গুরুদণ্ড হয়ে থাকে। শৈলরও হল তাই। মিথ্যা বলার অপরাধে শাশুড়ী কর্তৃক শ্বশুরগৃহ থেকে সে পিতৃগৃহে পরিত্যক্ত হল। কিন্তু বাড়িয়ে বলার বেলা কেবল যে বাপের বাড়ি সম্পর্কেই তার পক্ষপাতিত্ব আছে এমন নয়, এখানে এসেও স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে সে সমান মরীচিকাই রচনা করে চলেছে। বাস্তবের সামান্য আঘাতে তার তাসের ঘর ভেঙে পড়ছে, বিড়ম্বনারও অবধি থাকছে না, কিন্তু যা তার স্বভাব তার হাত থেকেই বা তার মুক্তি কোথায়? আপনজনকে বড় করে দেখানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যাকে দিয়ে সত্য ঢাকবার চেষ্টা ও তার বিড়ম্বনার মধ্যে মানবচরিত্রের একটি মধুর ছলনা 'তাসের ঘরে' ক্ষমাসুন্দর সরসতা সৃষ্টি করেছে।

'দেবতার ব্যাধি' গল্পে চারিত্রিক দুর্বলতাকে জয় করার প্রাণপণ ব্যর্থপ্রয়াস দুর্বল মানুষকে দেবতার মহিমায় অভিষিক্ত করেছে। ডাক্তার গড়গড়ি তরুণ বয়সে আর্ত-আতুরের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিল। উপকৃত নরনারী দেবতার মত ভক্তি করত তাকে। অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ তার কাছে নৈবেদ্যের মত নিবেদন করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত তারা। কিন্তু দেবতা দেখা দিল

মানুষের আদিম বুভুক্ষা নিয়ে। পদস্খলন হল ডাক্তারের। সেই থেকে ডাক্তার আমরণ অন্তরের এই দুর্বলতা নিয়ে কৃতজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে কেবল পালিয়ে বেড়িয়েছে। হৃদয়হীনতার ছদ্মবেশ পরে নিজের স্বরূপকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেছে প্রাণপণে। আচার-আচরণে এনেছে অস্বাভাবিক রূঢ়তা ও বিরূপতা। মানুষের সেবা, মানুষের প্রতি ভালবাসাই যার স্বভাব, সে হয়ে উঠেছে একান্ত উগ্র ও কর্কশ, অত্যন্ত অপ্রিয়ভাষী ও বদমেজাজী। এই সামাজিক মানুষটির অদ্ভুত-চরিত্রের তির্যক-মহিমার মর্মোদ্ঘাটনে লেখক মানব-মনের অন্তঃপুরে দেবাসুর সংগ্রামের রূপটিকে শিল্পে অক্ষয় করে রেখেছেন।

কিন্তু প্রবৃত্তি বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত হয়ে একেবারে রক্তের মধ্যে মিশে গেলে তা যে কত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে তার প্রমাণ 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটি। হিংস্র খুনে কালী বাগদী এর নায়ক। বাগদীরা এককালে নবাবের পল্টনে ছিল। দুর্ধর্ষ জাত। চাষবাস তাদের ঘেন্নার কাজ; তাদের ধারণা 'মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হল মেয়ের জাত।' কাজেই বৃটিশ আমলে যারা নিয়ম-শৃঙ্খলার দৃষ্টি এড়িয়ে হিংস্র স্বভাবকে অব্যাহত রেখেছিল তারা হল খুনে ডাকাত। রাতের পর রাত চামড়ার মত পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে শিকারের অপেক্ষায় ওৎ পেতে দুর্গমপথের পাশে বসে থাকত। মদের নেশায় মাথার ভেতরে ছুটত আগুন। অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠত। হাতে থাকত ফাবড়া—শক্ত বাঁশের দুহাত লম্বা লাঠি; সে লাঠি ছুঁড়ত মাটির কোল ঘেঁষে। সাপের মত গোঙাতে গোঙাতে সে-লাঠি ছুটে গিয়ে পথিকের পায়ে লাগলে আর তার নিস্তার থাকত না। পড়তেই হত তাকে। তারপর একখানা বড় লাঠি তার ঘারের ওপর দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে পা দুটো ধরে দেহটা উল্টে দিলেই ঘাড়টা ভেঙে যেত। চার পুরুষ ধরে কালী বাগ্দীরা এই নৃশংস নরহত্যাকেই জীবিকার্জনের পন্থা বলে বেছে নিয়েছিল। কালী তার বাবার কাছে শুনেছে, এ পাপে তাদের বংশ থাকবে না, নির্বংশ হতেই হবে। কিন্তু তবু রক্তের এই হিংস্রতা থেকে মুক্তি ছিল না তাদের। অবশেষে নিয়তির বিধান নামল নির্মমতম দণ্ড নিয়ে। এক রাতে ভুল করে কালী বাগ্দী

তার একমাত্র ছেলে তারাচরণকেই অপরিচিত পথিক ভেবে হত্যা করলে। বিচারক ফাঁসির আদেশ না দিয়ে যাতে তিলে তিলে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়ে তার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় তার জন্যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। কালী বাগ্দী সে দণ্ডভোগ করে ছুটে এসেছে আখড়াইয়ের দীঘিতে—যেখানে সে নিজের হাতে তার ছেলের লাশ পুতে রেখেছিল। অন্ধকারে উন্মাদের মত ডাকছে ছেলের নাম ধরে। অবশেষে প্রকৃতির প্রতিশোধের মতই যেভাবে ঘাড় ভেঙে সে বহু মানুষকে হত্যা করেছে, তেমনি করে দীঘির খাদের ভিতর পড়ে ঘাড় ভেঙে হল তার মৃত্যু। তারাশঙ্করের এ গল্পে জীবনের যে হিংস্র ভয়ংকর রূপ প্রকাশিত হয়েছে, এবং তাকেই অবলম্বন করে কর্ম ও কর্মফলের যে নিষ্ঠুর লীলারহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পূর্বে তার কোনোই পরিচয় ছিল না। জীবনের আদিম হিংস্রতায় তলিয়ে গিয়ে জীবনের এ এক নতুন রসাস্বাদন।

এই আদিম জীবনোচ্ছ্বাসের আরেকটি রূপের প্রকাশ 'বেদেনী' গল্পে। সেই 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা'—যেখানে কোনো সংস্কার, কোনো প্রথা, কোনো বাধাবন্ধ নেই; অতীতের জন্যে নেই কোনো বৃথাক্ষোভ, ভবিষ্যতের জন্যে নেই মিথ্যা দুরাশা; কেবল উন্মুক্ত জীবনস্রোতে বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় আবেগে উল্লসিত স্বচ্ছন্দ নৃত্যগতিতে এগিয়ে চলার সহজিয়া আনন্দেই জীবন চঞ্চল—তারই কথা আছে 'বেদেনী'তে। বেদের মেয়ে রাধিকা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে স্নান করে উঠেছে। মাদকতা তার সর্বাঙ্গ বেয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। কৈশোরে এক বেদের ছেলের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছিল। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রীতে মায়াবীর দৃষ্টি; রাধিকার ক্রীতদাসের মতই ছিল সে। কিছুদিন পরে রাধিকার জীবনে এল শম্ভু বাজিকর। উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধত দৃষ্টি, কঠোর, বলিষ্ঠদেহ মানুষটি রাধিকাকে জয় করে নিলে। কয়েক বৎসর কাটল তারই সঙ্গে বাজি দেখিয়ে। বৃদ্ধ হল শম্ভু। কিন্তু রাধিকার সাপিনীর মত ক্ষীণ তনুতে, আর কালো রূপের মধ্যে মহুয়া ফুলের মাদকতা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। নতুন বাজিকর কিষ্টো এসে দাঁড়াল তার সামনে। ছফুটের অধিক লম্বা

তরুণ জোয়ান, দেখে রাধিকার চোখ জুড়িয়ে গেল। বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করে রাধিকা নওজোয়ানকে আশ্রয় করে বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দেশ জীবনের অভিসারে। যে-প্রাণলীলা কোনো সংস্কার মানে না, কোনো বাধাবান্ধবকে স্বীকার করে না, শুধু আপনার বেগেই আপনি ধাবিত হয় তার স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী মূর্তিই 'বেদেনী'তে স্বীকৃতি পেয়েছে।

'ডাইনী' গল্পের পরিকল্পনা ও শিল্পকুশলতাও বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব! ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব ডাকিনী-যোগিনী সম্পর্কে আদিম মানুষের যে চেতনা ভয় ও কুসংস্কারের মধ্যে লালিত হয়ে বংশ বংশ ধরে মানুষের মনোলোকের অন্ধকারকে আশ্রয় করে আছে তারই বিস্ময়কর প্রকাশ এই গল্পটি। বিভীষণা প্রকৃতিও এখানে ভয়ংকরী ডাইনীরই সহোদরা। জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্ত-বিস্তৃত ছাতিফাটার মাঠ। গ্রীষ্মকালে শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্যনির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। এই মাঠেরই এক প্রান্তে নির্জন আমবাগানে ডাইনীর বাস। তার যখন বছর বারো বয়স তখন একদিন বামুন-পাড়ার হারু চৌধুরী তাকে প্রথম সচেতন করে দিয়েছিল যে, সে ডাইনী, তার নজরে বামুনের ছেলে পেট-বেদনায় ছটফট করেছে। সেই থেকে কত অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে সে মানুষ নয়, মানুষের দেহ-রস-লোলুপা রাক্ষসী। বার বার শুনে শুনে তার নিজেরও বিশ্বাস হয়ে গেছে যে তার নরুন-দিয়ে-চেরা ছুরির-মত-চোখে, বৈড়ালীর-মত-দৃষ্টিতে যাকে তার ভাল লাগে তার আর রক্ষা থাকে না। তার স্বামীকেও একদিন সে শোষণ করে মেরে ফেলেছিল। মায়ের কোলে কচি শিশু, স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের হয়ত প্রথম সন্তান, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মত নরম সরস। ডাইনীর দৃষ্টিপথে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলে যায়, নরম গরম লালায় মুখটা ভরে ওঠে। যেন শিশুর দেহের সমস্ত রস নিঙড়ে নিঙড়ে পান করছে সে। মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তার রসাস্বাদ। সুতরাং শুধু জনপদের সর্বলোকেরই নয়, হতভাগিনীর নিজেরও বিশ্বাস যে সে ডাইনী। কতবার সে দেবতার কাছে কাতর হয়ে মানত করেছে, 'মা,

আমাকে ডাইনী থেকে মানুষ করে দাও। আমি তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেব।' মা মুখ তুলে চান নি। চল্লিশ বৎসর এই অভিশপ্ত জীবন-যাপনের পর একদিন ঘটনাচক্রে রটে গেল যে, সর্বনাশী ডাইনী বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মেরে ফেলেছে। এ সংবাদ রটনার পর আর তার রক্ষা নেই। সুতরাং তাকে পালাতে হবে। ছাতি-ফাটার মাঠ আগুনে পুড়ছে নিস্পন্দ শবের মত। একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বৃদ্ধা ডাইনী নেমে পড়ল মাঠের বুকে। দুর্দান্ত ঘুর্ণিঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাকে।

'পরদিন সকালে ছাতি-ফাটা মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরী গুল্মের একটা ভাঙা ডালের সূচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর-অবধি রহিল না; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী।... ডালটার নীচে ছাতিফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মত ডেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে।

অতীতকালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকের দিক্‌চক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমান বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।'

এ গল্পে একদিকে জ্ঞান ও রহস্যের আলো-ছায়ার লীলায় পরিবেশিত গল্পরস এবং অন্যদিকে ডাইনীরূপিণী এই হতভাগিনী মানবীর প্রতি লেখকের অপূর্ব মমতা তারাশঙ্করের প্রতিভা ও সৃজনীশক্তির পূর্ণ পরিচয় বহন করে এনেছে।

৬

নিয়ত-পরিবর্তমান কালের অভিঘাতে ক্ষয়িষ্ণু মানুষের মর্মবেদনা, নবজীবনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জরাজীর্ণ পুরাতনের পরাভবের ট্রাজেডি-বর্ণনায় তারাশঙ্করের সাহিত্য বিশিষ্টতা পেয়েছে। 'জলসাঘর'-এর উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে। রায়বংশের সাত-পুরুষের মোহ যে বিশালগৃহে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তারাশঙ্করের কবিদৃষ্টি সেই সংকেত-গৃহেই জমিদার-

বংশের অন্তমহিমাকে উদ্ঘাটিত করেছে। রায়বংশের সর্বশেষ পুরুষ বিশ্বম্ভরের জীবনে সেদিন অকাল-বসন্তের আবির্ভাব। জ্যোৎস্নায় ভুবন ভেসে যাচ্ছে, বসন্তের বাতাসের সর্বাঙ্গে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ মাখা। জলসাঘরের অভ্যন্তরে সুধাকণ্ঠী নর্তকীর নৃত্য ও সুরের ইন্দ্রজালে সংগীত-মুগ্ধ অজগরের মতই বিশ্বম্ভর বিমোহিত। অকস্মাৎ তাঁর কণ্ঠে গোত্রস্খলন হল এবং এই একটিমাত্র নামধ্বনিকে আশ্রয় করেই খুলে গেল অতীতের রহস্য-যবনিকা। যে উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-ব্যসনে এই অভিজাত বংশের শক্তিমহিমা অপচিত হয়েছে জলসাঘর তারই প্রতীক। কবিত্বে ও ব্যঞ্জনাধর্মে ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

কিন্তু মানভূমের ফায়ারব্রিক্‌স কারখানার খাজাঞ্চিবাবুর বিদায়-দৃশ্যটি একেবারে অনাড়ম্বর বলেই তা আরো বিশেষ করে চিত্তস্পর্শী হয়েছে। কালের পরিবর্তন হয়েছে, পুরনো পদ্ধতির বদলে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে, নতুন দিনের নতুন নিয়মের কাছে সে বাতিল, সে অযোগ্য, তাই তাকে চলে যেতে হবে। চলে যেতে বলা খুব সহজ কিন্তু ফেলে যাওয়া যে কত মর্মবিদারী, তা যাকে যেতে হয় শুধু সে-ই বোঝে। নিষ্করুণ সংসারে মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই উৎসব-শেষের উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রের মতই সে বর্জনীয়, কর্মক্ষেত্রে মানুষের এই শোকাবহ পরিণামই এ গল্পের অবলম্বন।

এই সুন্দর ভুবন, এই বিচিত্র সংসার ছেড়ে মানুষ যেতে চায় না, তবু তাকে যে যেতে হয়; জন্মমৃত্যু-নিয়ম-শাসিত এই মরপৃথিবীতে মানবজীবনের এই তো সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পুরনো ট্রাজেডি। অহরহ মানুষ কালকবলিত হচ্ছে, তথাপি যে বেঁচে আছে সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে কি করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এই জীবনীশক্তি, মরণপীড়িত এই চিরজীবী প্রেমই মানুষের কাছে তার জীবনের মূল্য এমন করে বাড়িয়ে দিয়েছে। মৃত্যুর গতি অপ্রতিরোধনীয় বলেই মৃত্যুজয়ের চেষ্টা চিরবরণীয়। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে মানুষের এই চিরন্তন ধর্ম ও তার পরিণাম চিরকালের ভাষাতেই বর্ণিত হয়েছে। সম্পন্ন চাষী মুকুন্দ পাল। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই-করা ভৈরব-মূর্তির মত দশাশয়ী পুরুষ। কিন্তু ভীমের মত ঐ দেহেও জরার অধিকার প্রতিষ্ঠিত

হল। জরাবিজয়ের চেষ্টার কিন্তু অন্ত নেই মুকুন্দের। মদের পাত্র ভরে শিথিল দেহের স্নায়ুতন্ত্রীতে সে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চারের ব্যবস্থাও করেছে। লক্ষ্মীর অকৃপণ দাক্ষিণ্য ছড়িয়ে আছে মাঠে মাঠে। তাকে দুহাত ভরে ঘরে তুলতে হবে। বেঁচে থাকার আশা ও আনন্দে মুকুন্দ ভুলে গেল তার দেহের জরাকে। অমিত-শক্তি সঞ্চয় করে জীবনের অচল চাকাকে চালাবার শেষ চেষ্টা করলে সে। এবং সেই অন্তিম শক্তিপরীক্ষায় মৃত্যুর হাতে জীবনের হল চরম পরাজয়।

'থরথর করে কেঁপে উঠল পাল। বুকের ভিতরে কেমন করছে! চারদিক কেমন হয়ে আসছে। চাঁদনীরাতে বকের পালকের মত মলমলে ঢাকা মা-বসুমতী!··· সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলে তার গাড়িতে-বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগার ফলন্ত ধান। ···পালের দুই হাতের মুঠার মধ্যে ছিড়ে এল মুঠা-ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত। বারকতক পা দুটো ছুড়লে,—নাকটা ঘষলে ক্ষেতের ধূলার উপর, এক-মুখ ধূলা কামড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধান-ভরা মুঠা-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পরমুহূর্তে।'

মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের পতনের মতই এই মৃত্যুর মহিমা।

৭

ছোটগল্পেই হোক্, আর উপন্যাসেই হোক্, তারাশঙ্কর জীবন-মহাকাব্যের কবি। তাঁর উপন্যাসের বিপুলায়তনের মধ্যে ধরা পড়েছে জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, আর ছোটগল্পে আছে জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যেই তার অসামান্য মহিমার ব্যঞ্জনা। উপন্যাসে আছে বিস্তৃতি, ছোটগল্পে গভীরতা। চরিত্রসৃষ্টিতে সূক্ষ্মতা বা জটিলতা নয়, গভীরতা ও বলিষ্ঠতাই তাঁর লক্ষ্য। শিল্পের রোমান্টিক নয়, ক্লাসিক আদর্শের প্রতিই তাঁর মানসিক প্রবণতা। জীবনের নতুন মূল্যবোধ-সৃষ্টির আগ্রহের চেয়ে পুরনো জীবনকেই মূল্যবান করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সৃষ্টিকর্মে বেগবান। নিজের ব্যক্তিসাধনায় প্রত্যক্ষীভূত জীবনের কোনো বিশেষ রূপকে তিনি ধ্যান করেন নি, বরং তাঁর কবিকল্পনাকে আশ্রয় করে জীবনসত্যই যেন নিজেকে প্রকাশ করেছে। এখানেই

তারাশঙ্করের প্রতিভার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এদেশের মাটিতে, এদেশের জনজীবনে যে কবিপ্রতিভা যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী রসপ্রবাহে অবিনশ্বর হয়ে আছে তারাশঙ্করে যেন তারই এক স্বতঃস্ফূর্ত সুন্দর প্রকাশ। এদিক দিয়ে তারাশঙ্করের মধ্যে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্বে যে ভারত-চেতনার প্রথম উন্মেষ, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের মহাসঙ্গমে সেই ভারতেরই জয়গান। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর এই ভারত আবিষ্কারেরই সাধনা তারাশঙ্করে নতুন পরিণতি পেয়েছে। প্রতীচ্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের নাগালের বাইরে বসে তিনি ভারতের জন-জীবনের মধ্যেই ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয় জীবনবোধই তাঁর কবিদৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে।

বর্তমান সংকলনে গ্রথিত 'ইমারত' ও 'কামধেনু' গল্প দুটিতে এই অবিনশ্বর ভারতেরই জীবনরহস্য সাধারণ মানুষের অতি-নগণ্য জীবনের মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় প্রকৃতির প্রতীক হল বটগাছ আর ভারতীয় সংস্কৃতিব বুনিয়াদ যে কৃষিসভ্যতা তার প্রতীক হল কামধেনু। এদেশের প্রকৃতিপালিত জীবনে বটগাছ যে কত সুখদুঃখের সাক্ষী হয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই! আর স্তন্য-পীযূষ-দায়িনী সুরভির সেবা ও তার মহিমা নিয়ে এদেশের কত আখ্যান-উপাখ্যানই না গড়ে উঠেছে! তারাশঙ্করের 'ইমারত' ও 'কামধেনু' ভারত-কথার এই দুটি চিরন্তন ধারা থেকেই উদ্ভূত। রাজমিস্ত্রী জনাব আলি 'ইমারত'-এর নায়ক। সে সারাজীবন নিজের হাতে গড়েছে কত মন্দির আর মসজিদ, কত সুন্দর সুন্দর গম্বুজ আর মিনার। কিন্তু তার জীবনের যখন অন্তিম লগ্ন এসে উপস্থিত, তখন দেখা গেল তার রোগজর্জর জরাতুর দেহকে আশ্রয় দেবার জন্যে একটি ভাঙা কুঁড়েও তার ভাগ্যে জুটল না। জনাব আলি জানে, এ তার পাপেরই ফল। মেয়েদের সম্পর্কে সে উচ্ছৃঙ্খল, সে ব্যভিচারী। 'অহরহ কাজকামের সময় যারা পাশে থাকে, হাতে হাতে লাগে, চোখে চোখ রাখতে হয়,...ভারার উপর কড়া রোদে মাথা ঘুরে গেলে যারা বাতাস দেয় আঁচল দিয়ে, তাদের উপর দিল্ না পড়ে উপায় কি?' জনাবেরও উপায় ছিল না। কিন্তু এই এক পাপ ছাড়া আর আর কোনো পাপ নেই; তবু কি নিদারুণ

প্রায়শ্চিত্তই না তাকে করতে হল! কিন্তু খোদাতায়লার দরবারে ক্ষমাও সে পেয়েছে। মানুষের গড়া সমস্ত আশ্রয় থেকে যখন সে বঞ্চিত তখন খোদাতায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারতের তলায়ই সে স্থান পেল। আশ্রয় পেল সে বটগাছের তলায়। বটগাছ ভগবানের গড়া ইমারত—এই কল্পনার মধ্যে যেমন কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি লেখকের শিল্পিমানস যে কি ভাবে ভারতীয় প্রকৃতি ও ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে তারও আভাস এই একটিমাত্র বস্তুপ্রতীকের মধ্যেই সুপরিস্ফুট। মানুষের গড়া সমাজের আশ্রয়চ্যুত হয়ে যে মুহূর্তে এই হতভাগ্য মানুষটি বটগাছের তলায় নেমে এল, সেই মুহূর্তে একটি ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ কাহিনী সমস্ত ভারতের সনাতন পটভূমিতে বিন্যস্ত হয়ে তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠল। অতিনগণ্য ব্যক্তিজীবনের রহস্যের মধ্যে বিরাটতম জীবনসত্যের উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় গল্পটি অসাধারণ। তা ছাড়া গল্পের উপসংহারে ভারতীয় আস্তিক্যবুদ্ধিই জয়যুক্ত হয়েছে। ভগবানের অসীম ক্ষমতাশীলতার ওপর অটুট বিশ্বাস রেখে তাঁর কাছে পূর্ণ-আত্মসমর্পণেই এই প্রাণান্তকর দুঃখ-কথা মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।

'কামধেনু' গল্পে লক্ষ্মী আর উর্বশী, কল্যাণ আর কামনা, সেবা আর প্রলোভনের দ্বন্দ্বে ভারতীয় জীবনবোধেরই প্রকাশ। গল্পে কামধেনুর আত্মপ্রকাশের বর্ণনা অতুলনীয়। 'আশ্বিন মাসের আকাশের সাদা মেঘের মত নরম আর সাদা ···গায়ে হাত দিলে মনে হয়, কোনো কচি দেবকন্যার অঙ্গে বা হাত পড়ল।···যখন যুবতী হয়ে ওঠে, সর্বাঙ্গ ভরে ওঠে পুষ্টিতে, চিকনতর লোমে, গলার গলকম্বল প্রশস্ত হয়ে ঝুলে পড়ে, মন মোহিত করে তুলতে থাকে, পিছন দিকটি ক্রমশ ভারী হয়ে উঠে থমকে থমকে চলে।···সন্তান প্রসব করে না, অথচ প্রবালের মত রক্তিম আভায় এবং একরাশি পদ্মফুলের মত পেলবতায় অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে তার স্তনভাণ্ড স্ফীত হয়ে ওঠে, পাকা বিল্বফলের মত পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে স্তনবৃন্তগুলি; প্রথমে বিন্দু বিন্দু দুধ দেখা দেয় স্তনবৃন্তের মুখে; তারপর ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে মাটিতে।'

পটুয়ার ছেলে নাথু। ধর্মে মুসলমান, আচরণে হিন্দু, জীবিকায় শিল্পী। এই নাথুর জীবনেই আবির্ভূত হলেন কামধেনু। বংশ-বংশ

ধরে নাথুরা ঘরে-ঘরে 'স্থরভিমঙ্গল-গান গোধন মহিমা' গেয়ে গেয়ে যে পুণ্য অর্জন করেছিল তারই ফলে এই বংশে কামধেনু আবির্ভূতা হলেন। নাথু মা-স্থরভির সেবায়, তাঁরই আশীর্বাদে সৌভাগ্যের অধিকারী হল। কিন্তু তার জীবনে সর্বনাশের অগ্রদূতী হয়ে এল ফুলমণি। তার 'মুনি-জনের-মন-ভোলানো' রূপে প্রলুব্ধ হল নাথু। লক্ষ্মীকে বিসর্জন দিয়ে উর্বশীকে বরণ করলে সে। কামধেনুকে এক ধনীগৃহে বিক্রয় করে ফুলমণিকে ভোগ করার অর্থ সংগ্রহ হল তার। কিন্তু দুদিনের মধ্যেই এল অনুশোচনা। মতিভ্রান্ত নাথু কামধেনুকে হত্যা করলে। ফুলমণিও তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। হেফাজদ্দি শেখের কাছে তাকে বিক্রয় করে সেই টাকাতেই নাথু শুরু করলে চামড়ার ব্যবসা। কামধেনুর সেবক হল গোচর্মের ব্যবসায়ী। কিন্তু এই শোচনীয় অধঃপতনের মধ্যেও নাথুর জীবনে ফুলমণি নয়, কামধেনুরই প্রভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত চিরবহমান। তাই চর্মব্যবসায়ীর সম্মুখে একদিন একটি গোহত্যা-কারী আসতেই সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করলে তাকে। গোধনকে যে বিনাশ করে তার শাস্তি যে নাথুর রক্তের মধ্যে। বলাই বাহুল্য ; এই নরহত্যা আত্মহত্যারই নামান্তর। নরহত্যার অপরাধে নাথুর ফাঁসির আদেশ হল। ফাঁসিতে তার দুঃখ নেই। গোহত্যাকারীকে মেরে ফাঁসি যেতে কোনো আক্ষেপ নেই তার। তবে ফাঁসির দড়িটা গরুর আঁতে তৈরি হলেই তার আর কোনো খেদ থাকে না।

এ-গল্পে ভারত-সংস্কৃতি স্পর্শ করেছে একেবারে মাটির স্তরকে। কিন্তু জনজীবনের নিম্নতম স্তরেও ভারতের বাণীমূর্তিটিকে চিনতে পারা যায়। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতিকুলের উত্থান-পতনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কামধেনুর সেবা-মাহাত্ম্যে যে মহাবংশের উত্থান, অগ্নিবর্ণের অমিতাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলেই তার চরম অধঃপতন ঘটেছিল। সূর্যপ্রভব মহাবংশের উত্থান-পতনে প্রাচীন ভারতের মহাকবি যে জীবনসত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অবজ্ঞাত-পল্লীর অখ্যাতজনের প্রাকৃত-জীবনেও সেই একই জীবনরহস্য সমুদ্ভাসিত ;—তারাশঙ্করের এই দৃষ্টিই আপামর সর্ব সাধারণের জীবনে ভারতকে নতুন মহিমায় আবিষ্কার করেছে।

বঙ্গবাসী কলেজ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৭

জগদীশ ভট্টাচার্য

জলসাঘর

ভোর তিনটার সময় নিয়মিত শয্যাত্যাগ করিয়া বিশ্বম্ভর রায় ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। পুরাতন খানসামা অনন্ত গালিচার আসন ও তাকিয়া পাতিয়া, ফরসি ও তামাক আনিবার জন্য নীচে চলিয়া গেল। বিশ্বম্ভর চাহিয়া একবার দেখিলেন, কিন্তু বসিলেন না। নতশিরে যেমন পদচারণা করিতেছিলেন, তেমনই করিতে থাকিলেন। অদূরে রায়বাড়ির কালীমন্দিরের তলদেশে শুভ্র স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা ক্ষীণ ধারায় বহিয়া চলিয়াছে।

আকাশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ওই তারাটির সহিত যেন দীপ্তির প্রতিযোগিতা করিয়াই এ অঞ্চলের হালে বড়লোক গাঙ্গুলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলী-বাতি অকম্পিতভাবে জ্বলিতেছিল। ঢং-ঢং-ঢং করিয়া গাঙ্গুলীবাবুদের ছাদে তিনটার ঘড়ি এতক্ষণে পেটা হইল। পূর্বে দুই শত বৎসর ধরিয়া এ অঞ্চলে ঘড়ি বাজিত রায়বাবুর বাড়িতে; এখন আর বাজে না। এখন বিশ্বম্ভরবাবুর ঘুম ভাঙে অভ্যাসের বশে আর পারাবতের গুঞ্জনে। শুকতারা আকাশে দেখা দিলেই উহাদের কলরব শুরু হয়। ভোরের বাতাসের সঙ্গে একটি অতি মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বসন্ত সমারোহ করিয়া রায়বাড়িতে আর আসে না। তাহার পাদ্য-অর্ঘ্য দিবার মত শক্তিও রায়বংশের নাই। মালীর অভাবে ফুলের বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। আছে মাত্র কয়টা বড় গাছ—মুচকুন্দ, বকুল, নাগেশ্বর, চাঁপা। সেগুলিও এই বংশেরই মত শাখাপ্রশাখাহীন, এই প্রকাণ্ড ফাটল-ধরা প্রাসাদখানার মতই জীর্ণ। সত্য সত্যই কয়টা গাছের কাণ্ডের মধ্যে গহ্বরও দেখা দিয়াছে। সেই জীর্ণ শাখার প্রান্তে বসন্ত দেখা দেয়, না গাছগুলিই বসন্তকে ধরিবার চেষ্টা করে, কে জানে।

আস্তাবল হইতে একটা ঘোড়া ডাকিয়া উঠিল।

করসির মাথায় কলিকা বসাইয়া নলটি হাতে ধরিয়া অনন্ত খানসামা ডাকিল, হুজুর!

বিশ্বম্ভরবাবুর চমক ভাঙিল, বলিলেন, হুঁ।

ধীরে ধীরে গালিচায় বসিতেই অনন্ত নলটি তাঁহার হাতে আগাইয়া দিল। নীচে ঘোড়াটা আবার ডাকিয়া উঠিল।

নলে দুই-একটা মৃদু টান দিয়া বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন, মুচকুন্দ ফুল ফুটতে আরম্ভ হয়েছে, শরবতের সঙ্গে দিবি আজ থেকে।

মাথা চুলকাইয়া অনন্ত বলিল, আজ্ঞে, পাকেনি এখনও পাপড়িগুলো।

ওদিকে আস্তাবলে ঘোড়াটা অসহিষ্ণুভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় ঈষৎ বিরক্তিভরেই বলিলেন, নিতে বেটার কি বুড়ো বয়সে ঘুম বাড়ছে নাকি? যা দেখি, নিতেকে ডেকে দে। তুফান ছটফট করছে। ডাকছে, শুনছিস না?

তুফান ওই ঘোড়ার নাম। রায়বাড়ির নয়টি আস্তাবলের মধ্যে এই একটা ঘোড়া অবশিষ্ট আছে। বৃদ্ধ তুফান পঁচিশ বৎসর পূর্বের অসমসাহসী জোয়ান বিশ্বম্ভর রায়ের দুর্দান্ত বাহন। সেকালে, সেকালে কেন, দুই বৎসর পূর্বেও দেশদেশান্তরের পথচারী বাদশাহী-সড়কের উপর প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ার পিঠে মাথায় পাগড়ি-বাঁধা, গৌরবর্ণ, বীরবপু আরোহীকে দেখিয়া এ দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিত, কে হে উনি?

লোকে বলিত, আমাদের রাজা উনি—বিশ্বম্ভর রায়। বড়দরের শিকারী, বাঘ মারা ওঁর খেলা।

অপরিচিত পথিক সসম্ভ্রমে চোখ তুলিয়া দেখিত, সাদা ঘোড়া তাহার আরোহীকে লইয়া দূরান্তরে মিলাইয়া গিয়াছে। দূরে উড়িতেছে শুধু ধুলার একটা কুণ্ডলী, একটা প্রক্ষিপ্ত ঘূর্ণি যেন পাক দিতে দিতে দিগন্তে মিশাইবার জন্য ছুটিয়াছে।

নিত্যনিয়মিত দুর্দান্ত তুফান বিশ্বম্ভর রায়কে লইয়া ভোরে বাহির হইত। দুই বৎসর পূর্বে যেদিন মহাজন গাঙ্গুলীরা সমারোহ করিয়া গ্রামে গ্রামে ঢোল-শোহরত দ্বারা দখল ঘোষণা করিল, সেই দিন হইতে দেখা গেল—তুফানের পিঠ সওয়ারশূন্য, নিতাই সহিস মুখেই লাগাম ধরিয়া তুফানকে টহল দিয়া ঘুরাইয়া আনিতেছে।

নায়েব তারাপ্রসন্ন একদিন বলিয়াছিল, আপনার এতদিনের অভ্যেস ছাড়লে শরীর—

বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি দেখিয়া তারাপ্রসন্ন কথা শেষ করিতে পারে নাই।

রায় উত্তর দিয়াছিলেন দুইটি কথায়, ছি, তারাপ্রসন্ন!

অনন্ত নীচে যাইতেছিল। বিশ্বম্ভর আবার ডাকিলেন, শোন্।

অনন্ত ফিরিল।

বাবু বলিলেন, নিতাই কাল বলছিল, তুফান দানা নাকি পুরো পাচ্ছে না!

অনন্ত বলিল, ছোলা এবার ভাল হয় নি, তাই নায়েববাবু বললেন—

হুঁ।

আবার ফরসিতে গোটাকয় টান মারিয়া বলিলেন, তুফান কি খুব রোগা হয়ে গেছে?

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, না। তেমন কই?

হুঁ।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, দানা পুরোই দিবি, বুঝলি? নায়েবকে আমার নাম করে বলাবি। যা তুই, নিতাইকে ডেকে দে।

অনন্ত চলিয়া গেল। তাকিয়ার উপরে ঠেস দিয়া উর্ধ্বমুখে বিশ্বম্ভরবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নলটা পাশে পড়িয়া আছে। আকাশের তারাগুলি একের পর এক নিবিয়া আসিতেছিল। বিশ্বম্ভর অন্যমনস্কভাবে বোধ করি আপনার প্রশস্ত বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন—এক—দুই। প্রথম দিন তুফানের পিঠে সওয়ার হইতে গেলে এই পাঁজরাখানাতেই ধাক্কা লাগিয়াছিল। সেদিনের সে কি রূপ তুফানের! সে কি দুর্দান্তপনা! শান্ত হইত সে শুধু বাজনার শব্দে। বাজনা বাজিলে সে কখনও বেতালা পা ফেলে নাই। ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে কি নৃত্য তাহার!

বিশ্বম্ভরবাবু উঠিয়া পড়িলেন। অতীতের স্মৃতি তারকারাজির মত বুকের আকাশে রায়বংশের মর্যাদার ভাস্কর-প্রভায় ঢাকা পড়িয়া থাকে। আজ মমতার ছায়ায় সে ভাস্করে অকস্মাৎ সর্বগ্রাসী গ্রহণ লাগিয়া গেল। স্মৃতির উজ্জ্বলতম তারকা—তুফান, সে আকাশে সর্বাগ্রে জ্বলজ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। আজ দুই বৎসর তিনি নীচে নামেন নাই। দুই বৎসর

পরে তুফানকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। খড়ম-জোড়াটা পায়ে দিয়া রায় দোতালায় নামিলেন। চকমিলানো বাড়ির সুপরিসর সুদীর্ঘ বারান্দা রায়ের বলিষ্ঠ পদের খড়মের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। বারান্দায় সারি সারি গোল থামের মাথায় খড়খড়ি হইতে সচকিত কতকগুলা চামচিকা ফরফর করিয়া উড়িয়া গেল। এ পাশে অন্ধকার তালাবন্ধ ঘরগুলার ভিতরেও চামচিকার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। ছাদের সিঁড়ির পাশেই বিছানাঘর। তুলার টুকরা বারান্দায় পড়িয়া আছে। তাহার পরই একটা দুর্গন্ধ। এটা ফরাসঘর। জাজিম, শতরঞ্চি, গালিচা থাকে। বোধ হয় কিছু পচিয়া থাকিবে। পরের ঘরটায় চামচিকার পক্ষতাড়নের শব্দের সঙ্গে ঝুনঝান শব্দ উঠিতেছে। বাতিঘর এটা। বেলোয়ারী ঝাড়ের কলমগুলি বোধ হয় দুলিতেছে। ইহার পরই এ পাশের কোণের ঘরটা ছিল ফরাস-বরদারের। এই সমস্ত জিনিসের ভার ছিল তাহার উপর। ঘরখানা শূন্য পড়িয়া আছে।

পূর্বমুখে রায় মোড় ফিরিলেন। পত্তনীদার-মহল এটা। রায়দের দপ্তরে বিভিন্ন জেলার বড় বড় ধনী পত্তনীদার ছিল। পাঁচ শত হইতে পাঁচ হাজার টাকা খাজনা রাখিত, এমন পত্তনীদারের অভাব ছিল না। তাঁহারা আসিলে এইখানে তাঁহাদের বাসস্থান দেওয়া হইত। বারান্দার দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া রায় একবার চাহিলেন। প্রথমখানির ছবি নাই, কাচ নাই, শুধু ফ্রেমখানা ঝুলিতেছে। দ্বিতীয়খানার কাচ নাই। তৃতীয়খানার স্থান শূন্য। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় আবার নতমুখে চলিলেন। উপরে কড়ির মাথায় পায়রাগুলি অবিরাম গুঞ্জন করিতেছে। পূর্বমুখে বারান্দার প্রান্তেই সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া রায় নীচে আসিয়া নামিলেন। দুই বৎসর পর আজ আবার তিনি নীচে নামিলেন। সেরেস্তাখানার সারি-সারি ঘরে রায়বংশের রাশি-রাশি কাগজ বোঝাই হইয়া আছে।

সাত রায়ের ইতিহাস। বিশ্বম্ভর রায় জমিদার রায়বংশের সপ্তম পুরুষ। অন্ধকারের মধ্যে রায় ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার মনে পড়িল রায়বংশের আদিপুরুষের কথা। তিনি নাকি বলিতেন, মা-লক্ষ্মীকে বাঁধতে হলে মা-সরস্বতীর দয়া চাই। কাগজের ওপর কালির গুটির শেকল—ও বড় কঠিন শেকল। হিসেব-নিকেশের শেকল ঠিক রেখো

—চঞ্চলায় আর নড়বার ক্ষমতা থাকবে না। তিনি ছিলেন নবাব-দরবারের কানুনগো।

কাগজ, কলম, কালি—সবই ছিল, কিন্তু মা-লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন।

বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা কুকুর কোথায় অন্ধকারে শুইয়া ছিল, সেটা ঘেউ-ঘেউ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। রায় গ্রাহ্য করিলেন না, অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কুকুরটার ঘেউঘেউ থামিয়া গেল। সে লেজ নাড়িয়া বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া রায়কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। কুকুরটা শখ করিয়া কেহ পোষে নাই। রায়বাড়ির উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের সন্ততি কেহ।

কাছারির দেউড়ি পার হইয়া দক্ষিণে গোশালা, বামে আস্তাবল।

তাহার ওদিকে দেবতাদের মন্দির।

রায় ডাকিলেন, নিতাই!

সসম্ভ্রম কণ্ঠের জবাব আসিল, হুজুর।

তুফানের উচ্চ হ্রেষারবে সে জবাব ঢাকা পড়িয়া গেল। ওদিক হইতে একটা হাতির গর্জন শোনা গেল।

রায় অগ্রসর হইয়া তুফানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থিরভাবে পা ঠুকিয়া ডাক দিয়া বৃদ্ধ তুফান শিশুর মত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মুখে হাত বুলাইয়া রায় বলিলেন, বেটা!

তুফান মাথাটা মনিবের হাতে ঘষিতে লাগিল। ওদিকে হাতিটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত ডাকিয়া ডাকিয়া সে পায়ের শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। মাহুত রহমত প্রভুর সাড়া পাইয়া উঠিয়া আসিয়া আপনার হাতির নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। সে অতি মৃদু অনু-যোগের সুরে বলিল, হুজুর, ছোটগিন্নী শিকলি ছিঁড়ে ফেলবে।

হস্তিনীটির নাম ছোটগিন্নী; বিশ্বম্ভরবাবুর মায়ের বিবাহের যৌতুক এই ছোটগিন্নী। তখন নাম ছিল মতি। কিন্তু কর্তা ধনেশ্বর রায় শিকার করিয়া ফিরিয়া মতি বলিতে পাগল হইয়া উঠিলেন। মতি একটা চিতা-বাঘকে শুঁড়ে ধরিয়া পদদলিত করিয়াছিল। মতির প্রতি যত্নের আধিক্য দেখিয়া বিশ্বম্ভরের মা তাহার নাম দিয়াছিলেন, সতীন। কর্তা বলিয়াছিলেন, সেই ভাল রায়-গিন্নী, ওর নামও থাকুক—গিন্নী।

বিশ্বম্ভরবাবু; মা বলিয়াছিলেন, শুধু গিন্নী নয়, ছোটগিন্নী, ও তোমার দ্বিতীয় পক্ষ।

রহমতের কথায় বিশ্বম্ভরবাবু তুফানকে ছাড়িয়া ছোটগিন্নীর সম্মুখে গেলেন। পিছনে তুফানের অসন্তুষ্ট হ্রেষারব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রায় ছোটগিন্নীকে বলিলেন, কি গো মা-লক্ষ্মী? ছোটগিন্নী আপনার শুঁড়খানি বাঁকাইয়া রায়ের সম্মুখে ধরিল। এটুকু তাঁহাকে সওয়ার হইবার জন্য অনুরোধ; রায় হাতিতে উঠিতেন শুঁড় বাহিয়া।

রায় তাহার শুঁড়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, এখন নয় মা।

ছোটগিন্নী কথা বুঝিল। সে শুঁড়খানি রায়ের কাঁধের উপর রাখিয়া লক্ষ্মী মেয়েটির মতই শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রায় কহিলেন, নিতাই, তুফানকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।

একান্ত সঙ্কোচভরে নিতাই বলিল, তুফান আর যাবে না আজ, হুজুর। আপনাকে দেখেছে, আপনি সওয়ার না হলে—

রায় এ কথার কোন জবাব দিলেন না। ছোটগিন্নীর শুঁড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, লক্ষ্মী মেয়ে, মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে।

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ প্রত্যুষের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিচিত্র সঙ্গীতে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। সচকিত রায় ছোটগিন্নীর শুঁড়খানি নামাইয়া দিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যাণ্ড বাজে কোথায় রে?

নিতাই মৃদুস্বরে জবাব দিলে, গাঙ্গুলীবাড়িতে বাবুর ছেলের ভাত।

অভ্যাসমত রায় বলিলেন, হুঁ।

তুফান তখন ঘাড় বাঁকাইয়া তালে তালে নাচিতে শুরু করিয়াছে। রায় মৃদু হাসিয়া তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। পিছনে ছোট-গিন্নীর পায়ের শিকলও তালে তালে নূপুরের মত বাজিতেছিল, ঝুম—ঝুম—ঝুম।

রায় দেউড়ি পার হইয়া অন্ধকার পুরীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, এককালে ভোরের নহবতের সঙ্গে এমনই করিয়া নিত্য নাচিত—এক দিকে তুফান অন্যদিকে ছোটগিন্নী।

দোতালায় উঠিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত।

হুজুর?

নায়েবকে ডেকে দে।

রায় ছাদে গিয়া বসিলেন। প্রৌঢ় নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া নীরবে সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, মহিম গাঙ্গুলীর ছেলের অন্নপ্রাশন ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

নিমন্ত্রণ-পত্র করেছে বোধ হয় ?

কুণ্ঠিতভাবে তারাপ্রসন্ন বলিল, হ্যাঁ।

একখানা গিনি আর থালা—একখানা কাঁসার থালাই পাঠিয়ে দেবে।

তারাপ্রসন্ন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহার ছিল না। কিন্তু ব্যবস্থাও বেশ মনঃপূত হয় নাই।

রায় বলিলেন, মোহর একখানা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও।

নায়েব চলিয়া গেল। রায় নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনন্ত আসিয়া কলিকা পালটাইয়া দিয়া নলটি ধরিয়া বলিল, হুজুর !

রায় অভ্যাসমত হাতটি বাড়াইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, ছোট-গিন্নীর পিঠের গদি, জাজিম, ঘণ্টা বের করে দিবি। নায়েব যাবেন গাঙ্গুলীবাড়ি লৌকুতো দিতে।

তিন পুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষ করিয়া-ছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণসমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। শুধু এই মাত্র নয়। রায়বংশ এই সপ্তম পুরুষে নির্বংশও হইয়া গেল। জেলার জজকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারের নির্দেশমত রায়বংশের লক্ষ্মী তখন ঝাঁপি হাতে দুয়ারে দাঁড়াইয়াছেন। অপেক্ষা মাত্র প্রিভি কাউন্সিলের আদেশের।

পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে বিপুল উৎসবে রায়বাড়ি মুখরিত হইয়া উঠিল। দানভোজন বিলাসব্যসন চলিয়াছিল পূর্ণিমার জোয়ারের মত। তারপরই পড়িল ভাটা। ভাটার টানে রায়বংশের সমস্ত প্রবাহটুকু নিঃশেষ হইয়া গেল। সাত দিনের দিন বিলাস হইয়া উঠিল বিষ। বাড়িতে কলেরা দেখা দিল। তাহার পর সাত দিনের মধ্যে রায়-গিন্নী, দুই পুত্র এক কন্যা, কয়েকজন আত্মীয়, সব শেষ হইয়া গেল। শুধু বিশ্বম্ভর রায় বিন্ধ্যগিরির অগস্ত্য-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষার মত নতশিরে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ভুল বলা হইল। মৃত্যুর প্রতীক্ষা সেই দিন হইতে করিয়াছিলেন কি না কে জানে, কিন্তু নতশির সেদিনও তিনি হন নাই। নতশির হইলেন আরও দুই বৎসর পরে। প্রিভি কাউন্সিলের রায় যেদিন বাহির হইল, সেই দিন। নতুবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যুর পরও এ বাড়িতে জলসাঘরে বাতি জ্বলিয়াছে, সেতার সারেঙ ঘুঙুর বাজিয়াছে। বিপুল হাস্যধ্বনিতে নিশীথরাত্রি চকিত-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ছোটগিন্নীর পিঠে শিকারের হাওদা চড়িয়াছে। তুফান সেদিনও রোষে ক্ষোভে দড়াদড়ি ছিঁড়িয়াছে।

যাক্, প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে রায়বংশের ভূসম্পত্তি সব চলিয়া গেল। রহিল বাড়িঘর ও লাখরাজের কায়েমী বন্দোবস্তটুকু। রায়বংশের আদিপুরুষ এইটুকু কাগজের উপর কালির শিকলে এমন করিয়া বাঁধিয়া ছিলেন যে, সেটুকুতে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও হইল না। ওই বন্দোবস্তেই দেবসেবা চলে, ছোটগিন্নীর বরাদ্দ চাউল আসে, রহমতের বেতন হয়; মোট কথা, এখনও যেটুকু আছে, সে সেই বন্দোবস্তেরই কল্যাণে। এখন মাসের প্রথমেই চাল আসে—মাসবরাদ্দ বাদশাভোগ চাল, নিত্য প্রাতে লাখরাজ বিল বন্দোবস্তের দরুন আসে মাছ, ওই বিল হইতেই জলচর পাখির বন্দোবস্তের ফলে আসে—পাখি। এ সমস্ত অতীত, কিন্তু স্মরণাতীত নয়। তাই এই জীর্ণ ফাটল-ধরা রায়বাড়ির নাম এখনও রাজবাড়ি, শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর রায়ের নামই এ অঞ্চলে রায়-হুজুর।

সেইটুকুই হইল নূতন ধনী গাঙ্গুলীবাবুদের ক্ষোভের কারণ, তাঁহারা সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা-পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা-পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হস্তিনীর খাতির বেশি।

মহিম গাঙ্গুলী ভাবে, মরা-পাহাড়ের চুড়ো ভাঙতেই হবে আমায়।

ছোটগিন্নীর পিঠে ঘণ্টা উঠিতেই, সে গরবিনীর মত গা দোলাইতে আরম্ভ করিল। ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ঢং—ঢং—ঢং।

নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভর বাবু বসিয়া ছিলেন অন্দরের হল-ঘরে। এখন এই একখানি ঘরই তিনি ব্যবহার করেন। দেওয়ালে রায়বংশের কর্তা-গিন্নীদের ছবি টাঙানো।

সকলেরই প্রৌঢ় বয়সের প্রতিকৃতি। সকলেরই গায়ে কালী-নামাবলী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে জপমালা। বিশ্বম্ভরবাবু সেই ছবির দিকে চাহিয়া ছিলেন। নায়েবকে দেখিয়া ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া ডাকিলেন, অনন্ত, হাত-বাক্সটা দে তো।

হাত-বাক্স হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি লইয়া সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিলেন। সিন্দুকের উপরের থাকে রায়বাড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপি শোভা পাইতেছিল। নীচের থাকে দুই-তিনটি বাক্স। রায় টানিয়া বাহির করিলেন একটি অতি সুদৃশ্য বাক্স। এটি তাঁহার মৃতা পত্নীর গহনার বাক্স। রায় বাক্সটি খুলিলেন, বাক্সটির গর্ভ প্রায় শূন্য। অলঙ্কারের মধ্যে একটি সিঁথি রহিয়াছে। এই সিঁথিটি সাতপুরুষের বধূবরণের মাঙ্গলিক সামগ্রী। ওইটা ছাড়া সব গিয়াছে। পাশের একটি খোপে কয়খানি মোহর।

এগুলির কয়খানি রায়-গিন্নীর আশীর্বাদের মোহর, কয়খানা যুবক বিশ্বম্ভরের পত্নীকে প্রথম উপহার। বিবাহের বৎসরই প্রথম তিনি মহালে যান। নজরানার মোহর হইতে কয়খানা তিনি পত্নীকে উপহার দিয়াছিলেন। তাহারই একখানা লইয়া নায়েবের হাতে নিঃশব্দে তিনি তুলিয়া দিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরই ছোটগিন্নীর ঘণ্টার শব্দ সুউচ্চ হইয়া উঠিল। রায় আসিয়া জানালায় দাঁড়াইলেন।

ছোটগিন্নীর মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে—ললাটের তৈলসিক্ত অংশটুকু ঘিরিয়া সিন্দূরের রেখা আঁকা। ছোটগিন্নী হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে।

অপরাহ্নে গাঙ্গুলীদের ঝকঝকে মোটরখানা আসিয়া লাগিল রায়-বাড়ির ভাঙা দেউড়িতে। গাড়ি হইতে নামিলেন মহিম গাঙ্গুলী নিজে। নায়েব তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন, আসুন।

অনন্তও দোতালা হইতে ঘটনাটা দেখিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া রায়বাড়ির খাস বৈঠকখানার দরজাটা খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মহিম কহিল, ঠাকুরদা কোথায়—দেখা করব যে!

গাঙ্গুলীবংশ চিরদিন রায়-দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করিয়াছে।

মহিমের পিতা জনার্দন পর্যন্ত রায়বাড়ির কর্তাকে বলিয়াছে—হুজুর। তারাপ্রসন্ন মহিমের কথার ভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মুখে মিষ্টভাবেই বলিল, হুজুর এখনও ওঠেন নি। খেয়ে শুয়েছেন।

মহিম বলিল, ডেকে তুলতে বলে দিন।

তারাপ্রসন্ন শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, সে সাহস আমাদের কারও নেই। আপনি বরং বলে যান আমাকে কী বলতে হবে, আমি বলব।

অসহিষ্ণুভাবে মহিম বলিল, না, আমাকে দেখা করতেই হবে।

অনন্ত আসিয়া রুপার গ্লাসে গাঙ্গুলীর সম্মুখে শরবত ধরিল।

গ্লাসটি লইয়া মহিম অনন্তকে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদা উঠেছেন রে?

উঠেছেন! আপনার খবর দিয়েছি। ডাকছেন আপনাকে তিনি।

শরবত পান করিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ চমৎকার গন্ধটুকু তো! কিসের শরবত রে।

অনন্ত মিথ্যা কথা বলিল, আজ্ঞে কাশীর মসলা, আমি জানি না ঠিক।

দোতালায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, কই ঠাকুরদা, আপনি যে খেতে গেলেন না?

বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন, এসো এসো, বসো ভাই।

মহিম বলিল, আমার ভারী দুঃখ হয়েছে ঠাকুরদা।

তেমনই হাসিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, বুড়ো ঠাকুরদা বলে ভুলে যাও ভাই। বুড়ো মানুষ, নিয়মের ব্যতিক্রম দেহে সহ্য হয় না।

মহিম বলিল, সে দুঃখ ভুলব কিন্তু রাত্রে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।

বিশ্বম্ভর ফরসি টানার ভানে নীরব রহিলেন।

মহিম বলিয়া গেল, শখ করে লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী আনিয়েছি। তাদের গানের কদর আপনি ভিন্ন আমরা বুঝব না।

কিছুক্ষণ নীরবে তামাক টানিয়া নলটি রায় রাখিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, শরীর আমার বড় খারাপ ভাই মহিম, বুকে একটা ব্যথা হয়েছে ইদানীং, সেটা মাঝে মাঝে বড় কাতর করে আমাকে।

মহিম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তা হলে উঠি ঠাকুরদা। আমায় যেতে হবে একবার সদরে। সাহেব-সুবোদের নিয়ে আসতে হবে আবার, তাঁরা সব আসবেন কিনা।

বিশ্বম্ভর শুধু বলিলেন, দুঃখ কোরো না ভাই।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় একবার দাঁড়াইয়া সহসা বলিয়া উঠিল, বাড়িটা করে রেখেছেন কী ঠাকুরদা, মেরামত করানো দরকার যে!

সে কথার কেহ জবাব দিল না।

অনন্ত শুধু বলিল, আসুন হুজুর।

গাঙ্গুলীবাড়িতে নাচের আসর আলোর ঐশ্বর্যে ঝকঝক করিতেছিল। চাঁদোয়ার চারিপাশে নানা রঙের আলো। গাঙ্গুলীদের নিজেদের 'ডায়নামো'। ইলেকট্রিক তারের লাইন বাড়াইয়া আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে। খুঁটিগুলি গাছের পাতা ও ফুল দিয়া সাজানো। রঙিন কাগজের মালা চারিপাশ বেড়িয়া ঝুলিতেছে। নীচে শতরঞ্চির উপর চাদর বিছাইয়া আসর পড়িয়াছে। এক দিকে সারি-সারি চেয়ার, অন্যদিকে ঢালা বিছানায় সাধারণ শ্রোতাদের বসিবার স্থান। খানিক দূরে মেয়েদের আসর।

রাত্রি আটটার মধ্যেই আসর ভরিয়া গেল। তবলচী সারেঙ্গীদার আপন আপন যন্ত্রের সুর বাঁধিতেছিল। দুইজন পশ্চিমা নর্তকী পেশোয়াজ-ওড়নায়-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া আসরে আসিয়া বসিল। আসরের কোলাহল মুহূর্তে নীরব হইয়া গেল। হাঁ, রূপ বটে!

গান আরম্ভ হইল। ওদিকে চেয়ারে বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে মহিম গাঙ্গুলী বসিয়া।

দুইজন নর্তকীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা উঠিয়া গান ধরিয়াছিল। দীর্ঘ সুরে রাগিণীর আলাপে আসরখানা যেন ঝিমাইয়া আসিল। শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তা শুরু হইয়া গেল। বিশিষ্ট শ্রোতামহলে কী একটা হাস্যপরিহাস চলিতেছিল। গাঙ্গুলীবাড়ির চাপরাসীর দল সাধারণ শ্রোতাদের পিছনে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া উঠিল, চুপ—চুপ।

গান শেষ হইবার মুখে মহিম ভদ্রতা করিয়া বলিয়া উঠিল বাঃ—বাঃ! নর্তকীর নৃত্যগতি যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। গান শেষ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। তরুণীটির সহিত মৃদু হাসিয়া কী কয়টা কথা বলিয়া এবার তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল। দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। চপল গতির কণ্ঠসঙ্গীতে ও চটুল নৃত্যভঙ্গীতে যেন একটা পাহাড়ী ঝরনা আসরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারিফে

তারিফে আসরের মধ্যে একটা কলরোল উঠিল। বিশিষ্ট শ্রোতামহল হইতে টাকা নোট বকশিশ আসিল।

তারপর আবার—আবার—আবার। আর আসর অলস মন্থর হয় নাই। আসর ভাঙিলে মহিম ডাকিয়া বলিল, সকলে খুব খুশি হয়েছেন।

সেলাম করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, আপনাদের মেহেরবানি।

সত্যই মহিমের মেহেরবানির অন্ত ছিল না। তিন দিন বায়নার স্থলে পাঁচ দিন গাওনা হইয়া তবে শেষ হইল।

বিদায়ের দিন আরও মেহেরবানি সে করিল। বিদায় করিয়া বলিয়া দিল, এখানে আমাদের রায়বাড়ি আছে, একবার ঘুরে যেও। বিশ্বম্ভর রায় সমঝদার আমীর লোক। গাওনা হয়তো হতে পারে।

বয়োজ্যেষ্ঠা সম্ভ্রমস্বরে বলিল, ওঁর কথা আমরা শুনেছি হুজুর। জরুর যাব রাজবাহাদুরের দরবারে। সে মতলব আমার প্রথম থেকেই আছে।

তারাপ্রসন্ন মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল, এ ওই কুটিল মহিম গাঙ্গুলীর কূট চাল। অবশেষে একটা বেশ্যাকে দিয়া অপমানের চেষ্টা করিয়াছে। সে গম্ভীরভাবে বলিল, বাবুর তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি—নাচগান এখন হবে না।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজীটি বলিল, মেহেরবানি করকে—

বাধা দিয়া তারাপ্রসন্ন বলিল, সে হয় না।

বাইজী দুঃখিতভাবে বলিল, সে হয় না।

তাহারা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

এমন সময়ে দোতলা হইতে হাঁক আসিল, তারাপ্রসন্ন!

তারাপ্রসন্ন আসিতেই বিশ্বম্ভর বলিলেন, কে ওরা?

নতমুখে তারাপ্রসন্ন উত্তর দিল, গাঙ্গুলীদের বাড়ি ওরাই এসেছিল মুজরো করতে।

হুঁ। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, শুধু হাতে ফিরিয়ে দিলে?

সেলাম পৌঁছে হুজুরকো পাশ। মুসলমানী কায়দায় আভূমিনত অভিবাদন করিয়া বাইজী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কাছারিঘর হইতে এদিকের বারান্দা ও ঘরের খানিকটা দেখা যায়। বিশ্বম্ভরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাইজী তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিয়াছে।

এত্তালা না দিয়া উপরে উঠিয়া আসার জন্ত বিশ্বম্ভর রুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে রাগ রহিল না। বাইজীর রূপ তাঁহার চিত্ত কোমল করিয়া দিল।

বাইজী আবার অভিবাদন করিয়া বলিল, কসুর মাপ করতে হুকুম হয় মেহেরবান ; এত্তালা না দিয়ে এসে পড়েছি।

বিশ্বম্ভর দেখিতেছিলেন বাইজীর রূপ। দাড়িমের দানার মত রঙ, সুর্মা-আঁকা টানা তুইটি চোখ—মাদকতা-ভরা চাহনি, গোলাপের পাপড়ির মত তুই ঠোঁট, ঈষৎ-দীর্ঘ দেহখানি, ক্ষীণ কটি, নৃত্য যেন আলস্তভরে দেহখানিতে বিরাম লইতেছে। এ চঞ্চল হইলেই সে মুখর হইয়া উঠিবে।

বিশ্বম্ভর প্রসন্ন হাস্তে বলিলেন, বৈঠিয়ে।

অদূরবর্তী গালিচার উপর বাইজী সসম্ভ্রমে বসিয়া বলিল, হুজুর বাহাতুরের দরবারে বাঁদী গান শোনাবার জন্ত হাজির।

বিশ্বম্ভর বলিতে গেলেন, তাঁহার .তবিয়ত খারাপ। কিন্তু কেমন লজ্জা হইল, একটা তওয়াইফের সম্মুখে মিথ্যা বলিতে বুঝি ঘৃণা হইল।

বাইজী বলিল, সবার মুখে শুনেছি, এখানকার বড় ভারী সমঝদার হুজুর বাহাতুর। গাঙ্গুলীবাবুও বললেন, আমীর—এখানকার রাজা আপনি।

রায়ের নলের ডাক বন্ধ হইয়া গেল। মৃতু হাসিয়া বাইজীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হবে মজলিস সন্ধ্যের সময়। তারপর ডাকিলেন, অনন্ত !

অনন্ত বাহিরেই ছিল। সম্মুখে আসিতে বলিলেন, এঁদের বাসা দিয়ে দে। নিচে তালুকদারের ঘর একখানা খুলে দে।

অনন্ত বলিল, আসুন।

বাংলা বলিতে না পারিলেও বাংলা বুঝিতে বাইজীর কষ্ট হইল না। উঠিয়া অভিবাদন করিয়া সে কহিল—বহুত নসীব মেরে—বহুত মেহেরবানি হুজুরকো।

অনন্তকে অনুসরণ করিয়া সে চলিয়া গেল।

নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া ছিল—নির্বাক হইয়া সে দাঁড়াইয়াই রহিল। কিছুক্ষণ পর সে কহিল, গাঙ্গুলীদের বাড়ি একশো টাকা করে রাত্রে নিয়েছে ওরা।

হুঁ।

কয়বার নলে টান দিয়া রায় বলিলেন, তোমার তহবিলে কি—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি আবার নলে টান দিতে আরম্ভ করিলেন। তারাপ্রসন্ন বলিল, দেবোত্তরের তহবিলে শুধু শ-দেড়েক টাকা আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া বাহির করিলেন সেই বাক্সটি। বাক্সের মধ্য হইতে রায়বংশের মাঙ্গলিক সিঁথিখানি তুলিয়া তারাপ্রসন্নের হাতে দিয়া বলিলেন, দেবোত্তরের খাতায় খরচ লেখ—আনন্দময়ীর জন্যে জড়োয়া সিঁথি খরিদ, দাম ওই দেড়শো টাকা।

আনন্দময়ী রায়বংশের ইষ্টদেবী পাষাণময়ী কালী।

বহুদিন পর নিস্তব্ধ রায়বাড়ি তালা-খোলার শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। জলসাঘরের দরজা জানালা খুলিয়া গেল। বাতিঘরের তালা খুলিল। ফরাসঘরে আলোক প্রবেশ করিল।

অনন্ত ঘর-দুয়ার ঝাড়িতেছিল। সাহায্য করিতেছিল নিতাই ও রহমৎ। ঠাকুরবাড়ির পুরানো ঝি মাজিতেছিল—আসাসোঁটা, গড়গড়া, বড় বড় পরাত, গোলাপপাশ, আতরদান। নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া সমস্ত দিকের তদারক করিতেছিল।

অনন্ত বলিল, সদরে লোক পাঠাতে হবে নায়েববাবু।

নায়েব বলিল, ফর্দ করেছি আমি। শোন দেখি কিছু ভুল হল কিনা।

ফর্দ শুনিয়া অনন্ত কহিল, সবই হয়েছে, বাদ পড়েছে দুটো জিনিস। ভরি দুই আতর আর বিলিতী বোতল কটা।

নায়েব বলিল, ছিল তো একটা।

তাতে খানিকটা আছে। মাঝে মাঝে একটু একটু এক এক দিন খান তো। তবে আজ যদি চান, তবে একটা বোতলে হবে না নায়েববাবু।

নায়েব বলিলেন, কিন্তু পাঠাই কাকে? পায়ে হেঁটে সন্ধ্যের আগে কে ফিরবে?

অনন্ত দ্বিধাভরে বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাই-ই নয় যাক

নিতাই বলিল, হুজুর হুকুম না করলে—

নায়েব বলিল, আচ্ছা, আমি বলে আসছি।

বিশ্বম্ভরবাবু শুইয়া ছিলেন। নায়েব গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি

বলিলেন, তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম। একবার গাঙ্গুলীবাড়িতে যাও, মহিমকে নিমন্ত্রণ করে এস। আর গ্রামে ভদ্রলোক বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করতে হবে। গাঙ্গুলীবাড়ি যাও তুমি নিজে।

নায়েব বলিল, তাই যাব।

রায় বলিলেন, ছোটগিন্নীর পিঠে গদি দিতে বল।

নায়েব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাইকে পাঠানো দরকার সদরে।

হুঁ।

কিছুক্ষণ পর রায় বলিলেন, তাই যাক।

আরও কিছুক্ষণ পর তুফানের হ্রেষা শুনিয়া রায় সম্মুখের জানালাটা খুলিয়া দিলেন। বাড়ির পিছন দিয়া দেবদারুছায়াচ্ছন্ন রায়দের নিজস্ব পথখানি পরিষ্কার দেখা যায়। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ সে পথে বাজিয়া উঠিল। রায় দেখিলেন, ঘাড় বাঁকাইয়া দীপ্ত পদক্ষেপে তুফান দুর্দান্তপনা করিতে করিতে চলিয়াছে। তেমনই বাঁকানো ঘাড়, তেমনই পদক্ষেপ।

আর কিছুক্ষণ পর ছোটগিন্নীর পিঠের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

রায় উঠিয়া বসিলেন। জানালা দিয়া দেখিলেন, গরবিনী ছোটগিন্নী চলিয়াছে। রায় বিছানা ছাড়িয়া ঘরের মেঝের উপর পদচারণা আরম্ভ করিলেন। দেহ-মন কেমন তাঁহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

সমারোহ! রায়বাড়িতে বহুদিন পর সমারোহ!

ওদিকের জলসাঘর হইতেই বোধকরি শব্দ আসিতেছিল—ঠুং—ঠাং—ঠুং—ঠাং। বেলোয়ারী ঝাড়ের শব্দ। রায় ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অনন্ত ঝাড় দেওয়ালগিরি হুকে হুকে টাঙাইতে-ছিল। পদশব্দে দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর রায়। তিনি চাহিয়া আছেন—দেওয়ালের ছবিগুলির দিকে। প্রকাণ্ড হলের চারিদিকে রায়বংশের মালিকদের যুবাবয়সের প্রাচীর-বিলম্বিত প্রতিকৃতি। আদিপুরুষ ভুবনেশ্বর রায় হইতে তাঁহার নিজের পর্যন্তসকলেরই বিলাস ও ব্যসনে মত্ত প্রতিকৃতি। পিতামহ রাবণেশ্বর রায় দাঁড়াইয়া আছেন—শিকার-করা বাঘের উপর পা রাখিয়া—হাতে সড়কি-বল্লম, পিঠে ঢাল। পিতা ধনেশ্বর বসিয়া আছেন গদির উপর, পাশে বসিয়া ছোটগিন্নী। যুবক বিশ্বম্ভর তুফানের উপর আরূঢ়।

রায়বংশ এই ঘরে ঝড়ের খেলা খেলিয়া গিয়াছে। রায়ের মনে পড়িল কত কথা। দুর্দান্ত রাবণেশ্বর এ বংশের প্রথম ভোগী পুরুষ। তিনি জলসাঘর তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। কিন্তু ভোগ করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। প্রথম যে দিন এই জলসাঘরে তিনি মজলিস করিয়াছিলেন, সেই দিনই রাবণেশ্বরের স্ত্রী-পুত্র সব শেষ হইয়াছিল। বাতিদানের বাতি অর্ধদগ্ধ অবস্থাতেই নিবিয়াছিল। তারপর আর তিনি সাহস করিয়া জলসাঘরের দুয়ার খোলেন নাই।

সেই দিন রায়বংশের শেষ হইলেই যেন ভাল হইত। কিন্তু রাবণেশ্বর রায়বংশের মমতায় পুনরায় আপনার শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এ তাঁহার আনন্দময়ীর আদেশ। তাঁহারই পুত্র তারকেশ্বর এই জলসাঘরের দুয়ার খুলিয়া আবার বাতি জ্বালিয়াছিলেন। তিনি এক রাত্রে এই ঘরে এক আমীর বন্ধুর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পাঁচ শত মোহর এক বাইজীকে বকশিশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথা মনে পড়িল—চন্দ্রা, চন্দ্রাবাই! আসর ভাঙার পর বন্ধুদের লুকাইয়া চন্দ্রার সহিত আলাপ বুকের মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে। ফুলের স্তবকের মত চন্দ্রা।

অনন্তের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাত আর সরিতেছিল না। রায়ের মুখখানা থমথমে রাঙা—যেন কোন রুদ্ধমুখ শিরা খুলিয়া আবদ্ধ রক্তধারা সে মুখে উৎসের মত আজ উথলিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্বে অনন্ত পরাতের উপর রুপার গ্লাসে শরবৎ বসাইয়া রায়ের সম্মুখে নিঃশব্দে ধরিয়া দিল। রায় চাহিয়া দেখিলেন, অনন্তের অঙ্গে জমিদার-চোপদারের উর্দি, কোমরে পেটি, মথায় পাগড়ি, বুকে রায়বাড়ির তকমা। তিনি নিঃশব্দে গ্লাসটি উঠাইয়া লইলেন। অনন্ত চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখে কোঁচানো ধুতি, শুভ্র ফিনফিনে মিহি মুসলমানী ঢঙের পাঞ্জাবি, রেশমের চাদর নামাইয়া রাখিল; রায় চিনিলেন, পাঁচ বৎসর পূর্বে মুরশিদাবাদে জমিদার বন্ধুর বাড়ি যাইবার সময় এই পোশাক তৈয়ারী হইয়াছিল।

প্রশ্ন করিলেন, সব ঠিক আছে?

মৃদুস্বরে অনন্ত বলিল, বাতি জ্বালা হচ্ছে।

লোকজন ?

অনন্ত বলিল, নাথরাজদার ভাণ্ডারীরা বাপ-বেটায় এসেছে। দেবোত্তরে নাথরাজদার পাইক এসেছে চারজন, তারা দেউড়িতে আছে।

নিচে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল।

অনন্ত ত্রস্তপদে নিচে চলিয়া গেল। মহিম গাঙ্গুলী আসিয়াছে। সিঁড়ির বুকে চলা-ফেরার শব্দ শোনা যায়। নিচের তলায় অতিথি-অভ্যর্থনার সাদর সম্ভাষণ, পরস্পরের সহিত আলাপের গুঞ্জন উঠিতেছে। ক্রমে জলসাঘরে তারের যন্ত্রের মৃদু সুর জাগিয়া উঠিল। তবলার ধ্বনিও শোনা গেল। সুর বাঁধা হইতেছে।

অনন্ত আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, হুজুর !

বিশ্বম্ভর বেশ পরিবর্তন করিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছিলেন। উত্তর দিলেন, হুঁ ?

আসর বসতে পারছে না।

হুঁ।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি বলিলেন, জুতো দে।

অনন্ত ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটু ইতস্তত করিয়া নীরবে কোণের টেবিলের দেরাজ খুলিয়া বোতল ও গ্লাস বাহির করিল। দেরাজের উপরে সেগুলি নামাইয়া দিয়া জুতা বাহির করিয়া ঝাড়িতে বসিল। রায় একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আবার পায়চারি শুরু করিলেন। নীচের যন্ত্রসঙ্গীতের সুর ক্রমশ উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল।

অনন্ত ডাকিল, হুজুর !

রায় শুধু বলিলেন, হুঁ।

আবার কয়বার তিনি ঘুরিলেন ; সে গতি যেন ঈষৎ দ্রুত। অনন্ত প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে রায় টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, সোডা।

প্রকাণ্ড বড় হলটার তিন দিকে লম্বা ফালির মত গদি পাতিয়া তাহার উপর জাজিম বিছাইয়া শ্রোতাদের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। পিছনে সারি সারি তাকিয়া। হলের ছাদে পাশাপাশি তিনটি বেলোয়ারী ঝাড়ে বাতি জ্বলিতেছিল। দেওয়ালে দেওয়ালে

দেওয়ালগিরিতে বাতির আলো বাতাসে ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ঝাড় ও দেওয়ালগিরির কতকগুলিতে শেজ না থাকায় বাতাসে বাতিগুলি নিবিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে তাই মধ্যে মধ্যে স্বল্পম্লান ছায়ারেখা দীর্ঘাকারে জাগিয়া উঠিয়াছে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার মত।

আসর বসিয়াছে—কিন্তু গতি এখনও অতি মৃদু। যন্ত্রবাদ্যের ঝঙ্কার অঙ্কুরের মত সবে দেখা দিয়াছে। চারিপাশের আসরে বসিয়া ত্রিশ-চল্লিশজন ভদ্রলোক মৃদু গুঞ্জনে আলাপ করিতেছেন। চার-পাঁচটা গড়গড়া-ফরসিতে তামাক চলিতেছে। তওয়াইফ দুইজনে নীরবে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে কেবল মহিম গাঙ্গুলীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সিগারেটে টান দিয়া সে নিবন্ত বাতিগুলার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কটা বাতি নিবে গেল যে হে! কেহ এ কথার জবাব দিল না। সে ডাকিল, নায়েববাবু! তারাপ্রসন্ন দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে বলিল, দেখুন, আলো বেশ খোলে নি। আমার ড্রাইভারকে বলে দিন, দুটো পেট্রোম্যাক্স নিয়ে আসুক।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল। বয়ঃজ্যেষ্ঠা নর্তকীটি কেবল উর্দুতে বলিল—যেন স্বগতোক্তি করিল, এ ঘরে সে আলো মানায় কি?

বাহিরে ভারী পায়ের জুতার আওয়াজে নায়েব পিছনে চাহিয়া দেখিয়া সসম্ভ্রমে সারিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত পরেই অনন্তের পিছনে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন বিশ্বম্ভর রায়। বাইজী দুইজন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মজলিসের সকলেও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহিমও আপনার অজ্ঞাতসারে অধোত্থিত হইয়া হঠাৎ আবার বসিয়া পড়িল।

রায় স্বল্প হাসিয়া বলিলেন, আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তারপর তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া মহিম সেটাকে সরাইয়া দিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাকিয়াটাকে কয়বার ঝাড়িয়া লইয়া [illegible] সে বলিল, বাপ রে বাপ, কি ধুলো! তারাপ্রসন্ন আতর বিলি করিয়া গেল। সমস্ত গড়গড়া-ফরসির কলিকা বদল করিয়া রায়ের সম্মুখে তাঁহার নিজের ফরসি নামাইয়া অনন্ত হাতে নল তুলিয়া দিল।

বয়ঃজ্যেষ্ঠা বাইজী কুর্নিশ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। সেই দীর্ঘ মন্থর গতিতে রাগিণীর আলাপ। কিন্তু একটু বৈচিত্র্য ছিল। আসর আজ নিস্তব্ধ। রায় চোখ মুদিয়া গম্ভীর-ভাবে বসিয়া আছেন। গানের দীর্ঘমন্থর গতির সমতায়.বিশাল দেহ তাঁহার ঈষৎ দুলিতেছে। থাকিতে থাকিতে তাঁহার বাম হাতখানি উত্থিত হইয়া পাশের তাকিয়াটির উপর একটি মৃদু আঘাত করিল। ঠিক ওই সঙ্গে তবলচীর চর্মবাদ্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। রায় চোখ মেলিলেন, বাইজীর পায়ের ঘুঙুর মৃদু সাড়া দিয়াছে। নৃত্য আরম্ভ হইল। কলাপীর নৃত্য। আকাশে মেঘ দেখিয়া উতলা ময়ূরীর মত নৃত্যভঙ্গী। গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়াছে, দুই হাতে পেশোয়াজের দুই প্রান্ত আবদ্ধ, পেখমের মত তালে তালে নাচিতেছে। চরণে ঘুঙুর বাজিয়া উঠিল।

রায় বলিয়া উঠিলেন, বাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীর নৃত্যমুখর চরণচাপল্য স্থির হইয়া গেল। ওদিকে তবলায় পড়িল সমাপ্তির আঘাত।

মহিম সরিয়া আসিয়া রায়ের কানে কানে বলিল, ঠাকুরদা, আসর যে জমছে না, গলা শুকিয়ে এল। কৃষ্ণাবাই সব ঠাণ্ডা করে দিল যে!

কৃষ্ণাবাই ঈষৎ হাসিল, বোধ করি সে বুঝিল। অনন্ত শরবৎ আনিয়া মহিমের সম্মুখে ধরিয়াছিল। মহিম কহিল, থাক্, কদিন রাত্রি জেগে সর্দি করে আছে আবার।

রায় ঈষৎ হাসিয়া অনন্তকে ইঙ্গিত করিলেন।

অনন্ত ফিরিয়া গিয়া বড় পরাতের উপর হুইস্কি, সোডার বোতল, গ্লাস লইয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

পানীয় প্রস্তুত করিয়া অনন্ত মহিমকে দিয়া দ্বিতীয় গ্লাস তুলিয়া আসরের দিকে চাহিল। সকলে নতশির হইয়া বসিয়া ছিল। সে বিশ্বম্ভর বাবুর সম্মুখে সসম্ভ্রমে পানীয় অগ্রসর করিয়া ধরিল। নীরবে রায় গ্লাসটি ধরিলেন। মহিম অনেকক্ষণ ধরিয়া তরুণী বাইজীকে লক্ষ্য করিতেছিল, একটু নড়িয়া বলিল, পিয়ারীবাই, এবার তুমি একবার আগুন ছড়িয়ে দাও দেখি! পিয়ারী গান ধরিল। জলদ গতি। রায় চোখ মুদিয়া ছিলেন, একবার কেবল ফাঁকের ঘরে বলিলেন, জেরা ধীরসে।

কিন্তু অভ্যাসের বশে পিয়ারী চটুল নৃত্যে চপল সঙ্গীতে মজলিসের মধ্যে যেন অজস্র লঘু ফেনার ফানুস উড়াইয়া দিল। মহিম মুহুর্মুহু হাঁকিতে লাগিল, বহুত আচ্ছা!

রায়-কর্তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমের সঙ্গতি-ছাড়া উচ্ছ্বাস তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।

কিন্তু তবু তিনি ঢুলিতেছিলেন। সঙ্গীতমুগ্ধ অজগরের মত। দেহের মধ্যে শোণিতের ধারা—রায়বংশের শোণিতের অভ্যস্ত উগ্রতায় বেগবতী হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী নাচিতেছে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মত। পিয়ারীকে দেখিয়া মনে পড়ে লক্ষ্ণৌয়ের জোহরার কথা। কৃষ্ণার সঙ্গে সাদৃশ্য দিল্লিওয়ালী চন্দ্রাবাইয়ের। চন্দ্রাবাই তাঁহার জীবনের একটা অধ্যায়। পিয়ারীর নৃত্য শেষ হইল। রায় ভাবিতেছিলেন অতীতের কথা। চিন্তা ভাঙ্গিয়া গেল টাকার শব্দে। মহিম পিয়ারীকে বকশিশ দিল। মহিম নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। প্রথম ইনাম দিবার অধিকার গৃহস্বামীর। চকিত হইয়া রায় সম্মুখে পাশে চাহিলেন। নাই—সম্মুখে রূপার পরাত নাই—আধারও নাই, আধেয়ও নাই। মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণাবাই তখন গান ধরিয়াছে। আসরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরঙ্গের মত তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া ফিরিতেছিল। তাহার গতি-তাড়িত বায়ুতরঙ্গ শ্রোতাদের বুকে আঘাত করিতেছে। সে গাহিতেছিল—কানাইয়ার বাঁশী বাজিয়াছে; উচ্ছ্বসিত যমুনা উজানে ফিরিল; তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাতে তটভূমি ভাঙিয়া কানাইয়াকে সে বুকে টানিয়া লইতে চায়। সে সঙ্গীত ও নৃত্যের উচ্ছ্বাস অপূর্ব! রায় সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গত শেষ হইল। রায় বলিয়া উঠিলেন, বহুত আচ্ছা চন্দ্রা!

কৃষ্ণা সেলাম করিয়া কহিল, বাঁদীকে নাম কৃষ্ণাবাই।

ওদিক হইতে মহিম ডাকিল, কৃষ্ণাবাই, থোড়া ইনাম ইধার।

রায় উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। ধীর পদক্ষেপে মজলিস অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বারান্দার বুকে পাদুকাশূন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল।

মহিম বলিল, পিয়ারীবাই, এবার তোমার আর একখানা।

কৃষ্ণা কহিল, হুজুর-বাহাদুরকে আনে দিজিয়ে।

মহিম বলিল, আসছেন তিনি, তার আর কি! ওই—ওই বোধ হয় আসছেন তিনি।

রায় নয়—প্রবেশ করিল নায়েব তারাপ্রসন্ন। একটি রূপার রেকাবি আসরে সে নামাইয়া দিল। রেকাবের উপর দুইখানি মোহর।

নায়েব বলিল, বাবু ইনাম দিলেন।

মহিম অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, তিনি কই?

তাঁর বুকে ব্যথা ধরেছে। তিনি আর আসতে পারবেন না। আপনারা গান শুনুন। তিনি মাফ চেয়েছেন সকলের কাছে।

মজলিসের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন উঠিল।

মহিম উঠিয়া তাচ্ছিল্যময় আলস্যভরে একটা আড়মোড়া ভাঙিয়া বলিল, উঠি তারাপ্রসন্ন। কাল আবার সাহেব আসবেন।

তারাপ্রসন্ন আপত্তি করিল না। অপর সকলেও উঠিয়া পড়িল। মজলিস ভাঙিয়া গেল।

ঘরের মেঝের উপর রায়-গিন্নীর হাতবাক্সটা খোলা পড়িয়া ছিল। গর্ভ তাহার শূন্য। রায় নিজে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন উন্নত শিরে। রায়বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উত্তেজনায়, সুরার উগ্রতায় দেহের রক্ত যেন ফুটিতেছিল। স্থান কাল আজ সব ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। অন্যমনস্কভাবে তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। জলসাঘরে আলোকের দীপ্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। আবার আসিয়া তিনি জলসাঘরে প্রবেশ করিলেন। শূন্য আসর। দেওয়ালের বুকে শুধু জাগিয়া আছেন রায়বংশধরগণ। বিশ্বম্ভর খোলা জানালার দিকে চাহিলেন। জোৎস্নায় ভুবন ভাসিয়া গিয়াছে। বসন্তের বাতাসের সর্বাঙ্গে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ মাখা। কোথায় কোন্ গাছে বসিয়া একটা পাপিয়া অশ্রান্ত ঝঙ্কার তুলিয়া ডাকিতেছে, পিউ-কাঁ-হাঁ—পিউ-কাঁ-হাঁ। রায়ের মনের মধ্যে সঙ্গীত গুঞ্জন করিয়া উঠিল। বহুদিনকার ভুলিয়া-যাওয়া চন্দ্রার মুখের বেহাগ—শুহু যা শুহু যা পিয়া—। মাথার উপরে চাহিয়া দেখিলেন, চাঁদ মধ্য-গগনে। পদশব্দে পিছনে ফিরিলেন। অনন্ত বাতি নিবাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

রায় নিষেধ করিলেন, বলিলেন, থাক্।

অনন্ত চলিয়া যাইতেছিল। রায় ডাকিলেন, এস্রাজটা এনে দে আমার।

অনন্ত এস্রাজ লইয়া আসিল। জানালার সম্মুখে এস্রাজ-কোলে রায় বসিয়া বলিলেন, ঢাল।

পরাতের উপর খোলা বোতল পড়িয়া ছিল—রায় ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পানীয় দিয়া অনন্ত চলিয়া গেল।

এস্রাজের তারের বুকে ছড়ির টান পড়িল। নিস্তব্ধ পুরীর মধ্যে সুর জাগিয়া উঠিল। বিভোর হইয়া রায় এস্রাজ বাজাইয়া চলিয়াছেন। এস্রাজ কি কথা কহিয়া উঠিল? মৃদু ভাষা যে স্পষ্ট শোনা যায়।

গানের কথাগুলি রায়ের কানে বাজিতেছিল—নিশীথরাত্রে হতভাগিনী বন্দিনী, দুয়ারের পাশে প্রহরায় জাগিয়া বিষাক্ত ননদিনী; নয়নে আমার নিদ্রা আসে না, নিদ্রার ভানে আমি তোমারই রূপ ধ্যান করি; হে প্রিয় এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে?

রায় এস্রাজ ঠেলিয়া দাঁড়াইলেন।

মৃদুস্বরে তিনি ডাকলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা!

তাঁহার চন্দ্রা। এ গানও যে চন্দ্রার। বাহির হইতে মিঠা গলায় কে ডাকিল, জনাব!

রায় ব্যগ্রভাবে ডাকিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা, আও ইধার আও। দোস্ত চলা গিয়া। চন্দ্রা!

কৃষ্ণা স্মিত সলজ্জ মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া অতি মধুর করিয়া যে গানটি তিনি এস্রাজে বাজাইতেছিলেন, তাহার শেষ চরণ গাহিল—হে প্রিয়, এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে? হাসিয়া রায় তাঁহার মোটা গলা যথাসম্ভব চাপিয়া গান ধরিলেন—ওগো প্রিয়া, এমন রাত্রি, বুকে আমার বিজয়োল্লাস, একা কি আজ থাকা যায়?

রায় বোতলের ছিপি খুলিতেছিলেন। হাত বাড়াইয়া কৃষ্ণাবাই বলিল, জনাবকে হুকুম হোয় তো বাঁদী দে শক্‌তে হেঁ! মৃদু হাসিয়া বোতল ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণা বোতল খুলিয়া দিল। মদ ঢালিয়া গ্লাস রায়-বাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

আবার এস্রাজের সুর উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা মৃদুস্বরে গান ধরিল। কৃষ্ণা গাহিতে গাহিতে নাচিতে আরম্ভ করিল। সে গাহিল—হে প্রিয়, ঝরা ফুলের মালা গাঁথি না; উচ্চ শাখায় ঐ যে ফুলের

স্তবক, ওই আমায় দাও ; আমায় তুমি তুলিয়া ধর, আমি নিজে চয়ন করিব তোমার জন্ম। উর্ধ্বমুখে হাত দুইটি বাড়াইয়া সে নাচিতেছিল। রায় এস্রাজ ফেলিয়া টপ করিয়া হাতের মুঠাতে কৃষ্ণার পা দুইটি ধরিয়া উচ্চে তুলিয়া তালে তালে তাহাকে নাচাইয়া দিলেন। গান শেষ হইল। কৃষ্ণা পড়িয়া যাইবার ভানে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্তে সে নামিয়া পড়িল। সুরামত্ত রায় আদর করিয়া ডাকিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা—পিয়ারী !

গানের পর গান চলিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরা। একটা বোতল শেষ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বোতলটাও শেষ হয় হয়। একটু পরেই বাইজীর অবশ দেহ এলাইয়া পড়িল—ফরাসের উপর। বিশ্বম্ভর তখনও বসিয়া—মত্ত নীলকণ্ঠের মত। বাইজীর অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। একটা তাকিয়া সযত্নে তাহার মাথায় দিয়া ভাল করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন। তারপর এস্রাজ টানিয়া লইয়া আবার বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় বোতলটা শেষ হইতে চলিল। কিন্তু রাত্রি শেষ হইল না। এমন সময় গাঙ্গুলীবাড়ির তিনটা ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, ঢং—ঢং—ঢং।

রায়বাড়ির খিলানে পারাবতের গুঞ্জন উঠিল। রায়ের চমক ভাঙিল। নিত্য এই শব্দে নিদ্রা ভাঙে—তিনি উঠিয়া পড়িলেন। একবার শুধু নিদ্রিতা কৃষ্ণাকে আদর করিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা—পিয়ারী ! তারপর বারান্দার বাহিরে আসিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত !

অনন্ত গিয়াছিল ছাদে প্রভুর জন্ম তাকিয়া-গালিচা পাতিতে। নিচে নামিয়া আসিতেই রায় তাহাকে বলিলেন, পাগড়ির চাদর, সওয়ারের পোশাক দে। নিতাইকে বলে দে তুফানের পিঠে জিন দিতে—জলদি।

সবিস্ময়ে অনন্ত প্রভুর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, রায় গোঁফে চাড়া দিতেছেন। এ মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়, কিন্তু বহুদিন দেখে নাই। সে মৃদুস্বরে বলিল, মুখে হাতে জল দিন।

কিছুক্ষণ পরেই তুফানের হর্ষপূর্ণ হ্রেষায় শেষরাত্রির বুক ভরিয়া উঠিল। তারাপ্রসন্নের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। জানালা হইতে সে দেখিল—তুফানের পিঠে বিশ্বম্ভর রায়। পরনে চোস্ত পায়জামা, গায়ে আচকান, মাথায় সাদা পাগড়ি। অন্ধকারে সম্পূর্ণ না দেখিলেও

তারাপ্রসন্ন কল্পনা করিল—পায়ে জরিদার নাগরা, হাতে চামর-দেওয়া চাবুক। তুফান নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল।

মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া ধূলার ঘূর্ণি উড়াইয়া তুফান তুফানের বেগে ছুটিতেছিল। শেষরাত্রির শীতল বায়ু হু-হু করিয়া রায়ের উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। সুরার উগ্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিতেছিল। প্রান্তর শেষ হইয়া গ্রাম—গ্রামখানার নাম কুসুমডিহি। পাশ দিয়া তরকারি-বোঝাই একখানা গাড়ি চলিয়াছে। আরোহী তাহাতে দুইজন। বোধহয় তাহারা হাটে চলিয়াছিল। কয়টা কথা তাঁহার কানে আসিয়া পৌছাইল, গাঙ্গুলীবাবুরা কিনে থেকে—

রায় সজোরে লাগাম টানিয়া তুফানের গতিরোধ করিলেন।

তখনও গাড়ির আরোহী বলিতেছিল, খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না। সুখ ছিল রায় রাজাদের আমলে—

চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া রায় চমকিয়া উঠিলেন।

তুফানের পিঠের উপর! কোথায়!—এ তিনি কোথায়! ক্রমে চিনিলেন, হারানো লাট কীর্তিহাট সম্মুখে। মুহূর্তে সোজা হইয়া, লাগাম টানিয়া তুফানকে ফিরাইয়া সজোরে তাহাকে কশাঘাত করিলেন, আবার কশাঘাত, তুফান বিপুল বেগে ছুটিল। আস্তাবলের সম্মুখে আসিয়া রায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, পূর্বদিকে আলোর রেশ ফুটিতেছে। রজনী এখনও যায় নাই।

রায় ডাকিলেন, নিতাই!

তিনি হাঁপাইতেছিলেন। অনুভব করিলেন, তুফানও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। রায় নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, লাগামের টানে তুফানের মুখ কাটিয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত মুখটা রক্তাক্ত। শ্রান্ত তুফান কাঁপিতেছিল। রায় তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, বেটা—বেটা!

তুফান মুখ তুলিতে পারিল না। সুরার মোহ বোধ করি তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ যায় নাই। বলিলেন, ভুল বেটা, তোরও ভুল, আমারও ভুল। লজ্জা কি, বেটা তুফান! ওঠ ওঠ।

নিতাই পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, বড় হাঁপিয়ে পড়েছে, ঠাণ্ডা হলেই উঠবে।

চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া রায় দেখিলেন, নিতাই। নিতাইয়ের হাতে তুফানকে দিয়া ত্বরিতপদে রায় বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, জলসাঘর তখনও খোলা। উঁকি মারিয়া দেখিলেন, ঘর শূন্য, অভিসারিকা চলিয়া গিয়াছে। সুরার শূন্য বোতল আসরে গড়াগড়ি যাইতেছে। ঝাড়-দেওয়ালগিরির বাতি তখন শেষ হয় নাই। এখনও আলো জ্বলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়বংশধরগণ, মুখে মত্ত হাসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন— মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ ওই ঘরে জমিয়া আছে।

দরজা হইতেই তিনি ফিরিলেন। রেলিঙে ভর দিয়া ভীতার্তের মত তিনি ডাকিলেন, অনন্ত—অনন্ত!

অনন্ত সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রভুর এমন কণ্ঠস্বর সে কখনও শোনে নাই। সে আসিয়া দাঁড়াইতেই রায় বলিয়া উঠিলেন, বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে—জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর্—জলসাঘরের—

আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।

তারিণী মাঝি

তারিণী মাঝির অভ্যাস মাথা হেঁট করিয়া চলা। অস্বাভাবিক দীর্ঘ তারিণী ঘরের দরজায়, গাছের ডালে, সাধারণ চালাঘরে বহুবার মাথায় বহু ঘা খাইয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু নদীতে যখন সে খেয়া দেয়, তখন সে খাড়া সোজা। তালগাছের ডোঙার উপর দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ লগির খোঁচা মারিয়া যাত্রী-বোঝাই ডোঙাকে ওপার হইতে এপারে লইয়া আসিয়া সে থামে।

আষাঢ় মাস। অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে ফেরত যাত্রীর ভিড়ে ময়ূরাক্ষীর গন্থটিয়ার ঘাটে যেন হাট বসিয়া গিয়াছিল। পথশ্রমকাতর যাত্রীদলের সকলেই আগে পার হইয়া যাইতে চায়।

তারিণী তামাক খাইতে খাইতে হাঁক মারিয়া উঠিল, আর লয় গো ঠাকরুণরা, আর লয়। গঙ্গাচান করে পুণ্যির বোঝায় ভারী হয়ে আইছ সব।

একজন বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, আর একটি নোক বাবা, এই ছেলেটি। ওদিক হইতে একজন ডাকিয়া উঠিল, ওলো ও সাবি, উঠে আয় লো, উঠে আয়। দোশমনের হাড়ের দাঁত মেলে আর হাসতে হবে না।

সাবি ওরফে সাবিত্রী তরুণী, সে তাহাদের পাশের গ্রামের কয়টি তরুণীর সহিত রহস্যালাপের কৌতুকে হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে বলিল, তোরা যা, আসছে খেপে আমরা সব একসঙ্গে যাব।

তারিণী বলিয়া উঠিল, না বাপু, তুমি এই খেপেই চাপ। তোমরা সব একসঙ্গে চাপলে ডোঙা ডুববেই। মুখরা সাবি বলিয়া উঠিল, ডোবে তো তোর ওই বুড়িদের খেপই ডুববে মাঝি। কেউ দশ বার, কেউ বিশ বার গঙ্গাচান করেছে ওরা। আমাদের সবে এই একবার।

তারিণী জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে মা, একবারেই যে আপনকারা গাঙের ঢেউ মাথায় করে আইছেন সব। যাত্রীর দল কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাঝি লগি হাতে ডোঙার মাথায় লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার সহকারী কালাচাঁদ পারের পয়সা সংগ্রহ করিতেছিল। সে হাঁকিয়া বলিল, পারের কড়ি ফাঁকি দাও নাই তো

কেউ, দেখ, এখনও দেখ।—বলিয়া সে ডোঙাখানা ঠেলিয়া দিয়া ডোঙায় উঠিয়া পড়িল। লগির খোঁচা মারিয়া তারিণী বলিল, হরি হরি বল সব—হরিবোল। যাত্রীদল সমস্বরে হরিবোল দিয়া উঠিল—হরিবোল। দুই তীরের বনভূমিতে সে কলরোল প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল। নিম্নে খরস্রোতা ময়ূরাক্ষী নিম্নস্বরে ক্রূর হাস্য করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তারিণী এবার হাসিয়া বলিল, আমার নাম করলেও পার, আমিই তো পার করছি।

এক বৃদ্ধা বলিল, তা তো বটেই বাবা। তারিণী নইলে কে তরাবে বল?

একটা ঝাঁকি দিয়া লগিটা টানিয়া তুলিয়া তারিণী বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল, এই শালা কেলে,—এঁটে ধর্ দাঁড়, হ্যাঁ—সেঙাত, আমার ভাত খায় না গো! টান দেখছিস না?

সত্য কথা, ময়ূরাক্ষীর এই খরস্রোতই বিশেষত্ব। বারো মাসের মধ্যে সাত-আট মাস ময়ূরাক্ষী মরুভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধূ-ধূ করে। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী। দুই পার্শ্বে চার-পাঁচ মাইল গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিপুল স্রোতে সে তখন ছুটিয়া চলে। আবার কখনও কখনও আসে 'হড়পা' বান, ছয়-সাত হাত উচ্চ জলস্রোত সম্মুখের বাড়ি-ঘর'ক্ষেত-খামার গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া সমস্ত দেশটাকে প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু সে সচরাচর হয় না। বিশ বৎসর পূর্বে একবার হইয়াছিল।

মাথার উপর রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। একজন পুরুষ যাত্রী ছাতা খুলিয়া বসিল।

তারিণী বলিল, পাল খাটিও না ঠাকুর, পাল খাটিও না। তুমিই উড়ে যাবা।

লোকটি ছাতা বন্ধ করিয়া দিল। সহসা নদীর উপরের দিকে একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল – আর্ত কলরব।

ডোঙার যাত্রী সব সচকিত হইয়া পড়িল। তারিণী ধীরভাবে লগি চালাইয়া বলিল, এই, সব হুঁশ করে। তোমাদের কিছু হয় নাই। ডোঙা ডুবেছে ওলকুড়োর ঘাটে। এই বুড়ি মা, কাঁপছ কেনে, ধর

ধর ঠাকুর, বুড়িকে ধর। ভয় কি? এই দেখ, আমরা আর-ঘাটে এসে গেইছি।

নদীও শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

তারিণী বলিল, কেলে!

কি?

নদীবক্ষের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তারিণী বলিল, লগি ধর্ দেখি।

কালাচাঁদ উঠিয়া পড়িল। তাহার হাতে লগি দিতে দিতে তারিণী বলিল, হুই—দেখ—হুই—হুই ডুবল।—বলিতে বলিতেই সে খরস্রোতা নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ডোঙার উপর কয়েকটি বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল, ও বাবা তারিণী, আমাদের কি হবে বাবা।

কালাচাঁদ বলিয়া উঠিল, এই, বুড়িরা পেছু ডাকে দেখ দেখি। মরবি মরবি, তোরা মরবি।

পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতের মধ্যে শ্বেতবর্ণের কি একটা মধ্যে মধ্যে ডুবিতেছিল, আবার কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই তারিণী ক্ষিপ্রগতিতে স্রোতের মুখে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিল। সে চলার মধ্যে যেন কত স্বচ্ছন্দ গতি। বস্তুটার নিকটেই সে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটা ডুবিল। সঙ্গে সঙ্গে তারিণীও ডুবিল। দেখিতে দেখিতে সে কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিল। এক হাতে তাহার ঘন কালো রঙের কি রহিয়াছে। তারপর সে ঈষৎ বাঁকিয়া স্রোতের মুখেই সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিল।

দুই তীরের জনতা আশঙ্কাবিমিশ্র ঔৎসুক্যের সহিত একাগ্রদৃষ্টিতে তারিণীকে লক্ষ্য করিতেছিল। এক তীরের জনতা দেখিতে দেখিতে উচ্চরোলে চীৎকার করিয়া উঠিল, হরিবোল।

অন্য তীরের জনতা চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, উঠেছে? উঠেছে?

কালাচাঁদ তখন ডোঙা লইয়া ছুটিয়াছিল।

তারিণীর ভাগ্য ভাল। জলমগ্ন ব্যক্তিটি স্থানীয় বর্ধিষ্ণু ঘরেরই একটি বধূ। ওলকুড়ার ঘাটে ডোঙা ডুবে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনাবৃতা বধূটি ডোঙার কিনারায় ভর দিয়া সরিয়া বসিতে গিয়া এই বিপদ ঘটাইয়া

বসিয়াছিল। অবগুণ্ঠনের জন্যই হাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সে টলিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিল। মেয়েটি খানিকটা জল খাইয়াছিল কিন্তু তেমন বেশি কিছু নয়—অল্প শুশ্রূষাতেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

নিতান্ত কচি মেয়ে—তের চৌদ্দ বৎসরের বেশি বয়স নয়। দেখিতে বেশ সুশ্রী, দেহে অলঙ্কারও কয়খানা রহিয়াছে—কানে মাকড়ি, নাকে টানা-দেওয়া নথ, হাতে রুলি, গলায় হার। সে তখনও হাঁপাইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটির স্বামী ও শ্বশুর আসিয়া পৌঁছিলেন।

তারিণী প্রণাম করিয়া বলিল, পেনাম ঘোষ মশাই।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

তারিণী বলিল, আর সান কেড়ো না মা, দম লাও, দম লাও। সেই যে বলে—লাজে মা কুঁকুড়ি, বেপদের ধুকুড়ি।

ঘোষ মহাশয় বলিলেন, কি চাই তোর তারিণী, বল্?

তারিণী মাথা চুলকাইয়া সারা হইল, কি তাহার চাই, সে ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে বলিল, এক হাঁড়ি মদের দাম—আট আনা।

জনতার মধ্য হইতে সেই সাবি মেয়েটি বলিয়া উঠিল, আ মরণ তোমার! দামী কিছু চেয়ে নে রে বাপু!

তারিণীর যেন এতক্ষণে খেয়াল হইল, সে হেঁটমাথাতেই সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, ফাঁদি লত একখানা ঘোষ মশাই।

জনতার মধ্য হইতে সাবিই আবার বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ বাবা তারিণী, বউমা বুঝি খুব নাক নেড়ে কথা কয়?

প্রফুল্লচিত্ত জনতার হাস্যধ্বনিতে খেয়াঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল।

বধূটি ঘোমটা খুলে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার গৌরবর্ণ কচি হাতখানি বাহির হইয়া আসিল—রাঙা করতলের উপর সোনার নথখানি রৌদ্রাভায় ঝকঝক করিতেছে।

ঘোষ মহাশয় বলিলেন, দশহরার সময় পার্বণী রইল তোর কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী? আর এই নে—পাঁচটা টাকা।

তারিণী কৃতজ্ঞতায় নত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আজ্ঞে হজুর চাদরের বদলে যদি শাড়ি—

হাসিয়া ঘোষ মহাশয় বলিলেন, তাই হবে রে, তাই হবে।

সাবি বলিল, তোর বউকে একবার দেখতাম তারিণী।

তারিণী বলিল, নেহাত কালো কুচ্ছিত না।

তারিণী সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিল আকণ্ঠ মদ গিলিয়া। এখানে পা ফেলিতে পা পড়িতেছিল ওখানে। সে বিরক্ত হইয়া কালাচাঁদকে বলিল, রাস্তায় এত নেলা কে কাটলে রে কেলে? শুধুই নেলা—শুধুই—অ্যা—অ্যাই—একটো—

কালাচাঁদও নেশায় বিভোর, সে শুধু বলিল, হুঁ।

তারিণী বলিল, জলাস্পয়—সব জলাস্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চলে যাই। শালা খাল নাই, নেলা নাই, সমান—স—ব সমান।

টলিতে টলিতেই সে শূন্যের বায়ুমণ্ডলে হাত ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া সাঁতারের অভিনয় করিয়া চলিয়াছিল।

গ্রামের প্রান্তেই বাড়ি। বাড়ির দরজায় একটি আলো জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সুখী—তারিণীর স্ত্রী।

তারিণী গান ধরিয়া দিল, লো—তুন হয়েছে দেশে ফাঁদিলতের আমদানি—

সুখী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, খুব হয়েছে, এখন এস। ভাত কটা জুড়িয়ে কড়কড়ে হিম হয়ে গেল।

হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কোমরের কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে তারিণী বলিল, আগে তোকে লত পরতে হবে। লত কই—কই—কোথা গেল শালার লত্ত?

সুখী বলিল, কোন্ দিন ওই করতে গিয়ে আমার মাথা খাবে তুমি। এবার আমি গলায় দড়ি দোব কিন্তু।

তারিণী ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেনে, কি করলাম আমি?

সুখী দৃষ্টিতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, এই পাথার বান, আর তুমি—

তারিণীর অট্টহাসিতে বর্ষার রাত্রির সজল অন্ধকার ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হাসি থামাইয়া সে সুখীর দিকে চাহিয়া বলিল, মায়ের বুকে ভয় থাকে? বল, তু বল্, বলে যা বলছি। পেটের ভাত ওই ময়ূরাক্ষীর দৌলতে। জবাব দে কথার—অ্যাই!

সুখী তাহার সহিত আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভাত বাড়িতে চলিয়া গেল।

তারিণী ডাকিল, সুখী, অ্যাই সুখী, অ্যাই!

সুখী কোন উত্তর দিল না। তারিণী টলিতে টলিতে উঠিয়া ঘরের দিকে চলিল। পিছন হইতে ভাত বাড়িতে ব্যস্ত সুখীকে ধরিয়া বলিল, চল্, এখুনি তোকে যেতে হবে।

সুখী বলিল, ছাড়, কাপড় ছাড়।

তারিণী বলিল, আলবত যেতে হবে। হাজার বার—তিনশো বার।

সুখী কাপড়টা টানিয়া বলিল, কাপড় ছাড়—যাব, চল। তারিণী খুশি হইয়া কাপড় ছাড়িয়া দিল। সুখী ভাতের থালাটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তারিণী বলিতেছিল, চল্, তোকে পিঠে নিয়ে ঝাঁপ দোব গম্বুটের ঘাটে, উঠব পাঁচথুপীর ঘাটে।

সুখী বলিল, তাই যাব, ভাত খেয়ে লাও দেকিন।

বাহির হইয়া আসিতে গিয়া দরজার চৌকাঠে কপালে আঘাত পাইয়া তারিণীর আস্ফালনটা একটু কমিয়া আসিল।

ভাত খাইতে খাইতে সে আবার আরম্ভ করিল, তুলি নাই সেবার এক জোড়া গোরু? পনেরো টাকা—পাঁচ টাকা কম এক কুড়ি, শালা মদন গোপ ঠকিয়ে লিলে? তোর হাতের শাঁখা-বাঁধা কি করে হল? বল্, কে—তোর কোন্ নানা দিলে?

সুখী ঘরের মধ্যে আমানি ছাঁকিতেছিল, ঠাণ্ডা জিনিস নেশার পক্ষে ভাল। তারিণী বলিল, শালা মদনা—লিলি ঠকিয়ে—লে। সুখীর শাঁখা-বাঁধা তো হয়েছে, ব্যস্, আমাকে দিস আর না দিস। পড়ে শালা এক দিন ময়ুরাক্ষীর বানে—শালাকে গোটাকতক চোবল দিয়ে তবে তুলি।

সম্মুখে আমানির বাটি ধরিয়া দিয়া সুখী তারিণীর কাপড়ের খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল, বাহির হইল নথখানি আর তিনটি টাকা।

সুখী প্রশ্ন করিল, আর দু টাকা কই?

তারিণী বলিল, কেলে, ওই কেলে, দিয়ে দিলাম কেলেকে—যা, লিয়ে যা।

সুখী এ কথায় কোন বাদ-প্রতিবাদ করিল না, সে তাহার অভ্যাস নয়। তারিণী আবার বকিতে শুরু করিল, সেবার সেই তোর যখন

অসুখ হল, ডাক পার হয় না, পুলিস সায়েব ঘাটে বসে ভাপাইছে, হুঁ হুঁ বাবা—সেই বকশিশে তোর কানের ফুল। যা, তু যা, এখুনি ডাক্ নদীর পার থেকে, এই, উঠে আয়্‌হারামজাদী নদী। উঠে আসবে, যা যা।

সুখী বলিল, দাঁড়াও আয়নাটো লিয়ে আসি, নতটো পরি। তারিণী খুশি হইয়া নীরব হইল। সুখী আয়না সম্মুখে রাখিয়া নথ পরিতে বসিল। সে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ভাত খাওয়া তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতেই আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখি দেখি।

সুখীর মুখে পুলকের আবেশ ফুটিয়া উঠিল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল।

তারিণী সাবি-ঠাকরুণকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সুখী তন্বী, সুখী সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।

তারিণী মত্ত অবস্থাতে বলিলেও মিথ্যা বলে নাই। ওই ময়ূরাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। দশহরার দিন ময়ূরাক্ষীর পূজাও সে করিয়া থাকে। এবার তেরো শো বিয়াল্লিশ সালে দশহরার দিন তারিণী নিয়মমত পূজা-অর্চনা করিতেছিল। তাহার পরনে নূতন কাপড়, সুখীর পরনেও নূতন শাড়ি—ঘোষ মহাশয়ের দেওয়া পার্বণী। জলহীন ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছিল। তখনও পর্যন্ত বৃষ্টি নামে নাই। ভোগপুরের কেষ্ট দাস নদীর ঘাটে নামিয়া একবার দাঁড়াইল। সমস্ত দেখিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, তাই ভাল করে পূজো কর্ তারিণী, জল-টল হোক, বান-টান আসুক, বান না এলে চাষ হবে কি করে?

ময়ূরাক্ষীর পলিতে দেশে সোনা ফলে।

তারিণী হাসিয়া বলিল, তাই বল বাপু। লোকে বলে কি জান দাস, বলে, শালা বানের লেগে পুজো দেয়। এই মায়ের কিপাতেই এ মুলুকের লক্ষ্মী। ধর্ ধর্ কেলে, ওরে, পাঁঠা পালাল, ধর্।

বলির পাঁঠাটা নদীগর্ভে উত্তপ্ত বালুকার উপর আর থাকিতে চাহিতেছিল না।

পূজা-অর্চনা সুশৃঙ্খলেই হইয়া গেল। তারিণী মদ খাইয়া নদীর

ঘাটে বসিয়া কালাচাঁদকে বলিতেছিল, হড়হড়—কলকল—বান, সে কেনে তু দশ দিন বাদ।

কালাচাঁদ বলিল, এবার মাইরি, তু কিস্তুক ভাসা জিনিস ধরতে পাবি না। এবার কিস্তুক আমি ধরব, হঁ্যা।

তারিণী মস্ত হাসি হাসিয়া বলিল, বড় ঘুরণ-চাকে তিনটি বুটবুটি, বুক—বুক—বুক, বাস্—কালাচাঁদ ফরসা।

কালাচাঁদ অপমানে আগুন হইয়া উঠিল, কি বললি শালা?

তারিণী খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুখী মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সব মিটাইয়া দিল। সে বলিল, ছোট বানের সময়—ছুই পাকুড়গাছ পর্যন্ত বানে দেওর ধরবে, আর পাকুড়গাছ ছাড়লেই তুমি।

কালাচাঁদ সুখীর পায়ের ধুলা লইয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল, বউ লইলে ই বলে কে?

পরদিন হইতে ডোঙা মেরামত আরম্ভ হইল, দুইজনে হাতুড়ি নেয়ান লইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ডোঙাখানাকে প্রায় নূতন করিয়া ফেলিল।

কিন্তু সে ডোঙায় আবার ফাট ধরিল রৌদ্রের টানে। সমস্ত আষাঢ়ের মধ্যে বান হইল না। বান দূরের কথা, নদীর বালি ঢাকিয়া জলও হইল না। বৃষ্টি অতি সামান্য—দুই-চারি পশলা। সমস্ত দেশটার মধ্যে একটা মৃদু কাতর ক্রন্দন যেন সাড়া দিয়া উঠিল। প্রত্যাসন্ন বিপদের জন্য দেশ যেন মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল। কিংবা হয়তো বহুদূরের যে হাহাকার আসিতেছে, বায়ুস্তরবাহিত তাহারই অগ্রধ্বনি এ। তারিণীর দিন আর চলে না। সরকারী কর্মচারীদের বাইসিক্‌ল ঘাড়ে করিয়া নদী পার করিয়া দুই-চারিটা পয়সা মেলে, তাহাতেই সে মদ খায়। সরকারী কর্মচারীদের এ সময়ে আসা-যাওয়ার হিরিক পড়িয়া গিয়াছে—তাঁহারা আসেন দেশে সত্যই অভাব আছে কি না, তাহারই তদন্তে। আরও কিছু মেলে—সে তাঁহাদের ফেলিয়া-দেওয়া সিগারেটের কুটি।

শ্রাবণের প্রথমেই প্রথম বন্যা আসিল। তারিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বন্যার প্রথম দিন বিপুল আনন্দে সে তালগাছের মত উঁচু পাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীর বুকে পড়িয়া বন্যার জল আরও উচ্ছল ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কিন্তু তিন দিনের দিন নদীতে আবার হাঁটু-জল হইয়া গেল। গাছে বাঁধা ডোঙাটা তরঙ্গাঘাতে মৃদু মৃদু দোল খাইতেছিল। তাহারই উপর তারিণী ও কালাচাঁদ বসিয়া ছিল—যদি কেহ ভদ্র যাত্রী আসে তাহারই প্রতীক্ষায়, সে হাঁটিয়া পার হইবে না। এ অবস্থায় তাহারা দুইজনে মিলিয়া ডোঙাটা ঠেলিয়া লইয়া যায়।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। তারিণী বলিল, ই কি হল বল্ দেখি কেলে ?

চিন্তাকুলভাবে কালাচাঁদ বলিল, তাই তো।

তারিণী আবার বলিল, এমন তো কখনও দেখি নাই !

সেই পূর্বের মতই কালাচাঁদ উত্তর দিল, তাই তো।

আকাশের দিকে চাহিয়া তারিণী বলিল, আকাশ দেখ কেনে— ফরসা লী-ল। পচি দিকেও তো ডাকে না !

কালাচাঁদ এবারও উত্তর দিল, তাই তো।

ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া তারিণী বলিল তাই তো ! 'তাই তো' বলতেই যেন আমি ওকে বলছি। তাই তো ! তাই তো ! তাই তো !

কালাচাঁদ একান্ত অপ্রতিভের মত তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কালাচাঁদের সে দৃষ্টি তারিণী সহ্য করিতে পারিল না, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। কিছুক্ষণ পর অকস্মাৎ যেন সচেতনের মত নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া সে বলিয়া উঠিল, বাতাস ঘুরেছে লয় কেলে, পচি বইছে, না ? বলিতে বলিতে সে লাফ দিয়া ডাঙায় উঠিয়া শুষ্ক বালি এক মুঠা ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বায়ুপ্রবাহ অতি ক্ষীণ, পশ্চিমের কি না ঠিক বুঝা গেল না। তবুও সে বলিল, হুঁ পচি থেকে ঠেলা বইছে—একটুকুন। আয় কেলে, মদ খাব, আয়। দু আনা পয়সা আছে আজ। বার করে লিয়েছি আজ সুখীর খুঁট খুলে।

সস্নেহ নিমন্ত্রণে কালাচাঁদ খুশি হইয়া উঠিয়াছিল। সে তারিণীর সঙ্গ ধরিয়া বলিল, তোমার বউয়ের হাতে টাকা আছে দাদা। বাড়ি গেলে তোমার ভাত ঠিক পাবেই। মলাম আমরাই।

তারিণী বলিল, সুখী বড় ভাল রে কেলে, বড় ভাল। উ না থাকলে

আমার 'হাড়ির ললাট ডোমের দুগগতি' হয় ভাই। সেবার সেই ভাইয়ের বিয়েতে—

বাধা দিয়া কালাচাঁদ বলিল, দাঁড়াও দাদা, একটা তাল পড়ে রইছে, কুড়িয়ে লি।

সে ছুটিয়া পাশের মাঠে নামিয়া পড়িল।

একদল লোক গ্রামের ধারে গাছতলার বসিয়া ছিল, তারিণী প্রশ্ন করিল, কোথা বাবা যে তোমরা, বাড়ি কোথা ?

একজন উত্তর দিল, বীরচন্দপুর বাড়ি ভাই আমাদের, খাটতে যাব আমরা বদ্ধমান।

কাঁলাচাঁদ প্রশ্ন করিল, বদ্ধমানে কি জল হইছে নাকি ?

জল হয় নাই, ক্যানেল আছে কিনা।

দেখিতে দেখিতে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। দুর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়া ছিল, মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। গৃহস্থ আপনার ভাণ্ডার বন্ধ করিল; জনমজুরের মধ্যে উপবাস শুরু হইল। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সকালে উঠিয়া তারিণী ঘাটে আসিয়া দেখিল কালাচাঁদ আসে নাই। প্রহর গড়াইয়া গেল, কালাচাঁদ তবুও আসিল না। তারিণী উঠিয়া কালাচাঁদের বাড়ি গিয়া ডাকিল, কেলে !

কেহ উত্তর দিল না। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরদ্বার শূন্য—খাঁ খাঁ করিতেছে, কেহ কোথাও নাই। পাশের বাড়িতে গিয়া দেখিল, সে বাড়িও শূন্য। শুধু সে বাড়িই নয়, কালাচাঁদের পাড়াটাই জনশূন্য। পাশের চাষাপাড়ায় গিয়া শুনিল, কালাচাঁদের পাড়ার সকলেই কাল রাত্রে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

হারু মোড়ল বলিল, বললাম আমি তারিণী, যাস না সব, যাস না। তা শুনলে না, বলে, বড়নোকের গাঁয়ে ভিখ করব।

তারিণীর বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল; সে ওই জনশূন্য পল্লীটার দিকে চাহিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হারু আবার বলিল, দেশে বড়নোক কি আছে ? সব তলা-ফাঁক। তাদের আবার বড় বেপদ। পেটে না খেলেও মুখে কবুল দিতে

পারে না। এই তো কি বলে—গাঁয়ের নাম, ওই যে—পলাশডাঙা, পলাশডাঙার ভদ্দরনোক একজন, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। শুধু অভাবে মরেছে।

তারিণী শিহরিয়া উঠিল।

পরদিন ঘাটে এক বীভৎস কাণ্ড! ঘাটের পাশেই এক বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল। কতকটা তাহার শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইয়াছে। তারিণী চিনিল, একটি মুচি পরিবারের বৃদ্ধা মাতা এ হতভাগিনী। গত অপরাহ্নে চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধার মৃত্যু-কামনা বার বার তাহারা করিতেছিল। বৃদ্ধার জন্যই ঘাটের পাশে গত রাত্রে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল। রাত্রে ঘুমন্ত বৃদ্ধাকে ফেলিয়া তাহারা পালাইয়াছে।

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। বরাবর বাড়ি আসিয়া সুখীকে বলিল, লে সুখী, থান চারেক কাপড় আর গয়না কটা পেট-আঁচলে বেঁধে লে। আর ই গাঁয়ে থাকব না, শহর দিকে যাব। দিন-খাটুনি তো মিলবে।

জিনিসপত্র বাঁধিবার সময় তারিণী দেখিল, হাতের শাখা ছাড়া আর কোন গহনাই সুখীর নাই। তারিণী চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, আর?

সুখী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, এতদিন চলল কিসে, বল?

তারিণীও গ্রাম ছাড়িল।

দিন তিনেক পথ চলিবার পর সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের প্রান্তে তাহারা রাত্রির জন্য বিশ্রাম লইয়াছিল। গোটা দুই পাকা তাল লইয়া দুইজনে রাত্রির আহার সারিয়া লইতেছিল। তারিণী চট করিয়া উঠিয়া খোলা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল। থাকিতে থাকিতে বলিল, দেখি সুখী, গামছাখানা। গামছাখানা লইয়া হাতে ঝুলাইয়া সেটাকে সে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল। ভোরবেলায় সুখীর ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিল, তারিণী ঠায় জাগিয়া বসিয়া আছে। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ঘুমোও নাই তুমি?

হাসিয়া তারিণী বলিল, না, ঘুম এল না।

সুখী তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিল, ব্যামো-স্যামো হলে কি করব বল দেখি আমি? ই মানুষের বাইরে বেরুনো কেনে বাপু, ছি—ছি—ছি!

তারিণী পুলকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দেখেছিস, সুখী দেখেছিস ?

সুখী বলিল, আমার মাথামুণ্ডু কি দেখব, বল ?

তারিণী বলিল, পিঁপড়েতে ডিম মুখে নিয়ে ওপরের পানে চলল। জল এইবার হবে।

সুখী দেখিল, সত্যই লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধভাবে পোড়ো ঘরখানার দেওয়ালের উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। মুখে তাহাদের সাদা সাদা ডিম।

সুখী বলিল, তোমার যেমন—

তারিণী বলিল, ওরা ঠিক জানতে পারে, নিচে থাকলে যে জলে বাসা ভেসে যাবে। ইদিকে বাতাস কেমন বইছে, দেখেছিস ? ঝাড়া পচ্চিম থেকে।

আকাশের দিকে চাহিয়া সুখী বলিল, আকাশ তো ফটফটে—চকচক করছে।

তারিণী চাহিয়া ছিল অন্য দিকে, সে বলিল, মেঘ আসতে কতক্ষণ ? ওই দেখ কাকে কুটো তুলছে—বাসার ভাঙা-ফুটো সারবে। আজ এই-খানেই থাক সুখী, আর যাব না ; দেখি মেঘের গতিক।

খেয়া-মাঝির পর্যবেক্ষণ ভুল হয় নাই। অপরাহ্ণের দিকে আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, পশ্চিমের বাতাস ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিল।

তারিণী বলিল, ওঠ সুখী, ফিরব।

সুখী বলিল, এই অবেলায় ?

তারিণী বলিল, ভয় কি তোর, আমি সঙ্গে রইছি। লে, মাথালি তু মাথায় দে। টিপিটিপি জল ভারি খারাপ।

সুখী বলিল, আর তুমি, তোমায় শরীল বুঝি পাথরের ?

তারিণী হাসিয়া বলিল, ওরে ই আমার জলের শরীল, রোদে টান ধরে, জল পেলেই ফোলে। চল, দে, পুঁটুলি আমাকে দে।

ধীরে ধীরে বাদল বাড়িতেছিল। উতলা বাতাসের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ রিমিঝিমি বৃষ্টি হইয়া যায়, তারপর থামে। কিছুক্ষণ পর আবার বাতাস প্রবল হয়, সঙ্গে সঙ্গে নামে বৃষ্টি।

যে পথ গিয়াছিল তাহারা তিন দিনে, ফিরিবার সময় সেই পথ অতিক্রম করিল দুই দিনে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়াই তারিণী বলিল,

দাঁড়া, নদীর ঘাট দেখে আসি। ফিরিয়া আসিয়া পুলকিত চিত্তে তারিণী বলিল, নদী কানায় কানায়, সুখী।

প্রভাতে উঠিয়াই তারিণী ঘাটে যাইবার জন্য সাজিল। আকাশ তখন দুরন্ত দুর্যোগে আচ্ছন্ন, ঝড়ের মতো বাতাস, সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি।

দ্বিপ্রহরে তারিণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কামার-বাড়ি চললাম আমি।

সুখী ব্যস্তভাবে বলিল, খেয়ে যাও কিছু।

চিন্তিত মুখে ব্যস্ত তারিণী বলিল, না, ডোঙার একটা বড় গজাল খুলে গেইছে। সে না হলে—উহুঁ অল্প বান হলে না হয় হত, নদী একেবারে পাথার হয়ে উঠেছে; দেখসে আয়।

সুখীকে সে না দেখাইয়া ছাড়িল না। পালেদের পুকুরের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সুখী দেখিল, ময়ূরাক্ষীর পরিপূর্ণ রূপ। বিস্তৃতি যেন পারাপারহীন। রাঙা জলের মাথায় রাশি-রাশি পুঞ্জিত ফেনা ভাসা ফুলের মতো দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, ডাক শুনছিস—সোঁ-সোঁ? বান আরও বাড়বে! তু বাড়ি যা, আমি চললাম। লইলে কাল আর ডাক পার করতে পারব না।

সুখী অসন্তুষ্ট চিত্তে বলিল, এই জলঝড়—

তারিণী সে কথা কানেই তুলিল না। দুরন্ত দুর্যোগের মধ্যেই সে বাহির হইল।

যখন সে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে সে আসিতেছিল। কি একটা 'ডুগডুগ' শব্দ শোনা যায় না? হাঁ, ডুগডুগিই বটে। এ শব্দের অর্থ তো সে জানে, আসন্ন বিপদ। নদীর ধারে গ্রামে গ্রামে এই সুরে ডুগডুগি যখন বাজে, তখনই বন্যার ভয় আসন্ন বুঝিতে হয়।

তারিণীর গ্রামের ও-পাশে ময়ূরাক্ষী, এ-পাশে ছোট একটা কাঁতার অর্থাৎ ছোট শাখা-নদী। একটা বাঁশের পুল দিয়া গ্রামে প্রবেশের পথ। তারিণী সঠিক পথ ধরিয়া আসিয়াও বাঁশের পুল খুঁজিয়া পাইল না। তবে পথ ভুল হইল নাকি? অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ পর সে ঠাহর করিল, সে পুলের মুখ এখনও অন্তত একশত বিঘা জমির পরে। ঠিক বন্যার জলের ধারেই সে দাঁড়াইয়া ছিল, আঙুলের ডাগায় ছিল

জলের সীমা। দেখিতে দেখিতে গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবিয়া গেল। সে কান পাতিয়া রহিল, কিন্তু বাতাস ও জলের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না, আর একটা গর্জনের মতো গোঁ-গোঁ শব্দ। দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ তাহার পোকায় ছাইয়া গেল। লাফ দিয়া দিয়া মাটির পোকা পলাইয়া যাইতে চাহিতেছে।

তারিণী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

ক্ষিপ্রগতিতে মাঠের জল অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যেও বন্যা প্রবেশ করিয়াছে। এককোমর জলে পথঘাট ঘরদ্বার সব ভরিয়া গিয়াছে। পথের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের নরনারী আর্ত চীৎকার করিয়া এ উহাকে ডাকিতেছে। গোরু ছাগল ভেড়া কুকুরের সে কি ভয়ার্ত চীৎকার! কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ; লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চীৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে।

গভীর অন্ধকারে পথও বেশ চেনা যায় না।

জলের মধ্যে কি একটা বস্তুর উপর তারিণীর পা পড়িল, জীব বলিয়াই বোধ হয়। হেঁট হইয়া তারিণী সেটাকে তুলিয়া দেখিল, ছাগলের ছানা একটা, শেষ হইয়া গিয়াছে। সেটাকে ফেলিয়া দিয়া কোনরূপে সে বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাকিল, সুখী—সুখী!

ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল—অপরিমেয় আশ্বস্ত কণ্ঠস্বরে সুখী সাড়া দিল, এই যে, ঘরে আমি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তারিণী দেখিল, ঘরের উঠানে এক-কোমর জল। দাওয়ার উপর এক-হাঁটু জলে চালের বাঁশ ধরিয়া সুখী দাঁড়াইয়া আছে।

তারিণী তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল, বেরিয়ে আয়, এখন কি ঘরে থাকে, ঘর চাপা পড়ে মরবি যে।

সুখী বলিল, তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। কোথা খুঁজে বেড়াতে বল দেখি?

পথে নামিয়া তারিণী দাঁড়াইল, বলিল, কি করি বল দেখি সুখী?

সুখী বলিল, এইখানেই দাঁড়াও। সবার যা দশা হবে আমাদেরও তাই হবে।

তারিণী বলিল, বান যদি আরও বাড়ে সুখী? গোঁ-গোঁ ডাক শুনছিস না?

সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে গো? আর বান বাড়লে দেশের কি থাকবে? ছিষ্টি কি আর লষ্ট করবে ভগবান?

তারিণী এ আশ্বাস গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

একটা হুড়মুড় শব্দের সঙ্গে বন্যার জল ছটকাইয়া দুলিয়া উঠিল। তারিণী বলিল, আমাদেরই ঘর পড়ল সুখী। চল্, আর লয়, কোমরের ওপর উঠল, তোর তো এক-ছাতি হইছে তা হলে।

অন্ধকারে কোথায় বা কাহার কণ্ঠস্বর বোঝা গেল না, কিন্তু নারী-কণ্ঠের কাতর ক্রন্দন ধ্বনিয়া উঠিল, ওগো, খোকা পড়ে গেইছে বুক থেকে। খোকা রে!

তারিণী বলিল, এইখানেই থাকবি সুখী, ডাকলে সাড়া দিস।

সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। শুধু তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল, কে? কোথা? কার ছেলে পড়ে গেল, সাড়া দাও ওই!

ওদিক হইতে সাড়া আসিল, এই যি।

তারিণী আবার হাঁকিল, ওই!

কিছুক্ষণ ধরিয়া কলস্বরের সঙ্কেতের আদান-প্রদান চলিয়া সে শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পরই তারিণী ডাকিল, সুখী!

সুখী সাড়া দিল, অ্যাঁ?

শব্দ লক্ষ্য করিয়া তারিণী আসিয়া বলিল, আমার কোমর ধর সুখী। গতিক ভাল নয়।

সুখী আর প্রতিবাদ করিল না। তারিণীর কোমরের কাপড় ধরিয়া বলিল, কার ছেলে বটে? পেলে?

তারিণী বলিল, পেয়েছি, ভূপতে ভল্লার ছেলে।

সন্তর্পণে জল ভাঙিয়া তাহারা চলিয়াছিল। জল ক্রমশ যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, আমার পিঠে চাপ সুখী। কিন্তু এ কোন্ দিকে এলাম সুখী, ই—ই—

কথা শেষ হইবার পূর্বেই অথই জলে দুইজনে ডুবিয়া গেল। পরক্ষণেই

কিন্তু তারিণী ভাসিয়া উঠিয়া বলিল, নদীতেই বা পড়লাম সুখী। পিঠ ছেড়ে আমার কোমরের কাপড় ধরে ভেসে থাক।

স্রোতের টানে তখন তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে। গাঢ় গভীর অন্ধকার, কানের পাশ দিয়া বাতাস চলিয়াছে—হু-হু শব্দে, তাহারই সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ময়ূরাক্ষীর বানের হুড়হুড় শব্দ। চোখে মুখে বৃষ্টির ছাট আসিয়া বিঁধিতেছিল তীরের মতো। কুটার মতো তাহারা চলিয়াছে—কতক্ষণ, তাহার অনুমান হয় না; মনে হয়, কত দিন কত মাস তাহার হিসাব নাই—নিকাশ নাই। শরীরও ক্রমশ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষীর তরঙ্গ শ্বাসরোধ করিয়া দেয়। কিন্তু সুখীর হাতের মুঠি কেমন হইয়া আসে যে! সে যে ক্রমশ ভারী হইয়া উঠিতেছে! তারিণী ডাকিল, সুখী—সুখী!

উন্মত্তার মতো সুখী উত্তর দিল, অ্যাঁ?

ভয় কি তোর, আমি—

পর-মুহূর্তে তারিণী অনুভব করিল, অতল জলের তলে ঘুরিত ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছে। ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারা। সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবিতে হইবে। সে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কি, সুখী যে নাগপাশের মতো তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে? সে ডাকিল, সুখী—সুখী

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছে। সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস—বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পর-মুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ। হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মতো টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ—বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।

খাজাঞ্চিবাবু

মানভূম জেলায় ফায়ার-ব্রিক্‌সের কারখানার একটা মেস। খাপরায় ছাওয়া একটানা লম্বা ব্যারাকের ধরনের একখানা বাংলো, সামনে সারি-সারি থামওয়ালা একফালি টানা বারান্দা—সেই বারান্দার উপর বসিয়া কর্মচারীরা সকলে আপিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। শীতকালের প্রাতঃকালে, সাড়ে ছয়টায় কারখানার ভোঁ বাজে। অশ্বিনী চা খায় না, সে গরম দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছিল ; ভিখারী আউট-ডোরে কাজ করে, সে নীল রঙের প্যাণ্টটা পরিয়া মোজা-জোড়াটা খুঁজিতেছিল ; তরুণ বদি রোজ পঁচিশটা ডন ফেলে, একাদশ ডনটি ফেলিতেছিল ; বুড়া শশী মিস্ত্রী গত রাত্রের উদ্বৃত্ত মাংসের চর্বিগুলা গিলিতেছিল ; ঠিক এই সময়েই কারখানার ভোঁ বাজিয়া উঠিল—ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ।

শেষ সিটিই তো বটে, থামিয়া থামিয়া বাজিতেছে। যে যেমন অবস্থায় ছিল, ছুটিল। ম্যানেজার নূতন লোক, সাহেবী মেজাজ ; তাঁহার নূতন বন্দোবস্তে নিয়ম হইয়াছে, সাড়ে ছয়টার সিটি বাজিবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলকে আপিসে আসিয়া হাজিরা-বই সহি করিতে হইবে। তাহার অধিক এক মিনিটও বিলম্ব হইলে অর্ধেক দিন অনুপস্থিত লেখা হইবে। বদি একাদশ ডনটাতে ব্যায়াম শেষ করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া বলিল, শ্লেভারি, ওঃ। সে তাড়াতাড়ি একটা জামা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

আপিসে আসিয়া সে দেখিল, সেখানে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সার্ভেয়ার খাজাঞ্চিকে বলিতেছে, হু আর ইউ ? তুমি কে ? হোয়াট রাইট—কে তোমাকে সিটি দেবার হুকুম দিতে রাইট দিয়েছে ? হু আর ইউ ?

বদি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে ছয়টা বাজিতে এখনও পাঁচ মিনিট দেরি আছে, অর্থাৎ প্রায় দশ মিনিট পূর্বে সিটি দেওয়া হইয়াছে।

রক্ত যেন তাহার মাথায় চড়িয়া গেল, সে ঘুসি পাকাইয়া খাজাঞ্চির নাকের কাছে আসিয়া বলিল, ইয়ে কোথাকার।

কি হয়েছে আপনাদের?—নূতন ম্যানেজার সাহেবের কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ হইয়া গেল। বৃদ্ধ খাজাঞ্চি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ঈষৎ উৎসাহের সহিত বলিল, সার্, কাল থেকে অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে, গাড়ি লোডিং শেষ হয় নি, দশ নম্বর কিলেন—

বাধা দিয়া ম্যানেজার বলিলেন, সে হিসেব আমি চাই নি। আমি জানতে চাই, এ গোলমাল কিসের জন্মে?

খাজাঞ্চি হতবাক হইয়া গেল। সে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শুধু। সার্ভেয়ার সকলের মধ্যে পদস্থ ব্যক্তি, সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, সার্, কাল থেকে আপনি অর্ডার দিয়েছেন, সকাল সাড়ে ছয়টায় কাজ আরম্ভ হবে, আসতে পাঁচ মিনিটের বেশি দেরি হলে হাফ-ডে-জ ওয়ার্ক কাটা যাবে। শীতকালের দিন সার্, আর খাজাঞ্চিবাবু এসে ছটা কুড়ি মিনিটে—মানে দশ মিনিট আগে সিটি দিতে হুকুম দিয়েছেন। আমাদের কারও খাওয়া হয়নি সার্, মুখের চা পর্যন্ত ফেলে এসেছি।

ম্যানেজার ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সাড়ে ছয়টার তখনও দুই মিনিট বিলম্ব আছে। নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে ঘড়িটাও ঠিক তাহাই বলিতেছে। ম্যানেজার বলিলেন, ওয়েল, আধ ঘণ্টা কাজ করে আপনারা আপনাদের ডিপার্টমেণ্টের কাজ-টাজ চালু করে দিন। তারপর গিয়ে সব খেয়ে আস্থন। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আপনাদের আজ ছুটি থাকল। যান—যান সব।

মিনিট দুইয়ের মধ্যেই আপিসটা পরিষ্কার হইয়া গেল। খাজাঞ্চি আপনার আসনে গিয়া বসিল।

ম্যানেজার বলিলেন, আপনি দশ মিনিট আগে সিটি দিতে হুকুম দিয়েছেন?

খাজাঞ্চি বলিল, কাল থেকে অনেক কাজ বাকি আছে সার্—লোডিং শেষ হয় নি, দশ—

অসহিষ্ণুভাবে ম্যানেজার বলিলেন, সে সব আমি জানি, আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তারই উত্তর দিন।

ফ্যালফ্যাল করিয়া ম্যানেজারের মুখের দিকে চাহিয়া খাজাঞ্চি বলিল, হ্যাঁ সার্‌।

কেন? ঘণ্টা বা সিটি দিতে হুকুম দেওয়ার ভার তো আপনার ওপর নেই।

কাল থেকে অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে সার্‌—লোডিং শেষ হয় নি—দশ নম্বর কিলেন—

আপনি কি কারখানার মালিক?

না সার্‌।

আজ আপনাকে মাফ করলাম, কিন্তু এমন যেন আর না হয়।—ম্যানেজার গটগট করিয়া চলিয়া গেলেন। শীতের দিনেও খাজাঞ্চি ঘামিয়া উঠিয়াছিল। বেচারী কপালের ঘাম মুছিয়া আপনার কাজে মন দিল। ক্যাশবাক্সের উপর একটি প্রণাম করিয়া খাতা খুলিয়া বসিল।

খাজাঞ্চিবাবু, টাকাটা আমাকে জলদি দিয়ে দেন তো।—স্টোর-ডিপার্টমেণ্টের পিওন একখানা ভাউচার ফেলিয়া দিল। ম্যানেজারের সই-করা ভাউচারটা, একশো দশ টাকা দিতে হইবে।

খাজাঞ্চি বলিল, এত টাকা কি হবে?

খড় কিনতে হবে।

তা-দাঁড়াও বাপু, একবার শুধিয়ে আসি। ভাউচারখানি হাতে করিয়া খাজাঞ্চি ম্যানেজারের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। পর্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতে ভয় হইতেছিল, সে ফিরিল। কিন্তু আবার ফিরিয়া গিয়া বাহির হইতে ডাকিল, সার।

আসুন।

এই ভাউচারটার টাকা—

ম্যানেজার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, টাকা কি কম আছে?

মাথা চুলকাইয়া খাজাঞ্চি বলিল, আজ্ঞে না, তবে—

তবে? আজ কি কোনও বড় পেমেণ্ট আছে?

আজ্ঞে না, দোব কিনা তাই শুধোচ্ছি।

সবিস্ময়ে খাজাঞ্চির মুখের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার বলিলেন, মানে—হোয়াট ডু ইউ মীন? ভাউচারে যখন সই করেছি, তখনই তো আমি দিতে বলেছি।

একটা সেলাম করিয়া খাজাঞ্চি সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। ম্যানেজার আন্দোলিত পর্দাটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইডিয়ট।

বাক্স খুলিয়া টাকা গুনিয়া গাঁথিয়া পিওনকে দিয়া খাজাঞ্চি বলিল, সই কর।

পিওন সই করিয়া দিল। টাকা লইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু খাজাঞ্চি বলিল, শোন শোন।

কি?

দাঁড়াও তো, আর একবার গুনে দেখি, ভুল হল না তো!

আবার দেখিয়া-শুনিয়া দিয়া খাজাঞ্চি খাতায় খরচ লিখিল,—স্টোর-খাতে খরচ। তারপর ম্যানেজারের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সায়!

আসুন। কি? কি বলছেন আবার?

আজ্ঞে, খড়ের টাকাটা দিয়ে দিলাম।

ম্যানেজার অবাক হইয়া খাজাঞ্চির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। খাজাঞ্চি একটা সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বারোটার ভোঁ বাজিল। স্নানাহারের জন্য এখন দেড় ঘণ্টা ছুটি। মেসে আসিয়া খাজাঞ্চি আপনার নিয়মমত জুতা-জোড়াটি ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে খুলিয়া রাখিল। তারপর গায়ের জামা খুলিয়া ঘটি ও গামছা হাতে বারান্দার তিন নম্বর থামের খাটালটিতে বসিয়া তেল মাখিতে লাগিল। স্টোর-কীপার ওদিকে তেল মাখিতেছিল, সে প্রশ্ন করিল, বোদ্‌দা, নতুন সাহেব লোক কেমন?

খাজাঞ্চির নামও বদিবাবু। খাজাঞ্চি উত্তর দিল, ভাল লোক, পাকা লোক। চিঠি যা আজ লিখছিল খসখস করে, জলে—র মতো কলম চলছে যেন!

বালতি ও ঘটি হাতে খাজাঞ্চি উঠিয়া দাঁড়াইল। লম্বা বারান্দাটায় জল রাখিবার জন্য প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে একটি করিয়া লোহার জালা রক্ষিত ছিল, খাজাঞ্চি প্রত্যেক জালা হইতে দুই ঘটি করিয়া জল তুলিয়া নিজের বালতিটি ভর্তি করিয়া লইল। তারপর সম্মুখের পোড়ো জমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পাথরটায় স্নান করিতে বসিল।

ও-পাশে ম্যানেজার সাহেব তখন ঘর দেখিতে ঢুকিলেন। সমস্ত ঘর মেরামত ও চুনকাম করা হইবে, তাহারই ব্যবস্থা করিতেছিলেন। খাজাঞ্চি স্নান সারিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল—জয়, জয় মা [illegible]। সে গামছা পরিয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। ঘরে ম্যানেজার দাঁড়াইয়া। ম্যানেজার বলিলেন, আপনি এ ঘরে থাকেন ?

আজ্ঞে হাঁ সার্, আর গোবিন্দ থাকে।

কিন্তু এ কি রকম ভাবে সীট সাজিয়েছেন—একটা উত্তর-দক্ষিণে, একটা পূর্ব-পশ্চিমে ? এই, এই খালাসী, এই সীটটা ঘুরিয়ে দে তো—এইটাকে উত্তর-দক্ষিণে করে দে। এ কি, ঘরের মাঝখানে জুতো ?—বলিয়া তিনি নিজেই পায়ে করিয়া জুতো-জোড়াটা এক পাশে ঠেলিয়া দিলেন। নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া লোকজন সহ ম্যানেজার বাহির হইয়া গেলেন। খাজাঞ্চির সীটটাই ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি সেই গামছা পরিয়াই বাহির হইয়া গেল। ম্যানেজার তখন শশী মিস্ত্রীর ঘরে তামাকের গুল ও দেওয়ালে হাত-মোছা তেল-কালি ও মাংসের হলুদের দাগ লইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার প্যান্টের পিছনে পর্যন্ত হলুদ ও কালির দাগ।

সার্ !

ম্যানেজার ফিরিয়া দেখিলেন, খাজাঞ্চি।—কি বলছেন ? কাপড় ছাড়েন নি এখনও আপনি। যান যান, কাপড় ছেড়ে আসুন।

সার্, আজ চোদ্দ বছর আমার সীটটা এমনই ভাবে আছে সার্।

ম্যানেজার অবাক হইয়া গেলেন, বলিলেন, কি বলছেন আপনি ?

আমার সীটটা—

হঠাৎ রুষ্ট হইয়া ম্যানেজার বলিলেন, না না, আপনার জন্য অন্যের অসুবিধা হতে পারে না।

খাজাঞ্চি ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। রুম-মেট গোবিন্দ স্নানান্তে চুল আঁচড়াইতেছিল, সে বলিল, কাপড় ছাড়ুন।

খাজাঞ্চি বলিল, একবার তক্তাপোশটা ধর তো ভাই গোবিন্দ।

গোবিন্দ অত্যন্ত ভালমানুষ, সে বলিল, ম্যানেজারবাবু যে—

ততক্ষণে তক্তাপোশের এক প্রান্ত ধরিয়া খাজাঞ্চি বলিল, ওরে বাবা, এই কারখানায় এসে অবধি এই ঘরটাতে—এই তক্তায়—ওই পূর্ব-শিয়রে আমি আছি, ও আমি বদল করব না।

গোবিন্দ আর প্রতিবাদ করিল না। তক্তাপোশের অপর প্রান্তটা সে আসিয়া ধরিল।

তক্তাপোশটা যথাস্থানে ঘুরাইয়া পাতিয়াই খাজাঞ্চি সর্বাগ্রে জুতা-জোড়াটি তুলিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থলে আনিয়া রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় খাজাঞ্চি ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর বিষম চটিয়া বলিল, নাঃ, এখানকার অন্ন আমার ঘুচুলে এরা। আচ্ছা, হুঁকো কে নামিয়ে দিলে আমার।

গোবিন্দ বলিল, ম্যানেজারবাবু আবার সন্ধ্যেবেলায় এসেছিলেন। বিশেষ করে বলে গেলেন, হুঁকো ওখানে রাখবেন না। তক্তাপোশ ঘুরিয়ে-ছেন, কিন্তু জানালায় হুঁকো আর ঘরের মাঝখানে জুতো—এ রাখা হবেনা।

জুতা-জোড়াটা ঘরের মধ্যস্থলেই খুলিয়া রাখিয়া খাজাঞ্চি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তক্তাপোশটার্ উপরে বসিয়া পড়িল। আবার উঠিয়া সে জুতা-জোড়াটা সরাইয়া রাখিল।

পরদিন সকালবেলা। খাজাঞ্চি ঘড়ির কাছে চেয়ার লইয়া কি করিতেছিল। জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ম্যানেজার নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন। সেদিন অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট অশ্বিনী ম্যানেজারকে খাতাপত্র দেখাইতেছিল। ক্যাশ-খাতা দেখিয়া ম্যানেজার বলিলেন, এ কি ? এ কি লেখা ? আর লাইন আরম্ভ হয়েছে এখানে, শেষ হল গিয়ে দু-ইঞ্চি বেঁকে এসে এখানে ? এ কি ?

অশ্বিনী বলিল, খাজাঞ্চিবাবু চোখে ভাল দেখতে পান না, আবার চশমাও নেবেন না ; বলেন, চোখ খারাপ হয়ে যাবে।

ম্যানেজার হাঁকিলেন, বেয়ারা ! খাজাঞ্চিবাবু।

খাজাঞ্চি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার বলিলেন, কত বয়স হল আপনার ?

ষাট সায়্। কোম্পানিতেই চল্লিশ বছর চাকরি করছি, এ কারখানায় চোদ্দ বছর—গোড়া থেকেই, তখন এগুলো ডাঙা ছিল, মানুষ আসতে ভয়—

এতক্ষণে অসহিষ্ণু হইয়া ম্যানেজার বলিলেন, থামুন, ও-কথা নয়। আমি বলছি, এত বয়স হল, চোখে দেখেন না, তবু চশমা নেন না কেন? এ কি—এ কি? এ রকম ভাবে কাজ চলবে না মশায়।

নোব সায়, চশমা আমি নোব সায়! খাজাঞ্চি চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পর আসিয়া বলিল, সায়, একবেলা যদি ছুটি দেন সায়, আসানসোলে মোটর যাচ্ছে—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই ম্যানেজার বলিলেন, যান।

সন্ধ্যায় চশমা-চোখে খাজাঞ্চি প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া সকলকে দেখাইয়া বলিল, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কিন্তু। কেমন হল বল দেখি? এক দুই তিন চার।—চালের বাতা গুনিতে আরম্ভ করিয়া দিল খাজাঞ্চি।

দিন কয়েক পর। ম্যানেজার খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া বলিলেন, বড় দুঃখিত আমি খাজাঞ্চিবাবু, আপনার চাকরিতে জবাব হচ্ছে। মানে, কোম্পানি আপনাকে রিটায়ার করতে অনুরোধ করে পত্র দিয়েছে। ইংরেজীতে অ্যাকাউণ্ট রাখা হবে। আর ধরুন, আপনার চাকরিও হল অনেক দিন, এখন নতুন লোককে জায়গা দিন। কেমন? লোকও এসে গেছে আমাদের।—বলিয়া কোম্পানির চিঠি ও পদত্যাগপত্রখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, এই চিঠিখানায় সই করে দিন। হ্যাঁ, কোম্পানি আপনাকে তিন মাসের মাইনে বোনাস দিয়েছে।

খাজাঞ্চি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ম্যানেজার তাহার হাতে কলম তুলিয়া দিয়া বলিলেন, এইখানটায় সই করে দিন। হ্যাঁ, তারিখ দিন—তারিখ।

চার্জও দেওয়া হইয়া গেল। খাজাঞ্চি দেখাইয়া দিল, তিন হাজার বাইশ টাকা, একটি আধুলি, একটি দু-আনি, কাগজে মোড়া একটি পাই।

ম্যানেজার তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া বলিলেন, দুঃখ করবেন না খাজাঞ্চিবাবু। ধরুন, বয়সও অনেক হল আপনার। আর আপনার যে রকম অনুরাগশীল মন; তাতে এই নিষ্ঠা নিয়ে ভগবানকে ডাকলে অনেক কাজ হবে আপনার।

খাজাঞ্চি বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা—

কর্মচারীরা কিন্তু এত সহজে বিদায় দিল না। তাহারা সভা করিল, বিদায়-ভোজ দিল, গলায় মালা পরাইয়া দিল, অনেকের চোখে জলও দেখা দিল।

পরদিন ভোরে কয়টা খালাসী খাজাঞ্চিবাবুর মাল মাথায় করিয়া স্টেশনে চলিয়াছিল, পিছনে পিছনে খাজাঞ্চিবাবু, তাহার চোখে সেই নূতন চশমা। সহসা খাজাঞ্চি বলিল, কই রে, এখনও সিটি দিলে না আজ এরা?

খালাসী বলিল, এখনও তো সময় হয়নি বাবু, এই গাড়িটা যাবে তবে তো।

খাজাঞ্চির মনে পড়িল, হ্যাঁ, তাই তো বটে, সাড়ে ছয়টা তো এখনও বাজে নাই। সাড়ে ছয়টার ট্রেনেই তো সে যাইবে। খাজাঞ্চি একবার পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কারখানার চিমনি হইতে গলগল করিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। সে চোখ ফিরাইয়া লইল। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল, ভগবান আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ হইল। কিন্তু কোথায় আকাশ! চশমা-আবরিত পরিষ্কার দৃষ্টির সম্মুখে যে সেখানে শুধু ধোঁয়া, আর ধোঁয়া আর ধোঁয়া—ওই কারখানার চিমনির উদগীরিত ধোঁয়ার আড়ালে আকাশ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আখ্ড়াইয়ের দীঘি

কয়েক বৎসর পর পর অজন্মার উপর সে বৎসর নিদারুণ অনাবৃষ্টিতে দেশটা যেন জ্বলিয়া গেল। বৈশাখের প্রারম্ভেই অন্নাভাবে দেশময় হাহাকার উঠিল। রাজসরকার পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সত্যই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না তদন্তের জন্য রাজকর্মচারী-মহলে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।

এই তদন্তে কান্দী সাবডিভিশনের কয়টা থানার ভার লইয়া ঘুরিতেছিলেন রজতবাবু ডি. এস. পি., সুরেশবাবু ডেপুটি আর রমেন্দ্রবাবু কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর। অতীতকালের সুপ্রশস্ত বাদশাহী সড়কটা ভাঙিয়া-চুরিয়া গো-পথের মতো মানুষের অব্যবহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর ডিস্ট্রীক্ট-বোর্ডের ঠিকাদার মাটির ঢেলা বিছাইয়া পথটিকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। কোনরূপে তিন জনে এক পাশের পায়ে-চলা পথরেখার উপর দিয়া বাইসিক্ল ঠেলিয়া চলিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণবেলা। দগ্ধ আকাশখানা ধূলাচ্ছন্ন ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কণামাত্র মেঘের লেশ নাই। হু-হু করিয়া গরম বাতাস পৃথিবীর বুকের রস পর্যন্ত শোষণ করিয়া লইতে-ছিল। একখানা গ্রাম পার হইয়া সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর আসিয়া পড়িল। ও-প্রান্তের গ্রামের চিহ্ন এ-প্রান্ত হইতে দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। দক্ষিণে বামে শস্যহীন মাঠ ধু-ধু করিতেছে। গ্রামের চিহ্ন বহু দূরে দিগ্বলয়ে কালির ছাপের মতো বোধ হইতেছিল।

রজতবাবু চলিতেছিলেন সর্বাগ্রে। তিনি ডাকিয়া কহিলেন—নামছি আমি। আপনারা ঘাড়ের উপর এসে পড়বেন না যেন। তিন জনেই বাইসিক্ল হইতে নামিয়া পড়িলেন। সঙ্গীরা কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, কই মশাই, সামনে গ্রামের চিহ্ন যে দেখা যায় না। এদিকে দিবা যে অবসানপ্রায়।

রমেন্দ্রবাবু কোমরে ঝুলানো বাইনাকুলারটা চোখের উপর ধরিয়া কহিলেন, দেখা যাচ্ছে গ্রাম, কিন্তু অনেক দূরে। অন্তত পাঁচ-ছ মাইল হবে। রজতবাবু রিস্টওয়াচটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—পৌনে ছটা। এখনও আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার দিনের আলো পাওয়া যাবে। কিন্তু এদিকে যে বুক মরুভূমি হয়ে উঠল মশাই। আমার ওয়াটার ব্যাগে তো একবিন্দু জল আর নেই। আপনাদের অবস্থা কি ?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, আমারও তাই। সুরেশবাবু, আপনার অবস্থা কি ? আপনি যে কথাও বলেন না, দৃষ্টিটাও বেশ বাস্তব জগতে আবদ্ধ নয় যেন। ব্যাপার কি বলুন তো ?

সুরেশবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই বর্তমান জগতে ঠিক মনটা নিবদ্ধ ছিল না। অনেক দূর-অতীতের কথা ভাবছিলাম আমি।

রজতবাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, অতীত যখন তখন ইণ্টারেস্টিং নিশ্চয়, চাই কি রোমাণ্টিকও হতে পারে। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আর ভাবতে হবে না। উঠে পড়ুন গাড়িতে। গাড়িতে চলতে চলতেই আপনি গল্প বলতে শুরু করুন। আমরা শুনে যাই। কিন্তু এই চার-পাঁচ মাইল পথ কভার করবার মতো গল্পের খোরাক হওয়া চাই মশায় !

সুরেশবাবু আপনার জলাধারটি খুলিয়া আগাইয়া দিয়া বলিলেন, আমার জল এখনও আছে। জল পান করে একটু সুস্থ হন আগে।

জলপানান্তে সুরেশবাবুকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়া রজতবাবু বলিলেন, আপনি কথক। আপনাকে আগে যেতে হবে।

সকলে গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন, আপনাদের জলের চিন্তার কথা শুনেই কথাটা আমার মনে পড়ল।

পিছন হইতে রমেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, দাঁড়ান মশায়, দাঁড়ান। বাঃ, আমাকে বাদ দিয়ে গল্প চলবে কি রকম ?···বেশ, এইবার কি বলছিলেন বলুন। একটু উচ্চকণ্ঠে কিন্তু।

সুরেশবাবু বলিলেন, যে রাস্তাটায় চলেছি আমরা, এ রাস্তাটার নাম জানেন ? এইটেই অতীতের বিখ্যাত বাদশাহী সড়ক। এ রাস্তায় কোন পথিক কোন দিন জলের জন্য চিন্তা করে নি। ক্রোশ-অন্তর দীঘি

আর ডাক-অন্তর মসজিদ এ-পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল, দীঘিগুলি এখনও আছে—

বাধা দিয়া রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন, ডাক-অন্তর মসজিদটা কি ব্যাপার ?

ডাক-অন্তর মসজিদের অর্থ হচ্ছে—এক মসজিদের আজানের শব্দ যত দূর পর্যন্ত যাবে তত দূর বাদ দিয়ে আর একটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল। এক মসজিদের আজান-ধ্বনি অপর এক মসজিদ থেকে শোনা যেত। একদিন ভাবুন—দেশদেশান্তরব্যাপী সুদীর্ঘ এই পথখানির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একসঙ্গে আজানধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠত। ওই—ওই দেখুন, পাশের ওই যে ইটের স্তূপ—ওটি একটি মসজিদ ছিল। আর প্রতি ক্রোশে একটি দীঘি আছে। তাই বলছিলাম, এ-রাস্তায় কেউ কখনও জলের ভাবনা ভাবে নি।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, বাদশাহী সড়ক যখন তখন কোন বাদশাহের কীর্তি নিশ্চয়।

ঠিক বুঝতে পারা যায় না। ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন। তবে এ বিষয়ে সুন্দর একটি কিংবদন্তী এ দেশে প্রচলিত আছে। শোনা যায় নাকি কোন বাদশাহ বা নবাব দিগ্বিজয়ে গিয়ে ফেরবার মুখে এক সিদ্ধ ফকিরের দর্শন পান। সেই ফকির তাঁর অদৃষ্ট গণনা করে বলেন—রাজধানী পৌছেই তুমি মারা যাবে। বাদশাহ ফকিরকে ধরলেন—এর প্রতিকার করে দিতে হবে। ফকির হেসে বললেন—প্রতিকার ? মৃত্যুর গতি রোধ করা কি আমার ক্ষমতা ? বাদশাহও ছাড়েন না। তখন ফকির বললেন—তুমি এক কাজ কর, তুমি এখান থেকে এক রাজপথ তৈরী করতে করতে যাও তোমার রাজধানী পর্যন্ত। তার পাশে ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ তৈরি কর।

সুরেশবাবু নীরব হইলেন। রজতবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, তারপর মশাই, তারপর ?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, তারপর বুঝুন না কি হল। আজকাল গল্প সাজেস্টিব হওয়াই ভাল। বাদশাহ রাজধানী পৌছেই মারা গেলেন। কিন্তু কত দিন তিনি বাঁচলেন অনুমান করুন। এই পথ, এই

সব দীঘি, এতগুলি মসজিদ তৈরী করতে করতে যতদিন লাগে, ততদিন তিনি বেঁচে ছিলেন।

রজতবাবু বলিলেন, হাম্‌বাগ—বাদশাহটি একটি ইডিয়ট ছিলেন বলতে হবে। তিনি তো পথটা শেষ না করলেই পারতেন—আজও তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন।

রমেন্দ্রবাবু গাড়ি হইতে নামিবার উদ্যোগ করিয়া কহিলেন—দাঁড়ান মশাই, এ পথের ধুলো আমি খানিকটা নিয়ে যাব, আর মসজিদের একখানা ইট।

সুরেশবাবু কহিলেন, আর একটা কথা শুনে তারপর। পথ তো ফুরিয়ে যায়নি আপনার।

রজতবাবু তাগাদা দিলেন, সেটা আবার কি ?

এ দেশে একটা প্রবচন আছে, সেটার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকা সম্ভব। পুলিস-রিপোর্টে সেটা আছে—

রমেন্দ্রবাবু অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, চুলোয় যাক মশাই পুলিস-রিপোর্ট। কথাটা বলুন তো আপনি।

তাড়া দেবেন না মশাই। গল্পের রস নষ্ট হবে। কথাটা হচ্ছে 'আখ্‌ড়াইয়ের দীঘির মাটি, বাহাদুরপুরের লাঠি, কুলীর ঘাঁটি।' এই তিনের যোগাযোগে এখানে শত শত নরহত্যা হয়ে গেছে। রাত্রে এ পথে পথিক চলত না ভয়ে। বাহাদুরপুরে বিখ্যাত লাঠিয়ালের বাস। কুলীর ঘাঁটিতে তারা রাত্রে এই পথের উপর নরহত্যা করত। আর সেই সব মৃতদেহ গোপনে সমাহিত করত আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভে।

রজতবাবু বলিয়া উঠিলেন, ও, তাই নাকি ? এই সেই জায়গা ?

সুরেশবাবু উত্তর দিলেন, তার কাছাকাছি এসেছি আমরা।

রজতবাবু কহিলেন, এখনও পুজোর আগে এখানে চৌকিদার রাখবার ব্যবস্থা আছে।

আর তার দরকার নেই বোধ হয়। এখন এরা শাসন মেনে নিয়েছে।

রমেন্দ্রবাবুর গাড়িখানি এই সময় একটা গর্তে পড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল। রমেন্দ্রবাবু লাফ দিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিলেন।

সকলেই গাড়ি হইতে নামিয়া আগাইয়া আসিলেন। গাড়িখানা তুলিয়া রমেন্দ্রবাবু বলিলেন, যন্ত্র বিকল। এখন ইনিই আমার ঘাড়ে চেপে যাবার মতলব করেছেন। একখানা চাকা ধাক্কায় বেঁকে টাল খেয়ে গেছে। আমাদের হাতের মেরামতের বাইরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল। রজতবাবু অস্পষ্ট সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এ যে মহা বিপদ হল সুরেশবাবু!

কি করা যায়?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, পথপার্শ্বে বিশ্রাম। মালপত্র নিয়ে পেছনের গো-যান না এলে তো উপায় বিশেষ দেখছি নে।

আপনাকে বিপদের হেতু ভাবিয়া রমেন্দ্রবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তখন গাড়িখানা লইয়া মেরামতের চেষ্টা করিতেছিলেন। রজতবাবু কহিলেন, ঘাড়ে তুলুন মশাই বাহনকে। একটা বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান নেওয়া যাক।

বাইসিক্লে ঝুলানো ব্যাগ হইতে টর্চটা বাহির করিয়া সুরেশবাবু সেটার চাবি টিপিলেন। তীব্র আলোক-রেখায় সম্মুখের প্রান্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। অদূরে একটা মাটির উঁচু স্তূপ দেখিয়া সুরেশবাবু কহিলেন, এই যে, সম্মুখেই বোধ হয় আথড়াইয়ের দীঘি। চলুন, ওরই বাঁধাঘাটে বসা যাবে।

রজতবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, অতীত যুগের কত শত হতভাগ্য পথিকের প্রেতাত্মার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথাবার্তা অতি উত্তমই হবে।

এতক্ষণে হাসিয়া রমেন্দ্রবাবু কথা কহিলেন, আর বাহাদুরপুরের দু-একখানা লাঠির সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, সে উত্তমের পরে অযোগ্য মধ্যম হবে না। কি বলেন?

কোমরে বাঁধা পিস্তলটায় হাত দিয়া রজতবাবু কহিলেন, তাতে রাজি আছি।

প্রকাণ্ড দীঘিটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া আছে। শুধু আকাশের তারার প্রতিবিম্বে জলতলটুকু অনুভব করা যাইতেছিল। চারি পাড় বেড়িয়া বন্য লতাজালে আচ্ছন্ন বড় বড় গাছগুলিকে বিকট দৈত্যের মতো মনে হইতেছিল। চারিদিক অন্ধকারে থম-থম করিতেছে। দীঘিটার দীর্ঘ দিকের মধ্যস্থলে সে-আমলের প্রকাণ্ড বাঁধাঘাট। প্রথমেই সুপ্রশস্ত

চত্বর। তাহারই কোল হইতে সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে জলগর্ভে। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুইটি রানা। এক দিকের রানা ভাঙিয়া পাশেরই একটা সুগভীর খাদের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

ঘাটের চত্বরটির মধ্যস্থলে তিনজন আশ্রয় লইয়াছিল। এক পাশে সাইকেল তিনখানা পড়িয়া আছে। ছোট একখানা শতরঞ্চি রমেন্দ্রবাবুর গাড়ির পিছনে গুটানো ছিল, সেইখানা পাতিয়া রমেন্দ্রবাবু বসিয়াছিলেন। পাশেই সুরেশবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়া আছেন। রজতবাবু শুধু চত্বরটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন, সাবধানে পায়চারি করবেন রজতবাবু। অন্যমনস্কে খাদের ভেতরে গিয়ে পড়বেন না যেন। দেখছেন তো খাদটা ?

হাতের টর্চটা টিপিয়া রজতবাবু বলিলেন, দেখছি।

আলোক-ধারাটা সেই গভীর গর্তে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। সুগভীর খাদটার গর্ভদেশটা আলোকপাতে যেন হিংস্র হাসি হাসিয়া উঠিল। রজতবাবু কহিলেন, উঃ, এর মধ্যে পড়লে আর নিস্তার নেই। ভাঙা রানাটার ইটের ওপর পড়লে হাড় চুর হয়ে যাবে।

তিনি এদিকে সরিয়া আসিয়া নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিলেন। আলোক নিবিবার পর অন্ধকারটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। ওদিকে পশ্চিম দিকপ্রান্তে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তি চকিত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশবাবু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, কে কি ভাবছেন বলুন তো ?

রমেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, ওদিকে কি যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। কি বলুন তো ?

সঙ্গে সঙ্গে দুইটা টর্চের শিখা দীঘির বুক উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রজতবাবু কহিলেন, কই ?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, ওপারে ঠিক জলের ধারে। লম্বা মতো— মানুষের মতো কি ঘুরে বেড়াচ্ছিল বোধ হল।

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, দীঘির গর্ভের কোন অশান্ত প্রেতাত্মা হয়তো।

কিংবা বাহাদুরপুরের লাঠিয়াল কেউ।

রজতবাবু কহিলেন, সে হলে তো মন্দ হয় না, একটা অ্যাডভেঞ্চার

হিয়, সময় কাটে। কন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু হলেই যে বিপদ। যাদের সঙ্গে কথা চলে না মশাই—সাপ বা জানোয়ার? ওটা কি?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাঁ-হাতের টর্চটা জ্বলিয়া উঠিল। ডান হাত তখন পিস্তলের গোড়ায়। সচকিত আলোয় দেখা গেল সেটা একগাছা দড়ি।

সুরেশবাবু বলিলেন, গুড লাক্!—রজ্জুতে সর্পভ্রমে লজ্জা আছে, বিপদ নেই। কিন্তু সর্পে রজ্জুভ্রম প্রাণান্তকর।

সকলেই হাসিলেন। কিন্তু সে হাসি মৃদুমন্থর। আনন্দ যেন জমাট বাঁধিতেছিল না।

আবার সকলেই নীরব।

অকস্মাৎ দীঘির ও-দিকের কোণে জল আলোড়িত হইয়া উঠিল।

শব্দে মনে হয়, কেহ যেন জল ভাঙিয়া চলিয়াছে। টর্চের আলো অত দুর পর্যন্ত যায় না। আলোক-ধারার প্রান্তমুখে অন্ধকার সুনিবিড় হইয়া উঠে, কিছু দেখা গেল না।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, এখনও বলবেন আমার ভ্রম!

সুরেশবাবু কথার উত্তর দিলেন না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে শব্দটা লক্ষ্য করিতেছিলেন। শব্দটা নীরব হইয়া গেল।

সুরেশবাবু আরও কিছুক্ষণ পর বলিলেন, ভ্রমই বোধ হয়। জলচর কোন জীবজন্তু হবে।

গরম বাতাসের প্রবাহটা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া চারিদিক একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

সুরেশবাবু আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, নাঃ, শুধু রমেন্দ্রবাবুকে দোষ দেব কেন—আমরা সকলেই ভয় পেয়েছি। সিগারেট খাওয়া পর্যন্ত ভুলে গেছি মশাই! নিন, একটা করে সিগারেট খাওয়া যাক।

রজতবাবু বলিলেন, না মশাই, একেই আমি অভ্যস্ত নই, তার ওপর খালি-পেটে শুকনো গলায় সহ্য হবে না, থাক্।

আসুন তবে রমেনবাবু, আমরা দুজনেই—ও কি?

মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বরে তিনজনেই চকিত হইয়া উঠিলেন।

কে যেন আত্মগত ভাবেই মৃদুস্বরে বলিতেছিল, তারা, তারাচরণ! এইখানেই তো ছিল। কোথা গেল?

রজতবাবুর হাতের টর্চটা প্রদীপ্ত রশ্মিরেখায় জলিয়া উঠিল।

রমেনবাবু ত্রস্ত স্বরে বলিলেন, এদিকে, এদিকে, ভাঙা রানাটার পাশে জলের ধারে। ওই, ওই। কিন্তু দপদপ করে জ্বলছে কি? চোখ কি?—ওই—ওই—

দীর্ঘ রশ্মিধারা ঘুরিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর টর্চটাও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জলের ধারে দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া ছিল। আলোকচ্ছটার আঘাতে চকিত হইয়া সে রশ্মির উৎস লক্ষ্য করিয়া মুখ ফিরাইল। রমেন্দ্রবাবু অস্ফুট চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। সুরেশবাবুর হাতের টর্চটা নিবিয়া গিয়াছিল। অদ্ভুত অতি ভীতিপ্রদ সে মূর্তি!

দীর্ঘ বিবর্ণ চুল, দীর্ঘ দাড়িগোঁফে সমস্ত মুখখানা আচ্ছন্ন, অস্বাভাবিক ঘ কৃষ্ণবর্ণ দেহখানা কর্দমলিপ্ত। কোটরগত জলন্ত চোখ দুইটিতে আলো পড়িয়া ঝকঝক করিতেছিল। সে মূর্তি ধরণীর সর্বমাধুর্যবর্জিত, মাটির জগতের বলিয়া বোধ হয় না।

রজতবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তবুও তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কে? কে তুমি? উত্তর দাও! কে তুমি? নিথর নিস্তব্ধ মূর্তির পেশীগুলি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে অধররেখা ভিন্ন হইয়া গেল। সে ভঙ্গিমা যেমন হিংস্র তেমনি ভয়ঙ্কর।

রজতবাবু আকাশ লক্ষ্যে পিস্তলটার ঘোড়া টিপিলেন। সুগভীর গর্জনে নিবিড় অন্ধকার চমকিয়া উঠিল। বৃক্ষনীড়াশ্রয়ী পাখির দল কলরব করিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত আর একটা গর্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। একটা বিকট হিংস্র গর্জন করিয়া সে বিকট মূর্তি লাফ দিয়া ছুটিয়া আসিল। সে মূর্তি তখন জানোয়ারের চেয়ে হিংস্র—উন্মত্ত। রজতবাবুর বাঁ-হাতের টর্চটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। ডান হাতে পিস্তলটা কাঁপিতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে গুরুভার কিছু পতনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আহত পশুর মতো একটা আর্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন, সুরেশবাবু, শীগগীর টর্চটা জ্বালুন। আমারটা কোথায় পড়ে গেছে।

সুরেশবাবুর হাতের আলোটা জ্বলিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন, এখানে আসুন—খাদের মধ্যে।

খাদের মধ্যে আলোকপাত করিতেই রজতবাবু বলিলেন, মানুষই, কিন্তু মরে গেছে বোধ হয়। ঘাড় নিচু করে পড়েছে, ঘাড় ভেঙে গেছে।

সুরেশবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপের মধ্যে হতভাগ্যের মাথাটা অর্ধ-প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রণার আক্ষেপে ঊর্ধ্বমুখে সমগ্র দেহখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। উপর হইতে রমেন্দ্রবাবু সভয়ে কাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কে? ও কি? কিসের শব্দ?

ক্ষণিক মনোযোগসহকারে শুনিয়া সুরেশবাবু কহিলেন—গাড়ি। গোরুর গাড়ির শব্দ।

গন্তব্য থানায় পেঁীছিতে বাজিয়া গেল বারোটা।

তিনটি বন্ধুতেই নীরব। একটা বিষণ্ণ আচ্ছন্নতার মধ্যে যেন চলাফেরা করিতেছিলেন। শবদেহটা গাড়িতে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে।

সেটা নামানো হইলে রজতবাবু সাব-ইন্সপেক্টরকে বলিলেন, লোকটাকে এখানকার কেউ চিনতে পারে কি না দেখুন তো?

মুখাবরণ মুক্ত করিয়া দারোগা চমকিয়া উঠিলেন।

রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন, চেনেন আপনি?

না। কিন্তু এ কি মানুষ?

জমাদার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল—আমি চিনি স্যর। এ একজন দ্বীপান্তরের আসামী। আজ দিন দশেক খালাস হয়ে বাড়ি এসেছে! সেদিন এসেছিল থানায় হাজিরা দিতে। বাহাদুরপুরের লোক, নাম কালী বাগদী।

বেশ। তা হলে রিপোর্ট লেখ। একটা গামছায় বাঁধা কোমরে ওর কি কতকগুলো ছিল—দেখ তো সেগুলো কি?

অনুসন্ধানে বাহির হইল একখানা কাপড়, ছোট ঘড়ি একটা, কয়খানি কাগজ। কাগজগুলি একটা মোকদ্দমার নথি ও রায়। নথিগুলিতে বহরমপুর জেলের ছাপ মারা—জেল-গেটে জমা ছিল। সঙ্গে একখানি চিঠি, হাইকোর্টের কোন উকিলের লেখা—এরূপভাবে দণ্ডাদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য আপীল করা অস্বাভাবিক ও আমাদের ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিজনক। সেইজন্য ফেরত পাঠানো হইল।

রজতবাবু নথিটা পড়িয়া গেলেন—

সেশন্স কোর্টের নথি। ১৯০৮ সালের ৫নং খুনী মামলার ইতিহাস। সম্রাট বাদী, আসামী কালীচরণ বাগদী—

অভিযোগ: আসামী তাহার পুত্র তারাচরণ বাগদীকে হত্যা করিয়াছে। সাক্ষী তিনজন।

প্রথম সাক্ষী মোবারক মোল্লা। এই ব্যক্তি বাহাদুরপুরের নানকাদার, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এই ব্যক্তিকে সরকার পক্ষের উকিল প্রশ্ন করেন—

কালীচরণ বাগদীকে আপনি চেনেন?

উত্তর—হ্যাঁ। এই আসামী সেই লোক।

—কি প্রকৃতির লোক কালীচরণ?

—দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল।

—আপনার সঙ্গে কি কালীচরণের কোন ঝগড়া আছে?

—না। সে আমার ওস্তাদ। আমি তার কাছে লাঠিখেলা শিখেছি।

—তারাচরণ বাগদীকে আপনি জানতেন?

—হ্যাঁ। ওস্তাদ কালীচরণেরই ছেলে সে।

—আচ্ছা, এটা কি ঠিক যে, কালীচরণ তারাচরণকে ভাল দেখতে পারত না?

—না। তবে ছেলেবেলায় তারাচরণ খুব রুগ্ন ছিল বলে ওস্তাদের ছেলেতে মন উঠত না। বলত, বেটাছেলে যদি বেটাছেলের মতো না হয়, তবে সে ছেলে নিয়ে করব কি?

—তারপর, বরাবরই তো সেই রকম ভাব ছিল?

—না। তারাচরণ বারো-তেরো বছর বয়স থেকে সেরে উঠে জোয়ান হতে আরম্ভ হলে ওস্তাদের চোখের মণি হয়ে উঠেছিল সে।

—কালীচরণ কি তারাচরণকে আখড়ায় মারত না?

—হ্যাঁ, ভুল করলে ওস্তাদের হাতে কারও রেহাই ছিল না, নিজের ছেলে বলে দাবির ওপর—

—থাক ও-কথা। আচ্ছা, আপনি কি জানেন, কুলীর ঘাঁটিতে রাত্রে পথিক খুন হয়?

—জানি। শুনেছি বহুকাল থেকে—বোধ হয় একশো বছর ধরে এ কাণ্ড ঘটে আসচে।

—কারা এ সব করে জানেন?

—না।

—শোনেন নি?

—বহুজনের নাম শুনেছি।

—আপনাদের গ্রামের বাগদীদের নাম—এই কালীচরণ, তার পূর্বপুরুষ—এদের নাম শুনেছেন কি?

—শুনেছি।

সরকারপক্ষের উকিল সাক্ষীকে জেরা করিতে ইচ্ছা করেন না।

দ্বিতীয় সাক্ষী এলোকেশী বাগদিনী। মৃত তারাচরণ বাগদীর স্ত্রী। বয়স আঠারো বৎসর।

প্রশ্ন—এই আসামী কালীচরণ তোমার শ্বশুর?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা বাপু, তোমার স্বামীর সঙ্গে কি তোমার শ্বশুরের ঝগড়া ছিল?

—না।

—কখনও ঝগড়া হত না!

—ঝগড়া হত বইকি। কতদিন টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া হত। কিন্তু তাকে ঝগড়া বলে না।

—কিসের টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া?

—খুনের, ডাকাতির। আমার শ্বশুর, আমার স্বামী মানুষ মারত। ডাকাতিও করত।

—কেমন করে জানলে তুমি?

—বাড়িতে শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, আমার স্বামীর কাছে শুনেছি, এদের বাপ-বেটার কথাবার্তায় বুঝেছি। আর কতদিন রক্তমাখা টাকা-গয়না জলে ধুয়ে পরিষ্কার করেছি।

—তোমার স্বামী তারাচরণকে কে খুন করেছে জান?

—জানি। আমার শ্বশুর খুন করেছে। আমি নিজে চোখে দেখেছি।

বিচারক প্রশ্ন করেন—তুমি নিজের চোখে খুন করা দেখেছ?

—হ্যাঁ, হুজুর, সমস্ত দেখেছি।

বিচারক আদেশ করেন—কি দেখেছ তুমি? আগাগোড়া বল দেখি?

সরকার পক্ষের উকিলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইল।

সাক্ষীর উক্তি—

হুজুর, শ্রাবণ মাসের প্রথমেই আমি বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। শ্রাবণের সাতাশে আমার ছোট বোনের বিয়ে ছিল। আমার স্বামী পঁচিশে তারিখে সেই বিয়ের নিমন্ত্রণে এখানে আমার বাপের বাড়িতে আসে। আরও অনেক কুটুম্বসজ্জন এসেছিল। জাত-বাগদী আমরা হুজুর, সকলেই আমাদের লাঠিয়াল। আর ছোট জাতের আমোদ-আহ্লাদে মদই হল হুজুর প্রধান জিনিস। বড় বড় সব জোয়ান দিবারাত্র মদ খেয়েছে আর ঘাঁটি-খেলা খেলেছে!

বিচারক প্রশ্ন করেন—ঘাঁটি-খেলা কি?

—হুজুর, ডাকাতি করতে গিয়ে যেমন লাঠি খেলে, গেরস্তর-ঘর চড়াও করে বাইরের লোককে আটকে রাখে, সেই খেলার নাম ঘাঁটি-খেলা। সেই খেলা খেলতে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার দাদার ঝগড়া হয়। তিন তিন বার আমার দাদার ঘাঁটি ভেঙে দিয়ে বলেছিল—এ ছেলেখেলা ভাল লাগে না বাপু। মনের রাগে দাদা রাত্রে খাবার সময় আমার স্বামীর কুলের খোঁটা তুলে অপমান করে। আমার ননদ নীচ জাতের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই নিয়ে কুলের খোঁটা। স্বামী আমার তখনই উঠে পড়ে সেখান থেকে চলে আসে। আমার সঙ্গে দেখা করেনি হুজুর, তা হলে তাকে আমি সেই অন্ধকার বাদল রাতে বেরুতে দিতাম না। আমি যখন খবর পেলাম তখন সে বেরিয়ে চলে গেছে। আমিও আর থাকতে পারলাম না—থাকতে ইচ্ছাও হল না। যে মরদ স্বামীর জন্যে আমার সমবয়সীরা আমাকে হিংসে করত, তার অপমান আর সহ্য হল না। আর আমাকে সে যেমন ভালবাসত—

সাক্ষী এই স্থলে কাঁদিয়া ফেলে। কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করিয়া আবার বলিল, অন্ধকার বাদল রাত্রি সেদিন—কোলের মানুষ নজর হয় না এমনি অন্ধকার। পিছল পথ, বার বার পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম।

গ্রামের বাইরে এসে আমি চীৎকার করে ডাকলাম—ওগো, ওগো! ঝিপ-ঝিপ করে বৃষ্টির শব্দ আর বাতাসের গোঙানিতে সে শব্দ সে বোধ হয় শুনতে পায় নাই। শুনলে সে দাঁড়াত—নিশ্চয় দাঁড়াত হুজুর। তবে আমি তার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। বাতাসটা সামনে থেকে বইছিল। সে গান করতে করতে যাচ্ছিল, বাতাসে সে গান পিছু দিকে বেশ ভেসে আসছিল।

সাক্ষী আবার নীরব হইল।

কিছুক্ষণ পরে সাক্ষী আবার আরম্ভ করিল—

আমি প্রাণপণে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পিছল পথ, তাড়াতাড়ি চলবার উপায় ছিল না। সামনে থেকে জলের ফোঁটা কাঁটার মত মুখ চোখে বিঁধছিল। হঠাৎ একটা চীৎকারের শব্দ কানে পৌঁছল—বাবা, বাবা! শেষটা আর শুনতে পেলাম না। চিনতে পারলাম আমার স্বামীর গলা, ছুটে এগিয়ে যেতে গিয়ে পথে পড়ে গেলাম। উঠে একটু দূরে এগিয়ে যেতে দেখি, একজোড়া আঙরার মত চোখ ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। এই চোখ দেখে চিনলাম, সে আমার শ্বশুর। আমার শ্বশুরের চোখের তারা বেড়ালের চোখের মত খয়রা রঙের, সে চোখ আঁধারে জ্বলে। অন্ধকারের মধ্যে চলে চলে চোখে তখন অন্ধকার সয়ে গিয়েছিল, আমি তখন দেখতেও পাচ্ছিলাম। দেখলাম, আমার শ্বশুর একটা মানুষকে কাঁধে ফেলে আখ্‌ড়াইয়ের দীঘির পাড় দিয়ে নেমে গেল। বুক ফেটে কান্না এল, কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। গলা যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, চোখে যেন আগুন জ্বলছিল। আমিও তার পিছন নিলাম।

সাক্ষীকে বাধা দিয়ে বিচারক প্রশ্ন করিলেন, তোমার ভয় হল না?

সাক্ষী উত্তর দিল, আমরা বাগদীর মেয়ে! আমাদের মরদে খুন করে, আমরা লাস গায়েব করি হুজুর, আমরা লাস গায়েব করি। হুজুর, আমার হাতে যদি তখন কিছু থাকত তবে ঐ খুনেকে ছাড়তাম না।

সাক্ষী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া আসামীকে আক্রমণের চেষ্টা করে। তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয় ও তাহার উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া সেদিনকার মত বিচার স্থগিত রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। সাক্ষী কিন্তু বলে যে, সে বলিতে সমর্থ এবং আর সে এরূপ আচরণ করিবে না।

সে কহিল—তারপর দীঘির গর্ভে দেহটাও পুঁতে দিলে সে, আমি দেখলাম। তখন পশ্চিম আকাশে কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ মেঘের আড়ালে উঠেছিল। অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সেই আলোতে পরিষ্কার চিনতে পারলাম, খুনী আমার শ্বশুর! সে বাড়ির দিকে হনহন করে চলে গেল। আমি পিছু ছাড়ি নাই।

বাড়িতে এসে লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে সে বাড়ি ঢুকল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অল্পক্ষণ পরেই কে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল, চিনলাম সে আমার শাশুড়ীর গলা, কিন্তু একবার কেঁদেই চুপ হয়ে গেল—

এই সময় আসামী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আমি তার মুখ চেপে ধরেছিলাম। হুজুর, আর সাক্ষী-সাবুদে দরকার নাই। আমি কবুল খাচ্ছি। আমিই আমার ছেলেকে খুন করেছি। হুকুম পেলে আমি সব বলে যাই।

বিচারক এরূপ ক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া আসামীকে স্বীকারোক্তি করিবার আদেশ দিলেন।

আসামী বলিয়া গেল, হুজুর, আমরা জাতে বাগদী, আমরা এককালে নবাবের পল্টনে কাজ করতাম। আজও আমাদের কুলের গরম—লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানির আমলে আমাদের পল্টনের কাজ যখন গেল, তখন থেকে এই আমাদের ব্যবসা। হুজুর, চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ; মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হল মেয়ের জাত। জমিদার লোকের বাড়িতে এককালে আমাদের আশ্রয় হত। কিন্তু কোম্পানির রাজত্বে থানা-পুলিসের জবরদস্তিতে তারাও সব একে একে গেল। যারা টিঁকে থাকল তারা শিং ভেঙে ভেড়া ভালমানুষ হয়ে বেঁচে রইল। তাদের ঘরে চাকরি করতে গেলে এখন নীচ কাজ করতে হয়, গাড়ু বইতে হয়, মোট মাথায় করতে হয়, জুতো খুলিয়ে দিতেও হয় হুজুর। তাই আমরা এই পথ ধরি। আজ চার পুরুষ ধরে আমরা এই ব্যবসা চালিয়ে এসেছি। জমিদারের লগদীগিরি লোক-দেখানো পেশা ছিল আমাদের! রাত্রির পর রাত্রি চামড়ার মত পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে কুলীর ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থেকেছি। মদের নেশায় মাথার ভেতরে আগুন ছুটত। সে নেশা ঝিমিয়ে আসতে পেত না। পাশেই থাকত মদের ভাঁড়। সেই ভাঁড়ে

চুমুক দিতাম। অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠতাম। হাতে থাকত ফাবড়া—শক্ত বাঁশের দু-হাত লম্বা লাঠি, সেই লাঠি ছুঁড়তাম মাটির কোল ঘেঁসে। সাপের মত গোঙাতে গোঙাতে সে লাঠি ছুটে গিয়ে পথিকের পায়ে লাগলে আর তার নিস্তার ছিল না। তাকে পড়তেই হত। তারপর একখানা বড় লাঠি তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেপে দাঁড়াতাম, আর পা দুটো ধরে দেহটা উল্টে দিলেই ঘাড়টা ভেঙে যেত।

এই সময় একজন জুরি অজ্ঞান হইয়া পড়ায় আদালত সেদিনকার মত বিচার বন্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন।

পরদিন বিচারক ও জুরিগণ আসন গ্রহণ করিলে আসামী বলিতে আরম্ভ করিল—

কত মানুষ যে খুন করেছি তার হিসেব আমার নেই। সে-সময় কোন কথা কানে আসে না হুজুর। তাদের কাতরানি যদি সব কানে আসিত, মনে থাকত হুজুর, তা হলে সত্যি পাথর হয়ে যেতাম। মনে পড়ে শুধু দুটি দিনের কথা। যেদিন আমার বাপের কাছে আমি হাতেখড়ি নিই, আর আমি আমার ছেলে তারাচরণকে যেদিন হাতেখড়ি দিই, এই দুদিনের কথা মনে আছে। সরল বাঁশের কোঁড়ার মত দীঘল কাঁচা জোয়ান তখন তারাচরণ। অন্ধকার রাত্রে শিকারের গলায় দাঁড়িয়ে বললাম, দে, পা-দুটো ধরে ধড়টা ঘুরিয়ে দে। সে থরথর করে কেঁপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি শিকার শেষ করলাম, কিন্তু মনটা কেমন সেদিন হিম হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, প্রথম দিন আমিও এমনি করে কেঁপেছিলাম। তারপর হুজুর, অভ্যেসে সব হয়—ক্রমে ক্রমে তারা আমার হয়ে উঠল গুলিবাঘ। পালকের মত পাতলা গা—পাথরের মত শক্ত ছাতি—শিকার পথের উপর পড়লে আমি যেতে না-যেতে সে গিয়ে কাজ শেষ করে রাখত। ঘটনার দিন হুজুর—

আসামী নীরব হইল। সে পানীয় জল প্রার্থনা করিল। জল পান করিয়া সে কহিল—সেদিনের সে ভুল তারাচরণের, আমার ভুল নয়। তবে সে আমার ভাগ্যের দোষ। আর নয়তো যাদের খুন করেছি, তাদের অভিসম্পাতের ফল। তবে এ যে হবে এ আমি জানতাম—আমার বাবা বলেছিল, আমাদের বংশ থাকবে না—নির্ব্বংশ হতেই হবে।

আবার আসামী নীরব হইল। আসামী কাতর হইয়া পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া আদালত কিছুক্ষণ সময় দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আসামী তাহা চাহে না। সে কহিল—আর শেষ হয়েছে হুজুর। তবে আর একটু জল। পুনরায় জলপান করিয়া সে বলিয়া গেল—

সে দিন তারার আসবার কথা নয়। কুটুম্ববাড়িতে বিয়ের নেমতন্নে গিয়ে বিয়ের রাত্রেই সে চলে আসবে, এ ধারণা আমি করতে পারি নাই হুজুর। সেদিন অন্ধকার রাত্রি। ঝিপঝিপ করে বাদলও নেমেছিল। আমার বউমার কাছে শুনেছেন, আমার চোখ অন্ধকারে বেড়ালের মত জ্বলে। আমার চোখেও আমি সেদিন ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। সর্বাঙ্গ ভিজে হিম হয়ে যাচ্ছিল। আমি ঘন ঘন মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। দু-পহর রাত পর্যন্ত শিকার না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে আসছি—এমন সময় কার গানের খুব ঠাণ্ডা আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাতাস বইছিল আমার দিক থেকে। আওয়াজটা বাতাস ঠেলে উজানে ঠিক আসছিল না। সেদিন হাতে পয়সাকড়ি কিছু ছিল না। মানুষের সাড়া পেয়ে মদের ভাঁড়ে চুমুক মেরে অভ্যেসমত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে চলন্ত মানুষ নড়ছিল,—মারলাম ফাবডা। লাস পড়ল। চীৎকার করে সে কি বললে কানে এল না। ছুটে গিয়ে গলায় লাঠি দিয়ে উঠে দাঁড়াব, শুনলাম, বাবা—বাবা—আমি—

কথাটা কানেই এল, কিন্তু মনে গেল না, তার গলা আমি চিনতে পারলাম না। লাঠির ওপরে দাঁড়িয়ে বললাম—এ সময়ে বাবা সবাই বলে।

আসামী নীরব হইল। আবার সে বলিল—পেয়েছিলাম আনা-ছয়েক পয়সা আর তার কাপড়খানা।

আবার সে নীরব হইল। কিন্তু মিনিট-খানেকের মধ্যেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

রায়ে বিচারক দণ্ডাদেশের পূর্বে লিখিয়াছেন—যুগ-যুগান্তরের সাধনায় মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখার নির্দেশ করিয়াছে। তাঁহার নামে সৃষ্টি ও সমাজের কল্যাণে অন্যায় ও পাপের রোধহেতু দণ্ডবিধির সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতিভূস্বরূপ বিচারক সেই বিধি অনুসারে অন্যায়ের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। এই

ব্যক্তির যে অপরাধ, বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের দণ্ডবিধিতে তাহার যোগ্য শাস্তি নাই। এ ক্ষেত্রে একমাত্র চরমদণ্ডই বিধি। আমার স্থির বিশ্বাস, সেই জন্যই সমগ্র বিশ্বের অদৃশ্য পরিচালক তাহার দণ্ডবিধান স্বয়ং করিয়াছেন; চরমদণ্ড এ ক্ষেত্রে সে গুরুদণ্ডকে লঘু করিয়া দিবে। ঈশ্বরের নামে বিচারকের আসনে বসিয়া তাঁহার আমোঘ বিধানকে লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস ইহার শাস্তি বিহিত হইল।

রায় শেষ হইয়া গেল।

তিনজনেই নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনের বিচিত্র চিন্তাধারার পরিচয় বোধহয় প্রকাশ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

অকস্মাৎ রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, একটা কথা বলব সুরেশবাবু?

মৃদুস্বরে সুরেশবাবু বলিলেন, বলুন।

পুলিস একসিকিউটিভ আপনারা দুজনেই তো এখানে রয়েছেন। দেহটা আর মর্গে পাঠাবেন না। ওই আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভেই ওকে শুয়ে থাকতে দিন।

নারী ও নাগিনী

ইটের পাঁজা হইতে খোঁড়া শেখ ইট ছাড়াইতেছিল। খোঁড়া শেখের নাম যে কি, তাহা কেহ জানে না; বোধ করি খোঁড়ার নিজেরও মনে নাই। কোন্ শৈশবে তাহার বাঁ পাখানি ভাঙার পর হইতেই সে খোঁড়া নামেই চলিয়া আসিতেছে। শুধু পাখানি তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে, সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর। তারপর হয় তাহার বসন্ত, সেই বসন্তের দাগে কুৎসিত খোঁড়া দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার মনেই খোঁড়া ইট ছাড়াইতেছিল!

অদূরে অদাই ওরফে ওয়াহেদ শেখ গাড়ি লইয়া আসিতেছিল। গোরু দুইটার লেজ দুমড়াইয়া সে গান ধরিয়া দিল—একটা অশ্লীল গান। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার তালভঙ্গ হইয়া গেল। গোরু দুইটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অদাই একটা ঝাঁকানি খাইয়া গান ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, শালার গোরু, কিছু না বলেছি—

প্রচণ্ড ক্রোধে পাঁচন-ছড়িটা সে তুলিল গোরু দুইটার অবাধ্যতার শাস্তি দিতে। গোরু দুইটাও ক্রমাগত ফোঁস-ফোঁস করিয়া গর্জন করিতেছিল। অদাইয়ের কিন্তু প্রহার করা হইল না, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, খোঁড়া খোঁড়া, সাপ—সাপ!

অদাইয়ের গাড়ির সম্মুখেই একটি কিশোর সাপ ফণা তুলিয়া অল্প অল্প দুলিতেছিল। অদাই গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটা ইট উঠাইল।

ওদিক হইতে খোঁড়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, মারিস না অদাই, মারিস না। যাই, আমি যাই।

অদাইয়ের হাতের ইট তোলাই রহিল, সে বলিল, কি বাহারের সাপ মাইরি! মুখখানা সিঁদুরের মত টকটকে লাল। মাথার চক্করই বা কি বাহারের! কিন্তু পালাল—পালাল যে, শিগগির আয়।

সাপটা এইবার দ্রুতবেগে পলাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু চলিয়াছিল খোঁড়ার দিকেই, অদাইকে পিছনে ফেলিয়া পলায়নই তাহার উদ্দেশ্য। খোঁড়াকে সে দেখে নাই।

খোঁড়া হাঁকিল, দে তো অদাই, তোর পাঁচখানা ছুঁড়ে। যাঃ সে, ঢুকে পড়ল পাঁজার ভেতর। উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ বড় পাওয়া যায় না। ধরতে পারলে কিছু রোজগার হত রে।

খোঁড়া সাপের ওঝা। শুধু ওঝা নয়, সাপ লইয়া খেলাও সে করে। ঘরের চালের কানাচে বড় বড় মুখ-বন্ধ হাঁড়ি তাহার খাটানোই আছে। তাহারই মধ্যে সাপগুলোকে সে বন্দী করিয়া রাখে। জীর্ণ হইলে দূরে মাঠে গিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া আসে। কত সাপ মরিয়াও যায়। সাপ যখন থাকে, তখন খোঁড়া মজুর খাটে না। তখন দেখা যায়, বিষম-ঢাকি ও তুবড়ি-বাঁশি লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে। রোজগারও মন্দ হয় না। কিন্তু গাঁজা-আফিঙের বরাদ্দ তখন বাড়িয়া যায়। কখনও কখনও মদও চলে। ফলে সাপগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া আবার ঝুড়ি ও বিড়া লইয়া বাহির হয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে বীভৎস মুখখানি ঈষৎ বাড়াইয়া বলে, মজুর খাটাবে গো—মজুর?

তোশামোদ করিয়া সে হাসে, বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ আরও বীভৎস, আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে; মজুরি মিলিলে সে প্রাণপণে খাটে, সেখানে সে ফাঁকি দেয় না। যেদিন না মেলে, সেদিন ঝুড়ি কাঁধেই ভিক্ষা আরম্ভ করে। যাহা পায়, তাই দিয়াই খানিকটা গাঁজা-আফিং কেনে। কিনিয়াও যদি কিছু থাকে, তবে খানিকটা পচাই-মদ গিলিয়া বাড়ি ফিরিয়া জোবেদা বিবির পা ধরিয়া কাঁদিতে বসে, বলে, আমার হাতে পড়ে তোর দুর্দশার আর সীমা থাকল না। না খেতে দিয়ে মেরে ফেললাম।

জোবেদা হাসিতে হাসিতে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলে, লে—লে, খেপামি করিস না, ছাড় আমাকে—দুটো চাল দেখে আনি।

খোঁড়ার কান্না বাড়িয়া যায়, সে একবার জোবেদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, এক জেরা লতুন কানি কখন দিতে লারলাম। পুরানো তেনা পরেই তোর দিন গেল।

যাক ওসব কথা। পরদিন অতি প্রত্যূষে খোঁড়া ইটের পাঁজাটার কাছে আসিয়া হাজির হইল। হাতে ছোট একটি লাঠি। বগলে একটা ঝাঁপি। সম্মুখে পূর্ব-দিকচক্রবালে সবে রক্তাভা দেখা দিতে শুরু করিয়াছে। গাছের বুকের মধ্যে বসিয়া পাখিরা মুহুর্মুহু কলরব করিতেছিল। গ্রামের মধ্যে কোন্ হিন্দু দেব-মন্দিরে মঙ্গলারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে। একটা উঁচু ঢিপির উপর বসিয়া খোঁড়া চারিদিকে সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল।

পূর্বাচলের রাঙা রঙ ক্রমশ গাঢ় হইয়া পরিধিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। সে রঙের আভায় পাঁজার পোড়া ইটগুলো আরও রাঙা হইয়া উঠিল। খোঁড়ার ময়লা কাপড়খানায় পর্যন্ত লাল রঙের ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। খোঁড়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওই—ওই না ?

ঈষদ্দূরের প্রান্তরের বুকে বোধহয় সেই কিশোর সাপটিই পূর্বাকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ফণা নাচাইয়া খেলা করিতেছিল। প্রাতঃসূর্যের রক্তাভায় তাহার রঙ দেখাইতেছিল যেন গাঢ় লাল। সেই লাল রঙের মধ্যে ফণার ঘন কালো চক্রচিহ্ন অপূর্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতির রাঙা পাখার মধ্যে কালো বর্ণলেখার মতই সে মনোরম। খোঁড়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আপনার মনেই মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল, বাঃ !

তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সর্পশিশু উদীয়মান সূর্যের অভিনন্দনে এত মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, খোঁড়ার পদশব্দেও তাহার খেলা ভাঙিল না। অতি সন্নিকটে আসিতেই সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। পর-মুহূর্তে সে গর্জন করিয়া ছোবল মারিল। কিন্তু ফণা আর সে তুলিতে পারিল না। খোঁড়া ক্ষিপ্রহস্তে বাঁ হাতের লাঠিখানি দিয়া তখন তাহার মাথা চাপিয়া ধরিয়াছে। ডান হাতে সাপের লেজ ধরিয়া গোটা-দুই ঝাঁকি দিয়া খোঁড়া বেশ করিয়া সাপটাকে দেখিয়া বলিল, সাপিনী।

মাস ছয়েক পর। গাঁজার দোকান হইতে ফিরিয়া খোঁড়া জোবেদাকে বলিল, কি এনেছি দেখ্।

উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে বুলাইতে জোবেদা বলিল, কি ?

কাপড়ের খুঁট খুলিয়া খোঁড়া ছোট চিকচিকে একটি বস্তু বাহির করিয়া হাতের তালুর উপর রাখিয়া জোবেদার সম্মুখে ধরিল। বস্তুটি ছোট একটি মিনি—নাকে পরিবার অলঙ্কার।

জোবেদা প্রশ্ন করিল, এত ছোট মিনি কি হবে ?

হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিবিকে পরিয়ে দেব।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল, হাসিতে হাসিতে খোঁড়া ঘরে প্রবেশ করিল। তারপর গলায় একটি সাপ জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। সেই সাপটি। এতদিনে আরও একটু বড় হইয়াছে। কিন্তু সে তেজ নাই। শান্ত আক্রোশহীনভাবে ধীরে ধীরে মুখটি ঈষৎ তুলিয়া খোঁড়ার গলায় কাঁধে ফিরিতেছিল। জোবেদা বলিল, দেখ, ও কোরো না। যতই তেজ না থাক্, ও-জাতকের বিশ্বেস নাই।

হাঁসিয়া খোঁড়া বলিল, বিশ্বেস নাই ওদের বিষ-দাঁতকে। নইলে ওরাও তো ভালবাসে জোবেদা। বিষ-দাঁতই নাই, কিন্তু আর দাঁত তো রয়েছে, কই, আমাকে তো কামড়ায় না। কেমন ভাল মেয়ের মত বিবি আমার ফিরছে বল্ দেখি!—বলিয়া সে সাপটির ঠোঁট দুইটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে একটা চুমা খাইয়া বসিল।

জোবেদা বিস্মিত হইল না, কারণ এ দৃশ্য তাহার নিকট নূতন নয়। কিন্তু সে বিরক্তিভরে বলিল, ছি ছি ছি! তোমার কি ঘেন্না-পিত্তিও নাই। কতবার তোমাকে বারণ করেছি, বল তো ?

সে কথায় খোঁড়া কানই দিল না। সে বলিল, দেখ্ দেখ, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ দেখি। জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমন করে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও ? আঃ, সে যে কি বাহারের খেলা, মাইরি!

জোবেদা বলিল, দেখে আমার কাজ নাই, তুই দেখেছিস সেই ভাল ! কিন্তু তোর খেলাও ওই শেষ করবে, তা বুঝি।

খোঁড়া তখন একটা সূঁচ লইয়া বিবির নাক ফুঁড়িতে বসিয়াছে। পায়ের আঙুল দিয়া সাপটার লেজ চাপিয়া ধরিয়াছে, আর বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়াছে মুখটা। ডান হাতে সূঁচ ধরিয়া নাক ফুঁড়িয়া মিনি পরাইয়া দিয়া সাপটাকে ছাড়িয়া দিল। যন্ত্রণায় ক্রোধে গর্জন করিয়া বিবি বারংবার খোঁড়াকে ছোবল মারিতে আরম্ভ করিল। ঝাঁপির

ডালাটা ঢালের মত সম্মুখে ধরিয়া বিবির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে সে বলিল, রাগ করিস না বিবি, রাগ করিস না। দেখ তো কেমন খুবসুরত লাগছে তোকে। দে তো জোবেদা, আয়নাটা দে তো? দেখুক একবার নিজের চেহারাখানা।

জোবেদা বলিল, লারব আমি।

দে দে, তোর পায়ে পড়ি, একবার দে। দেখি না নিজের চেহারা দেখে ও কি করে!

জোবেদা স্বামীর এ অনুনয় উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আয়না আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।

খোঁড়া বলিল, একজেরা সিঁদুর আনিস তো মেহেরবানি করে।

জোবেদা ঘর হইতেই প্রশ্ন করিল, কি, হবে কি?

পরম কৌতুক হাস্য করিয়া খোঁড়া বলিল, দেখবি, কি হবে। আগে হতে বলছি না।

জোবেদা আয়না সিঁদুর লইয়া আসিয়া ঈষদ্দূরে নামাইয়া দিল। খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটি লাল রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল।

পরে বিবিকে বলিল, দেখ্ দেখ্ বিবি, কি বাহার তোর খুলেছে দেখ দেখি! সাপটাকে ছাড়িয়া দিয়া সে আয়নাটা বিবির সম্মুখে ধরিল। তারপর বিষম-ঢাকিটা বাজাইয়া কর্কশ অনুনাসিক স্বরে গান ধরিল—

জানি না গো এমন হবে—
গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরা যাবে
ও জানি না গো—

আরো মাস কয়েক পর।

বর্ষার মাঝামাঝি একটা দুরন্ত বাদলা করিয়াছে। খোঁড়া কোথায় গিয়াছে, বাদলে দুর্যোগে ফিরিতে পারে নাই। জোবেদা অনুভব করিল, ঘরের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ উঠিতেছে—গন্ধটা ক্ষীণ, কিন্তু মিষ্ট এবং কেমন রকমের। এদিক ওদিক ঘুরিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না।

দিন দুই পরে খোঁড়া ফিরিল, জলের দেবতাকে একটা অশ্লীল গালি দিয়া বলিল, কিছু খেতে দে দেখি জোবেদা, বড়া ভুখ লেগেছে।

জোবেদা ঘরের মধ্যে একটা থালায় পান্তাভাত বাড়িয়া দিল। পায়ের কাদা ধুইয়া খোঁড়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, গন্ধ কিসের বল দেখি জোবেদা ?

জোবেদা বলিল, কে জানে বাপু, ক-দিন থেকেই ঘরে এমনই গন্ধ উঠছে।

খোঁড়া কথা কহিল না, সে শুধু ঘন ঘন শ্বাস টানিয়া গন্ধটার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল। এদিক ওদিক ঘুরিয়া বিবির ঝাঁপির কাছে দাঁড়াইল। মানুষের পদশব্দে ঝাঁপির ভিতর নাগিনীটা গর্জন করিয়া উঠিল।

খোঁড়া বলিল, হুঁ।

জোবেদা ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করিল, কি বল দেখি ?

খোঁড়া বলিল, বিবির গায়ের গন্ধ। সাপিনী তো, সাপের সঙ্গে দেখা হবার সময় হয়েছে, তাই। ওই গন্ধেই সাপ চলে আসে।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল। বলিল, কে জানে বাপু, তোদের কথা তোদেরই ভাল। নে, এখন পান্তি কটা খেয়ে ফেল।

ভাত খাইতে খাইতে খোঁড়া বলিল, ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে মাঠে। এ সময় ধরে রাখতে নাই।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কথাটা শেষ করিল।

জোবেদা পরম আশ্বাসের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সেই ভাল বাপু, ওটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। এত সাপ মরে, ওটা মরেও না তো !

ভাত খাইয়া খোঁড়া ঝাঁপি হইতে বিবিকে বাহির করিল। মুখটি চাপিয়া ধরিয়া সে আদরের কথা কহিল।

জোবেদা বলিল, এই দেখ, কদিন ওকে কামানো হয় নাই, ওর দাঁত গজিয়েছে। আর মায়াই বা কেন বাপু ? যা না, ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়।

খোঁড়া বলিল, দেখ দেখ, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ।

অপরাহ্নে খোঁড়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়া ছিল। বিবিকে পার্শ্বের জঙ্গলটায় ছাড়িয়া দিয়াছে। জোবেদা বলিল, এমন করে বসে কেন বল্ তো? গাঁজা-টাজা খা কেনে।

খোঁড়া কহিল, বিবির লেগে মন কি করছে রে!

জোবেদা হাসিয়া বলিল, মম্ মম্। তোর কথা শুনে কি হয় আমার—

না রে জোবেদা, মনটা ভারি খারাপ করছে।

জোবেদা এবার স্বামীর পাশে বসিয়া আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কেন রে, আমাকে তোর ভাল লাগে না?

সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া খোঁড়া বলিল, তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু হামার জানের চেয়ে বেশি।

জোবেদা বলিয়া উঠিল, দেখ্ দেখ্, বিবি ফিরে এসেছে। ওই দেখ—নালার মধ্যে!

জলনিকাশী নালার মধ্যে সত্যই বিবি ফণা তুলিয়া বেড়াইতেছিল।

খোঁড়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, ধরে আনি, দাঁড়া।

জোবেদা স্বামীকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না।

তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলিল, বেরো--হেট, হেট।

বাঁ হাতে করিয়া একখানা ঘুঁটে ছুঁড়িয়া সে বিবিকে মারিল। সাপটা সক্রোধে মাটির উপর কয়টা ছোবল মারিয়া ধীরে ধীরে নালা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর বোধ হয়, জোবেদা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওঠা ওঠ্, কিসে আমায় কাটলে!

খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিল, সত্যই জোবেদার বাঁ পায়ের আঙুলে এক ফোঁটা রক্ত জলবিন্দুর মত টলমল করিতেছে।

জোবেদা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, বিবি—তোর বিবি আমাকে কেটেছে, ওই দেখ্।

একটা হাঁড়িতে বেড় দিয়া নাগিনী ধীরে ধীরে চলিয়াছিল। খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাপটাকে ধরিয়া ঝাঁপিতে বন্দী করিয়া বলিল, জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।

জোবেদা কিন্তু বাঁচিল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মাথার চুল টানিতেই খসখস করিয়া উঠিয়া আসিল। ওঝারা চলিয়া গেল। বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ সকরুণ করিয়া শিয়রে খোঁড়া বসিয়া রহিল।

একজন ওস্তাদ বলিল, তুইও যেতিস খোঁড়া, খুব বেঁচে গিয়েছিস। ভারি আক্রোশ ওদের, হয়তো তোকে কামড়াতেই এসেছিল।

সাশ্রুনেত্রে খোঁড়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

খোঁড়া ফকিরি লইয়াছে। তাহার ভিটাটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। খোঁড়ার বাড়ির পাশ দিয়াই একটা পায়ে-চলা পথ ছিল, সে পথ এখন বন্ধ, সেদিক দিয়া এখন কেহ হাঁটে না। বলে, বড় সাপের ভয়। সাপগুলা বড় খারাপ সাপ—উদয়নাগ। প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সময়ে দেখা যায়, রাঙা রঙের সাপ ফণা তুলাইয়া খেলা করিতেছে।

বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।

কালাপাহাড়

সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই, বয়স্ক অবুঝ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি বিরক্তিকর। শিশু চাঁদ চাহিলে তাহাকে চাঁদের পরিবর্তে মিষ্টান্ন দিলে সে শান্ত হয়, শান্ত না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না এবং ভবির মত ভুলিতেও চায় না।

যশোদানন্দন বহু যুক্তিতর্ক দিয়াও বাপকে বুঝাইতে পারিল না। অবশেষে, যাহাকে বলে তিক্ত-বিরক্ত, তাই হইয়া সে বলিল, তবে তুমি যা মন তাই করগে যাও, দুটো হাতি কিনে আনগে।

কল্পিত হাতি দুইটা বোধ করি শুঁড় ঝাড়িয়া রংলালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল, রংলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে হুঁকা টানিতেছিল, কথাটা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর অকস্মাৎ হাতের হুঁকাটা সজোরে মাটির উপর আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, এই নে।

যশোদা অবাক হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, হাতি—হাতি। বলি, ওরে হারামজাদা, কখন আমি হাতি কিনব বলেছি?

যশোদা এ কথারও কোন জবাব দিল না, সেও রাগে ফুলিতেছিল, গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল এতক্ষণে বোধ হয় 'হাতি কেনা' কথাটার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইয়াছিল, সেও এবার শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, হাতি কেন? দুটো ছাগল কিনবি বরং, ফলাও চাষ হবে। বাঁশের ঝাড়ের মতো ধানের ঝাড় হবে, তিন হাত লম্বা শীষ! চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনই মুখ্যুই হয় কিনা! বলি, হ্যাঁ রে মুখ্যু, ভাল গোরু না হলে চাষ হয়? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদগদে মোলাম ময়দার মতো, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।

রংলাল ধরিয়াছে, এবার সে গোরু কিনিবে। এই কেনার ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধহেতু পিতা-পুত্রে কয়েক দিন হইতেই কথা কাটাকাটি চলিতেছিল। রংলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণীর। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম; বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনি অসুরের মতো—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনও অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয়, এই কারণেই গোরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ। তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর,—কাঁচা বয়স, বাহার রঙ, সুগঠিত শিঙ, সাপের মতো লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গোরু তাহার পছন্দ হয় না। আর একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গোরুর মতো গোরু যেন আর কাহারও না থাকে। গোরুর গলায় সে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিঙ দুইটিতে তেল মাখায়; সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোন দিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে, আহা, কেষ্টর জীব!

গত কয়েক বৎসর অজন্মার জন্য এবং পুত্র যশোদাকে স্কুলে পড়াইবার খরচ বহন করিতে হওয়ায় রংলালের অবস্থা ইদানীং একটু অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যশোদা এবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে আর গত বার ধানও মন্দ হয় নাই; এইজন্য এবার রংলাল ধরিয়া বসিয়াছে, ভাল গোরু তাহার চাই-ই। একজোড়া গোরু গতবার মাত্র কেনা হইয়াছে কিন্তু তাহাদের প্রতি রংলালের মমতা নাই। গোরু দুইটি ছোটও নয় এবং মন্দও কোন মতে বলা চলে না; কিন্তু এ অঞ্চলে তাহাদের চেয়ে ভাল গোরু অনেকের কাছে।

যশোদা বলিতেছে, এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি-বাকরি একটা কিছু করি; আর এবারও যদি ধান ভাল হয়, তবে কিনো এখন আসছে বছর। কিনতে গেলে দুশো টাকার কম তো হবেই না, সে টাকা তুমি এখন পাবে কোথা?

টাকা কোথা হইতে আসিবে—সে রংলাল জানে না, তবে গোরু তাহার চাই-ই। অবশেষে রংলালের জিদই বজায় থাকিল। যশোদা রাগ করিয়াই আর কোন আপত্তি করিল না। টাকাও যোগাড় হইয়া

গেল। যে গোরু-জোড়াটা তাহার ছিল সে জোড়াটা বেচিয়া হইল এক-শত টাকা, বাকি একশত টাকার সংস্থান করিয়া দিল যশোদার মা। সে রংলালকে গোপনে বলিল, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে? তুমি গোরু কিনে আন না! কিনে আনলে তো কিছু বলতে পারবে।

রংলাল খুশি হইয়া বলিল, বেশ বলেছ, তাই করি। তারপর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে?

যশোদার মা বলিল, এ গোরু দুটো বেচে দাও, আর এই নাও—এইগুলো বন্ধক দিয়ে গোরু কেনো তুমি। ভাল গোরু নইলে গোয়াল মানায়? সে আপনার গহনা কয়খানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

যাক, রংলাল টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া পাঁচুন্দি গ্রামের গোরু-মহিষের হাটে যাইবার সংকল্প করিল। বাছিয়া বাছিয়া মনের মতো দুইটি গোরু সে সংগ্রহ করিবে।

পাঁচুন্দির হাটে প্রবেশ-মুখেই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হ-হ! এ যে—। ওরে বাস রে—এ যে হাজার হাজার রে বাবা!

হাজার হাজার না হইলেও গোরু-মহিষ দুই মিলিয়া হাজারখানেক আমদানি পাঁচুন্দির হাটে হয়। আর মানুষ তেমনই অনুপাতে জুটিয়াছে। গোরু-মহিষের চীৎকারে, মানুষের কলরবে—সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। মাথার উপর সূর্য তখন মধ্যাকাশে। যেখানটায় জানোয়ার কেনা-বেচা হইতেছে সেখানে একফোঁটা ছায়া কোথাও নাই। মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। তাহারা অক্লান্তভাবে ঘুরিতেছে। রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গোরুগুলি এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে চকিত দৃষ্টি। পাইকারগুলা চীৎকার করিতেছে ফেরিওয়ালার মত—এই যায়! এই গেল! আরবী ঘোড়া!

রংলাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপনার মনের মতো সামগ্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ওদিকটায় গোলমাল উঠিতেছে প্রচণ্ডতর। কান পাতা যায় না। মনে হয়, যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। রংলাল ওই দিকটার পানেই চলিল। এ দিকটায় মহিষের বাজার। কালো কালো দুর্দান্ত জানোয়ারগুলাকে অবিরাম ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাইকারদের

দল চীৎকার করিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়া অবিশ্রান্ত পিটিতেছে আর জানোয়ারগুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছে জ্ঞানশূন্তের মতো। কতকগুলা একটা পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। নেহাত কচি বাচ্চা হইতে বুড়ো মহিষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্ত আনিয়াছে। কতকগুলার পায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়া রাঙা ঘা থকথক করিতেছে। আরও একটু দূরে আমগাছ-ঘেরা একটা পুকুরপাড়েও লোকের ভিড়। রংলাল সেখানেও কি আছে দেখিবার জন্ত চলিল। একটা পাইকার মহিষ তাড়াইয়া আনিতেছিল, সহসা তাহার আস্ফালিত লাঠিগাছটা হাত হইতে খসিয়া রংলালের কাছেই আসিয়া পড়িল। রংলালের একটু রাগ হইল, সে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইল।

পাইকারটার অবসর নাই, সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল, দাও দাও, লাঠিগাছটা দাও হে।

যদি আমার গায়ে লাগত!

তা তুমার লাগত, না হয় টুকচা রক্ত পড়ত, আর কি হত?

রংলাল অবাক হইয়া গেল, রক্ত পড়ত, আর কি হত?

দাও দাও ভাই, দিয়ে দাও। হাত ফসকে হয়ে গেইছে, দাও দাও।

রংলালকে ভাল করিয়া দেখিয়া এবার পাইকারটি বিনয় প্রকাশ করিল।

লাঠিগাছটা দিতে গিয়া রংলাল শিহরিয়া উঠিল, একি, লাঠির প্রান্তে যে স্থচের অগ্রভাগ বাহির হইয়া রহিয়াছে!

পাইকারটা হাসিয়া বলিল, উ আর দেখে কাজ নাই, দিয়ে দাও ভাই।

রংলাল বেশ করিয়া দেখিল, স্থচের অগ্রভাগই বটে—একটা নয়, দুই-তিনটা। হঠাৎ একটা শোনা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—পাইকারেরা লাঠির ডগায় স্থচ বসাইয়া রাখে, ওই স্থচের খোঁচা খাইয়া মহিষগুলা এমন জ্ঞানশূন্যেব মতো ছুটিয়া বেড়ায়। উঃ!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। পাইকারটা বলিল, কি, কিনবে কি কর্তা? মহিষ কিনবে তো লও, ভাল মহিষ দিব্য, সস্তা দিব—অ্যাই অ্যাই! বলিয়া রংলালকে দেখাইয়াই সে মহিষগুলাকে ছুটাইতে আরম্ভ করিল।

বাপ রে, বাপ রে, বলিহারি বাপ রে আমার!—মধ্যে মধ্যে আবার আদরও সে করিতেছে।

রংলাল আসিয়া উঠিল বাগানে।

চারিপাশেই মহিষের মেলা ; এগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর অযথা তাড়নার ফলে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে না। শান্তভাবে কোনোটি বসিয়া, কোনোটি দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

গোরু এ বাগানে নাই। রংলাল সেখান হইতে ফিরিল, কিন্তু একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—এ কি মহিষ, না হাতি? এত প্রকাণ্ড বিপুলকায় মহিষ রংলাল কখনও দেখে নাই। কয়জন লোকও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বলিতেছিল, এ মোষ কে লেবে বাবা?

পাইকারটা বলিল, এক লেবে ভাই রাজায় জমিদারে, আর লেবে যার লক্ষ্মী নাই সেই। ঘুরছি তো পাঁচ-সাত হাট ; আবার কোথাও যাব।

অন্য একজন বলিল, এ মোষ গেরস্ততে নিয়ে কি করবে? এর হালের মুঠো ধরবে কে? তার জন্য এখন লোক খোঁজ।

পাইকার বলিল, আরে ভাই, বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করছে, আর এ তো মোষ। লাঙল বড় করলেই জানোয়ার জব্দ। এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।

রংলাল তীক্ষ্ণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মহিষ-জোড়াটার দিকে চাহিয়া ছিল—বলিহারি, বলিহারি! দেহের অনুপাতে পাগুলি খাটো, আবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ মণ ওজন তো স্বচ্ছন্দে ওই খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিয়া লইবে। কি কালো রঙ! নিকষের মতো কালো। শিঙ দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু!

কিন্তু দামে কি সে পারিবে? আচ্ছা, দেখাই যাক, হাট ভাঙিয়া শেষ লোকটি পর্যন্ত চলিয়া যাক, তখন দেখা যাইবে। পাইকারটাও তো বলিল পাঁচ-সাতটা হাটে কেহ খরিদ্দার জুটে নাই। কথা তো শুধু টাকারই নয়, সকলেরই চেয়ে বড় কথা ওই জানোয়ার দুইটির বিপুল উদর।

রংলাল ওই মহিষ দুইটাই কিনিয়া ফেলিল, কিছুতেই সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। ওই টাকাতেই তাহার হইল ; পাইকারটাও কয়েকটা হাট ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলি টাকা তাহার এতদিন আবদ্ধ হইয়া আছে। সে যখন দেখিল, সত্যই রংলালের আর

সম্বল নাই, তখন এক শত আটানব্বই টাকাতেই মহিষ দুইটি রংলালকে দিয়া দিল। রংলালের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কল্পনানেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস বিস্ফারিত দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু যত সে বাড়ির নিকটবর্তী হইল, ততই তাহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া অবসাদ প্রবল হইয়া উঠিল। লেখাপড়াজানা ছেলেকে তাহার বড় ভয়। তাহার কথাবার্তার জবাব দিতে রংলালকে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তাছাড়া, এত বড় দুইটা জানোয়ারের উদর পূর্ণ করা তো সহজ নয়! এক-একটাতেই দৈনিক এক পণেরও বেশি খড় নস্তের মতো উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

গিন্নী—যশোদার মা—কি বলিবে? মহিষের নাম শুনিলে জ্বলিয়া যায়। রংলাল মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক এক সময় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয়? ঘরই বা কাহার? সম্পত্তির মালিকই বা কে? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে? চাষ কেমন হইবে, সে কথা কেহ জানে? রংলালের মনে হইল, মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা-সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু এ ভাবটুকুও তাহার স্থায়ী হয় না, সে আবার ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া স্তিমিত হইয়া পড়ে। মনে মনে সে তাহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য তোশামোদ-বাক্য রচনা আরম্ভ করিল।

বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, হাতিই এক জোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।

যশোদা মনে করিল, বাবা বোধ হয় প্রকাণ্ড উঁচু এক জোড়া বলদ কিনিয়াছে। সে বলিল, বেশি বড় গোরু ভাল নয় বাপু। বেশ শক্ত গিঁট গিঁট গড়ন হবে, উচুতে খুব বড় না হয়—সেই তো ভাল।

একমুখ হাসিয়া রংলাল বলিল, গোরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনলাম।

যশোদা সবিস্ময়ে বলিল, মোষ?

হ্যাঁ।

যশোদার মাও বলিল, মোষ কিনলে তুমি ?

হ্যাঁ।

আর এমন করে হেসো না বাপু তুমি, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে যশোদার মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

আহা-হা, আগে তাই চোখেই একবার দেখ, দেখেই যা হয় ব লাও লাও, জলের ঘটি লাও, হলুদ লাও—চল, দুগ্‌গা বলে। ঢুকাও তো।

দেখিয়া শুনিয়া যশোদার মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল, সে বলিল, নাও, এইবার চালের খড় কগাছাও টেনে নিয়ে দিও শেষে। ও কি সোজা পেট! এক-একটির কুম্ভকর্ণের মত খোরাক চাই। ঘুগিও কোথা হতে যোগাবে!

যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটাকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ঙ্কর তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গীতে সকলকে চাহিয়া দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।

রংলাল বলিল, দাও, পায়ে জল দাও।

বাবা রে। ওদের কাছে আমি যেতে পারব না।

না না না। এস তুমি, কাছে এস, কোন ভয় নাই, চলে এস তুমি। ভারি ঠাণ্ডা।

যশোদার মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে। মহিষ দুইটি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কিছু বোধ করি বলিতে চাহে। রংলাল বলিল, অ্যাই, খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে —বাড়ির গিন্নী, চিনে রাখ্।

তবুও যশোদার মা সরিয়া আসিয়া বলিল, না বাপু, এই তেল সিঁদুর হলুদ তুমি দিয়ে দাও, ও আমি পারব না। যে কালাপাহাড়ের মতো চেহারা!

রংলাল বলিয়া উঠিল, বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক কালাপাহাড়।—এইটা, এইটাই বেশি মোটা, এইটাই হল কালাপাহাড়। আর এইটার কি নাম হবে বল দেখি ?

একটু চিন্তা করিয়াই সে আবার বলিল, আর এইটার নাম কুম্ভকর্ণ—যশোদা বলেছে। বেশ বলেছে!

যশোদার মাও খুশি হইয়া উঠিল, কিন্তু যশোদা খুশি হইল না।

রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল, গোমড়া মুখ আমি দেখতে লারি।—সে গুরুই হোক আর গোঁসাই হোক।

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকর্ণকে তাড়া দিতে দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে বেলা তিনটায়। শুধু যে এটা খড় বাঁচাইবার জন্যই সে করে, তাহা নয়; এটা তাহাকে নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছে। বাড়ির সমস্ত লোক ইহার জন্য বিরক্ত, এমনকি, যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রংলাল হাসিয়া বলে, এবার খড় কত টাকার বেচি তা দেখো। খড় বেচেই এবার একখানা গয়না তোমার হবে।

যশোদার মা বলে, গয়নার জন্যে আমার ঘুম হয় না, না, তোমাকে দিনরাত ছেঁকা দিই, বল তো তুমি?

যশোদা বলে, যাবে কোন্ দিন সাপের কামড়ে কিংবা বাঘের পেটে।

সত্য কথা, নদীর ধারে সাপের উপদ্রব খুব এবং বাঘও মাঝে মাঝে দুই-একটা ছটকাইয়া আসিয়া পড়ে। রংলাল সে-সব গ্রাহ্যই করে না, সে নদীর ধারে গিয়া একটা গাছতলায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। মহিষ দুইটা ঘাস খাইয়া বেড়ায়। উহারা দূরে গিয়া পড়িলে সে মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে, আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের ডাক! দূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া মুখ উঁচু করিয়া শোনে, তারপর উহারাও ওই আঁ—আঁ শব্দে সাড়া দিতে দিতে দ্রুতবেগে হেলিয়া-দুলিয়া চলিয়া আসে; কখনও কখনও বা ছুটিতে আরম্ভ করে। রংলালের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়ায়, যেন প্রশ্ন করে—ডাকিতেছ কেন?

রংলাল দুইটার গালেই দুই হাতে একটা করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া বলে, পেটে তোদের আগুন লাগুক। খেতে খেতে কি বেলাত চলে যাবি নাকি? এই কাছে-পিঠে চরে খা।

মহিষ দুইটা আর যায় না, তাহারা সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া চোখ

বুজিয়া রোমন্থন করে। কখনও বা নদীর জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া বসিয়া থাকে ; রংলাল ডাকিলে জলসিক্ত গায়ে উঠিয়া আসে।

মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুইধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে ; রংলাল হাসে।

মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিয়া উঠে। এক-একদিন তাহাদের মধ্যে কি মনান্তর যে ঘটে,—উহারা দুইটা যুধ্যমান অসুরের মতো সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নিচু করিয়া আপন আপন শিঙ উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এক রংলাল ছাড়া সে সময় আর কেহ তাহাদের মধ্যে যাইতে সাহস করে না। রংলাল প্রকাণ্ড একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে নির্ভয়ে উহাদের মধ্যে পড়িয়া দুর্দান্তভাবে দুইটাকে পিটিতে আরম্ভ করে। প্রহারের ভয়ে দুইটাই সরিয়া দাঁড়ায়। রংলাল সেদিন দুইটাকেই সাজা দেয়, পৃথক গোয়ালে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখে ; তারপর পৃথক ভাবেই তাহাদের স্নান করাইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তবে এক সঙ্গে মিলিতে দেয় ; সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও দেয়, ছিঃ, ঝগড়া করতে নাই। একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকবি—তবে তো !

যাক। বৎসর তিনেক পরে অকস্মাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। গ্রীষ্মের সময় রংলাল নদীর ধারে বেশ কুঞ্জবনের মতো গুল্মাচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অদূরেই ঘাস খাইতেছে। অকস্মাৎ একটা বিজাতীয় ফ্যাঁসফ্যাস শব্দে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়াই রংলালের রক্ত হিম হইয়া গেল। নিবিড় গুল্মবনটায় প্রবেশ-পথের মুখেই একটা চিতাবাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। হিংস্র লোলুপতায় দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ফ্যাঁসফ্যাস শব্দ করিয়া বোধ হয়

আক্রমণের সূচনা করিতেছে। রংলাল ভীরু নয়; সে পূর্বে পূর্বে কয়েকবার চিতাবাঘ শিকারে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রংলাল বেশ বুঝিতে পারিল—সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথের জন্যই বাঘটা ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেছে। নতুবা ঘুমন্ত অবস্থাতেই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। সে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া বিপরীত দিকে পিছাইয়া গিয়া কুঞ্জবনটার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করিয়া আরম্ভ করিল, আঁ—আঁ—আঁ!

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর আসিল, আঁ—আঁ—আঁ!

বাঘটা চকিত হইয়া কুঞ্জবনটার মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দন্ত বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রংলাল দেখিল, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের সে এক অদ্ভুত মূর্তি! তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনও দেখে নাই। তাহারা ক্রমশ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল—বাঘটার এক দিকে কালাপাহাড়, অন্যদিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধ হয় অসহিষ্ণু হইয়াই অকস্মাৎ একটা লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পর-মুহূর্তেই কালাপাহাড় তাহার উদ্যত শিঙ লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কালাপাহাড়ের শৃঙ্গাঘাতে বাঘটা কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মতো বাঘটার উপর নতমস্তকে উদ্যত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিঙ দুইটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিঙ বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণযন্ত্রণা-কাতর বাঘটাও নিদারুণ আক্রোশে তাহার ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল। রংলাল তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মতো চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধ্যমান দুইটা জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

বাঘটার প্রাণ তখনও থাকিলেও অত্যন্ত ক্ষীণ শরীরে শুধু দুই-একটা অতি ক্ষীণ আক্ষেপমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রংলালের দিকে। চোখ হইতে দরদর-ধারে জল গড়াইতেছে।

রংলাল বালকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ—আঁ করিয়া চীৎকার করে আর কাঁদে।

রংলাল বলিল, জোড় নইলে ও থাকতে পারছে না। জোড় একটা এই হাটেই কিনতে হবে।

পর হাটেই সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া চড়া দামে কালাপাহাড়ের জোড় কিনিয়া ফেলিল। টাকা লাগিল অনেক। একটারই দাম দিতে হইল—দেড় শত টাকা। কিন্তু তবুও কালাপাহাড়ের যোগ্য সাথী হইল না। তবে এটার বয়স এখনও কাঁচা, এখনও বাড়িবে! ভবিষ্যতে দুই এক বৎসরের মধ্যেই কালাপাহাড়ের সমকক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই তো সবে চারখানি দাঁত উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শিঙ বাঁকাইয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রংলাল তাড়াতাড়ি কালাপাহাড়কে শিকলে আবদ্ধ করিয়া দূরে বাঁধিয়া বলিল, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ওকে? না, ওসব হবে না। মারলে হাড় ভেঙে দোব তোমার তা হলে, হ্যাঁ।

নূতনটাকেও বাঁধিয়া জাব দিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, কালাপাহাড় তো ক্ষেপে উঠেছে একে দেখে। সে রাগ কত!

যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব! কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

রংলালও হাসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে!

মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু।

তা বটে! রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠ ওঠ, চল, জল তেল সিঁদুর হলুদ নিয়ে চল।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়ল মশায়, শিগগির এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে!

সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে?

রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উপুড়ে ফেলাচ্ছে মশায়! আর যে গাঙারছে। এতক্ষণ হয়তো মেরেই ফেলালে!

রংলাল আসিয়া দেখিল, রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটিটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নূতন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নূতনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে।

রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া উঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তাহার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মশায়! কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে, কোন্ দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে।

রংলাল বলিল, যাঃ, ফাঁসফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই, চল্ দেখি—দেখি!

রংলাল কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তচক্ষু লইয়া রংলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালাপাহাড় তাহার মুখটা রংলালের কোলে তুলিয়া দিল। রংলাল পরম স্নেহে তাহার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু রংলাল তো অহরহ কালাপাহাড়ের কাছে থাকিতে পারে না যে, তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবে! অন্য কেহ গেলেই কালাপাহাড় অশান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া চীৎকার আরম্ভ করে—আঁা—আঁা—আঁা!

সে উর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়িয়া সে ডাকিতে ডাকিতে ওই নদীর ধারের দিকে চলিয়া যায়। রংলাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইতে গেলেই সে রুখিয়া দাঁড়ায়।

সেদিন আবার একটা গোরুর বাছুরকে সে মারিয়া ফেলিল। এই বাছুরটির সহিত উহাদের বেশ একটি মিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কুম্ভকর্ণ ও কালা-পাহাড় যখন পূর্ণ উদরে রোমন্থন করিত, তখন সে আসিয়া তাহাদের ডাবা হইতে জাব খাইয়া যাইত। নিতান্ত অল্প বয়সে বহু দিন অবুঝের মত সে তাহাদের পেটের তলায় মাতৃস্তন্যের সন্ধান করিত। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের মেজাজ ভাল ছিল না, বাছুরটা ডাবায় জাব খাইবার জন্য আসিয়া তাহার মুখের সম্মুখ দিয়াই মুখ বাড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড ক্রোধে শিঙ দিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

যশোদা আর রংলালের অপেক্ষা করিল না। সে পাইকার ডাকিয়া কালাপাহাড়কে বিক্রয় করিয়া দিল। নিতান্ত অল্প দামেই বেচিতে হইল।

পাইকারটা বলিল, ষাট টাকাই হয়তো আমার লোকসান হবে। এ গরম মোষ কি কেউ নেবে মশায়?

যশোদা অনেক কথা-কাটাকাটি করিয়া আর পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়াইতে সক্ষম হইল। পাইকারটা কালাপাহাড়কে লইয়া চলিয়া গেল।

রংলাল নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আঁ—আঁ—আঁ!

রংলাল তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আঁ—আঁ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো কালাপাহাড়! কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে। রংলাল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিল!

পাইকারটা আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দেন মশায়। এ মোষ আমি নেব না! বাপ রে, বাপ রে! আমার জান মেরে ফেলাত মশায়!

জানা গেল, খানিকটা পথ কালাপাহাড় বেশ গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই সে এমন খুঁট লইয়া দাঁড়াইল যে, কাহার সাধ্য উহাকে এক পা নড়ায়!

পাইকারটা বলিল, লাঠি যদি তুললাম মশায়—ওরে বাপ রে, সে ওর চাউনি কি! তারপর এমন তাড়া আমাকে দিলেক, আমি আধ কোশ ছুটে পালাই, তবে রক্ষে। তখন উ আপনার ফিরল, একেবারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে এল। আমার টাকা ফিরে দেন মশায়।

সে আপনার টাকা ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যশোদা বলিল, এক কাজ কর তবে, হাটে যাও বরং।

রংলাল বলিল, আমি পারব না।

আর কে নিয়ে যেতে পারবে, তুমি না গেলে?

অগত্যা রংলালই লইয়া গেল। পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।

কিন্তু ফিরিল সে হাসিতে হাসিতে। কালাপাহাড়কে কেহ কেনে নাই। ওই পাইকারটা সেখানে এমন দুর্নাম রটাইয়াছে যে, কেহ তাহার কাছ দিয়াও আসে নাই।

যশোদা বলিল, তবে শহরের হাটে যাও। এদিককার পাইকার ও-হাটে বড় যায় না।

রংলালকে যাইতে হয়। যশোদা লেখাপড়া-জানা, রোজগেরে ছেলে, সে এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন রংলাল করিতে পারে না। আর কালাপাহাড়কে রাখিবার কথা যে সে জোর করিয়া বলিতেও পারে না। অনেক ক্ষতিই যে হইয়া গেল। মহিষটার দাম দেড় শত

টাকা, তারপর গোহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের খরচ সাত-আট টাকা।] এই এক মাস চাষ বন্ধ হইয়া আছে, সে ক্ষতির মূল্য হিসাব-নিকাশের বাহিরে। হাটে একজন পাইকার কালাপাহাড়কে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কিনিল, এক বড় জমিদারের এমনই মহিষের বরাত আছে। দামও সে ভালই দিল—একশো পাঁচ টাকা।

রংলাল বলিল, এই দেখ ভাই, মোষটা আমার ভারি গা-ঘেঁষা। এখন এইখানে যেমন বাঁধা আছে থাক্, আমি চলে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেও। নইলে হয়তো চেঁচাবে, দুষ্টুমি করবে।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। পাইকারটা হাসিয়া বলিল, তা বেশ, থাকুক এইখানেই। তুমি যাও।

রংলাল তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে শহরের স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। হাঁটিয়া ফিরিবার মত শক্তি তাহার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরই পাইকার কালাপাহাড়ের দড়ি ধরিয়া টান দিল। কালাপাহাড় তাহার দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে রংলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই—সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল্ চল্।

কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।

পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মত চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।

কই, সে কই? নাই, সে তো নাই!

কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।

এই পথ—এই পথ দিয়া তাহারা আসিয়াছে। ঊর্ধ্বমুখে সে ছুটিতেছিল আর প্রাণপণে ডাকিতেছিল, আঁ—আঁ—আঁ!

পাইকারটা কয়েকজনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকেই শিঙ দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া উন্মত্তের মত ছুটিল।

কিন্তু এ কি! এসব যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

শহরের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান, এত জনতা। ওটা কি?

একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছিল। কালাপাহাড় ভয়ে একটা পাশের রাস্তা দিয়া ছুটিল।

রাস্তার লোকজন হৈ-হৈ করিতেছিল, কার মোষ? কার মোষ?

ও কি অদ্ভুত আকার—বিকট শব্দ!

একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রংলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একেবারে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া দিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।

লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়ে ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে, আর রংলালকে ডাকিতেছে, আঁ—আঁ—আঁ! কিন্তু এ কি! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে? কোথায়, কত দূরে তাহার বাড়ি?

আবার সেই বিকট শব্দ! সেই অপরিচিত জানোয়ার! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।

মোটরখানাও তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে—পুলিস সাহেবের মোটর। পাগলা মহিষের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব রিভল্‌বারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কন্‌স্টেব্‌লকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোমলোগকে বোলাও!

তাসের ঘর

অমর শখ করিয়া চায়ের বাসনের সেট কিনিয়াছিল। ছয়টা পিরিচ পেয়ালা চাদানি ইত্যাদি রঙ-চঙ-করা সুদৃশ্য জিনিস, দামও নিতান্ত অল্প নয়—চার টাকা। চার টাকা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অনেক।

অমরের মায়ের হুকুম ছিল, সেটটি যত্ন করে তুলে রেখো বউমা, কুটুম্বসজ্জন এলে, ভদ্রলোকজন এলে বের কোরো।

কলিকাতা-প্রবাসী হরেন্দ্রবাবুরা দেশে আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বাড়ির মেয়েরা অমরদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিবেন; তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে বাড়িতে বেশ সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন, চায়ের সেটটা আজ বের কর্ তো গৌরী।

গৌরী বাড়ির মেয়ে—অমরের অবিবাহিতা ভগ্নী। মা চাবির গোছাটা গৌরীর হাতে দিলেন। গৌরী বাসনের ঘর খুলিয়া জার্মান-সিলভারের ট্রে-সমেত সেইটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, পাঁচটা কাপ রয়েছে কেন মা, আর একটা কাপ কি হল? এই দেখ বাপু, সবে এই আমি বের করে আনছি, আমার দোষ নিও না যেন।

বিরক্ত হইয়া মা বলিলেন, দেখ্ না ভাল করে খুঁজে, ঘরেই কোথাও আছে। পাখা হয়ে উড়ে তো যাবে না।

গৌরী সেটটা সেইখানে নামাইয়া আবার ভাল করিয়া ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, পাখাই হল, না কেউ খেয়েই ফেলল—সে আমি জানি না বাপু, তবে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দুমদাম করিয়া মা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, তোমার দোষ কি মা, আমার কপালের দোষ। তোমরা চোখ কপালের উপর তুলে কাজ কর, নীচের জিনিস দেখতে পাও না।

গৌরীর চোখ হয়তো কপালের উপরেই উঠিয়া থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌরীর অপরাধ প্রমাণিত হইল না।—পেয়ালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মা হাঁকিলেন, বউমা, বউমা!

বউমা—অমরের স্ত্রী শৈল—উপরে তখন ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া অতিথিদের বসিবার স্থান করিতেছিল, সে নীচে আসিয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় ডাকলেন?

শাশুড়ী বাসন-অন্ত-প্রাণ, সিন্দুকের চাবি পুত্রদের দিয়া বাসনের ঘরের চাবি লইয়াই বাঁচিয়া আছেন। পেয়ালাটার খোঁজ না পাইয়া ফুটন্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মত সশব্দে জ্বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁ গো রাজার কন্যে, নইলে 'বউমা' বলে ডাকা কি ওই বাউরীদের, না, ডোমেদের?

শৈল নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর করা তার অভ্যাস নয়।

শাশুড়ী বলিলেন, একটা পেয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, কি হল?

একটু নীরব থাকিয়া বধূ বলিল, ও আমিই ভেঙে ফেলেছি মা।

শাশুড়ী কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বেশ করেছ মা, কি আর বলব বল!

সত্য কথা, এমন অকপট ভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে অপরাধীকে মার্জনা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া নিয়া শাশুড়ী বলিলেন, পাঁচটাকেও ফেলে দেব আমি চুরমার করে ভেঙে।

রাগ গিয়া পড়িল চায়ের সেটটার উপর।

শৈল সবই নীরবে সহ্য করে, সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, ভেঙেছ বলা হল, বেশ হল, আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, ওপরের কাজ সেরে এস, জলখাবারগুলো করতে হবে।

শৈল উপরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে হাসিমুখে আসিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ীর মনের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছিল, বলিলেন, নাও, তোমাদের দেশের মত খাবার তৈরি কর।

শৈল খাবারের সাজ-সরঞ্জাম টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, সমস্তর ভেতরই মাছের পুর দোব তো মা?

অ্যাঁ, মাছের পুর? হ্যাঁ, তা দেবে বইকি, বিধবা তো কেউ আসছে না।

ময়দার ঠোঙার ভিতরে মাছের পুর দিতে দিতে শৈল বলিল, জানেন মা, এর সঙ্গে যদি একটুখানি হিঙ দেওয়া হত—ভারি চমৎকার হত। বাবার আমার হিঙ ভিন্ন কোন জিনিস ভাল লাগে না। আর যে-সে হিঙ আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না; আফগানিস্থান থেকে কাবুলী সব আসে, তারাই দিয়ে যায়।

শাশুড়ী বলিলেন, পশ্চিম ভাল জায়গা মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে কি তুলনা হয়, না, সে সব জিনিস পাওয়া যায়?

শৈল বলিল, পশ্চিমের সে হিঙ পাওয়া যায় না মা। কাবুলীরা সে সব নিজেদের জন্য আনে, শুধু বাবাকে খুব খাতির করে কিনা, টাকাকড়ি অনেক সময় নেয়—তাই সে জিনিস দেয়। শুধু কি হিঙ, যখন আসবে তখন প্রত্যেকে আঙুর, বেদানা, নাশপাতি, বাদাম, হিঙ— এ সব ছোট ছোট ঝুড়ির এক-এক ঝুড়ি দিয়ে যায়। পাঁচজনের মিলে সে হয় কত! কাঁচা জিনিস অনেক পচেই যায়।

ও-ঘরের বারান্দা হইতে ননদ গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, এই আরম্ভ হল এইবার।

অর্থাৎ বাপের বাড়ির গল্প আরম্ভ হইল। সত্য কথা, শৈলর ওই এক দোষ; বিনীত, নম্র, মিষ্টমুখী, সুন্দরী বউটি প্রত্যেক কথায় তাহার বাপের বাড়ির তুলনা না দিয়া থাকিবে না।

পাশের বাড়িতে তুমুল কোলাহল উঠিতেছিল, শাশুড়ী এবং বধূতে কলহ বাধিয়াছে।

শৈলর শাশুড়ী বলিলেন, যা হবে, তাই হোক মা। আমার বউ ভাল হয়েছে, উত্তর করতে জানে না; দোষ করলে বকব কি, মুখের দিকে চাইলে মায়া হয়।

শৈল বলিল, ওঁর ছেলে স্ত্রীকে শাসন করেন না কেন? জানেন মা, আমার দাদা হলে আর রক্ষে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বউকে হয়তো বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার বউদি কি উত্তর করেছিলেন মায়ের সঙ্গে, দাদা তিন মাস বউদির সঙ্গে কথা কন নি। শেষে মা আবার বলে কয়ে কথা বলান। তবে দাদার আমার বড্ড বাতিক— খদ্দর পরবে হাঁটু পর্যন্ত, জামা সেই হাত-কাটা—এতটুকু। তামাক না, বিড়ি না, সিগারেট না,—সে এক বাতিকের মানুষ!

শাশুড়ী বোধ হয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, নাও নাও, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নাও; দেখো, যেন মাছের কাঁটা না থাকে।

শৈল বলিল, ছোট মাছ—কাঁটা বাছতেই হাত চলছে না মা; তবে এই হয়ে গেল।

কড়ায় এক ঝাঁক সিঙ্গাড়া ছাড়িয়া দিয়া, সে আবার বলিল, মা আমার কক্ষনো ছোট মাছ বাড়িতে ঢুকতে দেন না। দু সেরের কম মাছ হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেবেন। কুচো-মাছের মধ্যে ময়া, আর কাঠ-মাছের মধ্যে মাগুর।

শাশুড়ী বাধা দিয়া বলিলেন, নাও নাও; সেরে নিয়ে চুল-টুল বেঁধে ফেলগে।

কেশপ্রসাধন-অন্তে শৈল কাপড় ছাড়িতেছিল।

ননদ গৌরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, উঃ, রঙ বটে তোমার বউদি! তুমি যা পরবে, তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগবে, আর আমাদের দেখ না, যেন কাঠ পুড়িয়ে—

শৈল বলিল, এ যে দেবার নয় ভাই, নইলে তোমাকেও দিতাম। আমার আর কি রঙ দেখছ! বাবা মা দাদা আমার অন্য বোনদের যদি দেখতে তবে দেখতে রঙ কাকে বলে; ঠিক একেবারে গোলাপফুল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি বউদি, তোমার চেয়েও ফরসা রঙ?

হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মধ্যে আমিই কালো।

শাশুড়ী আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, আর কত দেরি বউমা, ওঁরা যে সব এসে গেছেন।

শৈল তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, এই যে মা হয়ে গেছে আমার।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের মহার্ঘ উজ্জ্বল সজ্জা ভূষণ রূপ সমস্তকে লজ্জা দিয়া শৈল আবির্ভূতা হইল—নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মত।

প্রবাসিনীর দল মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, শৈল হাসিমুখে প্রণাম করিল।

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, এ যে চাঁদের মত বউ হয়েছে তোমার দিদি। লেখাপড়া-টড়াও জানে নাকি?

শৈল মৃদুস্বরে বলিল, স্কুলে তো পড়ি নি, বাবা স্কুলের শিক্ষা বড় পছন্দ করেন না। বাড়িতে পড়েছি, ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড শেষ হয়েছিল, তারপরই—

কথাটা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে সমাপ্ত হইয়া গেল।

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, কে জানে মা, আজকাল কি যে হাল হল দেশের, মেয়েদের আর কলেজে না পড়লে বিয়ে হচ্ছে না। আমার বউরা তো কলেজে পড়েছিল সব; বিয়ের পর আমি সব ছাড়িয়ে দিলাম।

শৈল উত্তর দিল, কলেজের কোর্স আমিও কিছু পড়েছি। তবে আমার বোনেরা সব ভাল করে পড়েছে; বাড়িতে দাদাই পড়ান, পড়া-শোনায় দাদার ভয়ানক বাতিক কিনা, জানেন—বছরে পাঁচ-সাতশো টাকার বই কেনেন—বাংলা, ইংরিজী! বিলেত থেকে ইংরিজী বই আনাবেন। কাজকর্ম যদি করতে বললেন মা,—কাজকর্ম অবিশ্যি বাবারই বিজনেস আছে—সেই বিজনেস দেখতে বলেন তো বলবেন, সম্মুখে জ্ঞানসমুদ্র মা, চোখ ফেরাবার আমার অবকাশ নাই।

কোথায় তোমার বাপের বাড়ি?

এলাহাবাদ। এলাহাবাদ গেছেন নিশ্চয়ই, আমাদের সেখানে তিন পুরুষ বাস হয়ে গেল। বাবা সেখানে কনট্রাক্টরি করেন।

কি রকম পান-টান?

আমি তো ঠিক জানি না; তবে মেজো ভাই বলেন মাঝে মাঝে, এরকম করে আর চলবে না মা, তুমি বাবাকে বল। পাকা বাড়িগুলো ভাড়া দিয়ে নিজে সেই খোলার বাড়িতে থাকবেন, টোঙায় চড়ে কাজ দেখে বেড়াবেন, মোটর কিনবেন না, এ করে চলবে না। বাবা বলেন, এ আমার পৈতৃক বাড়ি, যেমন আছে তেমনই থাকবে, ভাঙবও না, অন্য কোথাও যাবও না। আর গাড়ি, গাড়িও আমি কিনব না, ছেলেরা বিলাসী হবে। আমি রোজগার করছি, তারা যদি না পারে! জানেন, লোকে বলে—মহেন্দ্রবাবু এক হিসাবে সন্ন্যাসী!

শৈল কথা শেষ করিয়া মৃদু মৃদু হাসি হাসে।

প্রবাসিনী গিন্নী একবার শৈলর শাশুড়ীকে বলিলেন, তা হলে ছেলের তোমার বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে দিদি। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর। তত্ত্ব-তল্লাস করেন কেমন বেয়াইরা ?

বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষের মন, কোন্ কথায় কে যে আঘাত পায়, সে বোঝা, বোধ করি, বিধাতারও সাধ্য নয়। তোমাদের চেয়ে বড় ঘর—এই কথাটুকুতেই অমরের মা আহত হইয়া উঠিলেন, তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কে জানে দিদি, বড়, না ছোট, সে জানি না। তবে বউমাই বলেন, বাপেদের এই বাপেদের ওই, কিন্তু তত্ত্ব-তল্লাসও দেখি না, আজ দু'বছর ওই দুধের মেয়ে এসেছে, নিয়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত নেই।

শৈল মুহূর্তে বলিয়া উঠিল, জানেন তো মা, বাবার আমার অদ্ভুত ধরন! তিনি বলেন, যে বস্তু আমি দান করলাম, সে আবার আমি কেন আমার বলে ঘরে আনব! তবে যাকে দান করলাম সে যদি স্বেচ্ছায় নিয়ে আসে, তখন তাদের আদর করব, সম্মান করব, আমার বলব। আর তত্ত্ব-তল্লাস এত দূর থেকে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, কিন্তু টাকা তো চাইলেই দেন তিনি, যখন চাইবেন তখনই দেবেন।

শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, কি বললে বউমা, তোমার বাবা আমাদের টাকা দেন—কখন, কোন্ কালে ?

শৈল বলিল, আপনাদের কথা তো বলি নি মা, আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন, একশো পঞ্চাশ আশী—চাইলেই তিনি দেন, কেন দেবেন না ?

শাশুড়ীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। শুধু স্বগ্রামবাসী নয়, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রবাসিনী—দেশ-দেশান্তরে এ সংবাদ রটিয়া যাইবে। অমরের মায়ের মাথা যেন কাটা গেল।

তিনি বলিলেন, ভাল, অমর আসুক, আমি জিজ্ঞাসা করব। কই ঘুণাক্ষরেও তো আমি জানি না!

ও বাড়ির গিন্নী বলিলেন, তোমায় হয়তো বলে নি অমর। দরকার হয়েছে, শ্বশুরের কাছে নিয়েছে।

অমরের মা বলিলেন, সে নেবে কেন ভাই ? সে নেওয়া যে তার অন্যায়—নীচ কাজ। ছিঃ, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা, ছিঃ !

অমর কাজ করে কলিকাতায়, সেখানে সে অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসা হইলেও ক্ষুদ্র তাহার আয়তন, সঙ্কীর্ণ তাহার পরিধি, তবুও সে স্বাধীন ; তাই মাসে তুইবার করিয়া বাড়ি সে আসিয়া থাকে। অমরের মা রোষকষায়িত নেত্রে পুত্রের আগমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের সম্মুখে যে অপমান তাঁহার হইয়াছে, সে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। শুধু তাঁহার সংসারের অসচ্ছলতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইয়াছে। এ কয়দিন বধুর সঙ্গেও একরূপ বাক্যালাপও করেন নাই। শৈল অবশ্য সে বিষয়ে দোষী নয়, সে সদাসর্বদাই মুখে হাসিটি মাখিয়া শাশুড়ীর আজ্ঞার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সংসারের নিয়ম—কাল অগ্নির উত্তাপও হরিয়া থাকে, মনের আগুনও নিভিয়া আসে। কিন্তু শৈলর তুর্ভাগ্য, শাশুড়ীর মনের আগুন-শিখা হ্রস্ব হইতে না হইতে ইন্ধনের প্রয়োগে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পাড়ায় ঘরে ঘাটে এই লইয়া যে কানাকানি চলিতেছিল, সেটা ভালভাবেই ক্রমশ জানাজানি হইয়া গেল।

সেদিন সরকারদের মজলিসে একদফা প্রকাশ্য আলোচনার সংবাদ অমরের মা স্বকর্ণেই শুনিয়া আসিলেন।

দিন দশেক পরেই কিসের একটা ছুটি উপলক্ষ্যে অমর বাড়ি আসিবার কথা জানাইয়া দিল। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কথাটা মিথ্যা, বার বার সঙ্কল্প করিয়াও সে এ বিষয়ে স্বামীকে কোন কথা লিখিতে পারে নাই—কোন অনুরোধ জানাইতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইয়াছে। তাহার হাত চলে নাই, ঠোঁট কাঁপিয়াছে, চোখে জলও দেখা দিয়াছে ; সে চিঠির কাগজখানা জড়ো করিয়া মুড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। শৈল আপনার শয়নকক্ষে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় স্বামীর জন্য বসিয়া রহিল, অমর আসিলেই সে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িবে।

অকস্মাৎ অমরের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল, অন্ধকারের আবরণের মধ্যে চোরের মত নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সে আশ্বস্ত হইল।

ক্রোধের প্রসঙ্গ তাহাকে লইয়া নয়, অমর বচসা জুড়িয়া দিয়াছে কুলীর সহিত।

এই আধ মাইল—মালের ওজন আধ মণ পঁচিশ সের, তোকে দু আনা দিলাম—আবার কত দোব?

লোকটাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিতেছিল, তখন আপনি চুকিয়ে নেন নাই কেন মশায়? তখন যে একেবারে হুকুম ঝাড়লেন—এই, ইধার আও। আমাদের রেট তিন আনা করে গ্যান, দিতে হবে।

নিকালো বেটা হারামজাদা, নিকালো বলছি—এই নে পয়সা, কিন্তু এখুনি নিকালো সামনে থেকে বলছি।

পয়সা ফেলিয়া দিয়া অমর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাড়ি ঢুকিল।

দেখ না, লোকসান যেদিন হয়, সেদিন এমনি করেই হয়। পঞ্চাশটা টাকা একজন মেরে দিয়ে পালাল, তারপর ট্রেন ফেল, আবার বাড়ি এসেও চারটে পয়সা লোকসান।

মাও বোধ করি প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শান্ত অথচ শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, তার জন্যে তোমার চিন্তা কি বাবা? বড়লোক শ্বশুর রয়েছেন, তাঁকে লেখ তিনিই পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ না বুঝলেও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যশর আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে?

মা বলিলেন, সেই জন্যই তো তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা। আমি শুনব—তুমি আমাকে তোমার রোজগারের অন্ন খাওয়াও, না, তোমার শ্বশুরের দানের অন্নে আমাকে পিণ্ডি দাও? তুমি নাকি তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাও, আর শ্বশুর তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেন—একশো পঞ্চাশ আশী, যখন যেমন তোমার দরকার হয়?

ক্লান্ত তিক্তচিত্ত অমরের মস্তিষ্কে মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, কে কোন্ হারামজাদা হারামজাদী সে কথা বলে?

মা ডাকিলেন, বউমা!

শৈলর চক্ষের সম্মুখে চারিদিক যেন দুলিতেছে—কি করিবে, কি বলিবে, কোন নির্ধারণই সে স্থির করিতে পারিল না।

শাশুড়ী আবার বলিলেন, চুপ করে রইলে কেন, বল, উত্তর দাও?

শৈল বিহ্বলের মত বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, বাবা দেন তো।

অমর মুহূর্তে উন্মত্তের মত দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল।

মা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অমর বলিল, ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না।

মা বলিলেন, আমার মাথা কাটা গেল—হরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের কাছে। এমন বউ নিয়ে আমিও ঘর করতে পারব না বাবা।

বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে—স্বেচ্ছাচার। তাই ওইটুকু অপরাধে শৈলর অদৃষ্টে গুরু দণ্ড হইয়া গেল,—সেই রাত্রেই তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটার ট্রেনে শৈলর দেবর তাহাকে লইয়া এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেল।

শৈলকে দেখিয়াই তাহার মা আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হইয়া বলিলেন, এ কি শৈল, তুই যে এমন হঠাৎ?

শৈল ঢোঁক গিলিয়া বলিল, কেন মা, আমাকে কি আসতে নেই? তোমরা তো আনলে না, কাজেই নিজেই এলাম।

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মা বলিলেন, ওরে, আনতে কি অসাধ, না, আমার মনেই ব্যথা হয় না, কিন্তু কি করব বল্?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাবুর রোজগার কমে গেছে, বাজার নাকি বড় মন্দা। তার ওপর হেমির বিয়ে এসেছে—খরচ যে করতে পারছি না মা।

শৈল অবকাশ পাইয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মা বলিলেন, সঙ্গে কে এসেছে শৈলী? জামাই?

শৈল বিবর্ণ মুখে বলিল, না, আমার দেওর এসেছে।

কই সে—ওমা, বাইরে কেন সে?—ঘরের ছেলে। ওরে দাই, দেখ্ তো, বড়দিদির দেওর বাইরে আছেন, ডাক্ তো। বল্—মা ডাকছেন। শৈলর বুক দুরদুর করিতেছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অমরের আদেশ ছিল, সে যেন এখানে জলগ্রহণ না করে। কঠিন শপথ দিয়া আদেশ দিয়াছে অমর।

দাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই কেউ তো নেই।

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সেকি? কোথায় গেল সে?

শৈল বলিল, তাকে ট্রেন ধরতে হবে মা, সে চলে গেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে মা যেন অভিভূত হইয়া গেলেন।—ট্রেন ধরতে হবে—চলে গেছে, সে কি?

শৈল বলিল, তাকে সিমলে যেতে হবে মা—একটা খুব বড় কাজের সন্ধান করতে যাচ্ছে; যে ট্রেনে আমরা নামলাম, এই ট্রেনই সে গিয়ে ধরবে, থাকবার তার উপায় নেই।

মা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ফেরবার সময় নামতে বলে দিয়েছিস তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল, বলে তো দিয়েছি মা, কিন্তু নামতে বোধ হয় পারবে না, খুব জরুরী কাজ কিনা। সিমলে থেকে কলকাতায় যাবে একটা কার চিঠি নিয়ে, সময়ে পৌঁছুতে না পারলে তো সব মিছে হবে।

এই সময়ে শৈলর জ্ঞানান্বেষী বড়দাদা বাড়ি ঢুকিল। পরনে তাহার খদ্দর সত্য, কিন্তু জড়িপাড় শৌখিন খদ্দরের ধুতি, গায়েও শৌখিন খদ্দরের পাঞ্জাবি, মুখে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট; হাতে কতকগুলি মাছ ধরিবার চারের উপকরণ।

শৈলকে দেখিয়াই সে বলিল, আরে, শৈলী কখন, অ্যাঁ?

হাসিমুখে শৈল বলিল, এই তো দাদা। ভাল আছেন আপনি?

হ্যাঁ। তা বেশ, কই, তুই নতুন লোক, খাস বাংলা দেশের মানুষ—কই, দে তো এই চারগুলো তৈরি করে, দেখি, তোর হাতের কেমন পয়! মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে—এক জমিদারের তালাওয়ে।

শৈল উপকরণগুলি হাতে লইয়া বলিল, চলুন না দাদা, একবার আমাদের ওখানে, কত মাছ ধরতে পারেন একবার দেখব!

তোদের ওখানে পুকুরে খুব মাছ, না রে?

আমাদেরই পুকুরে খুব বড় বড় মাছ—আধ মণ, পনরো সের, পঁচিশ সের এক-একটা মাছ। জানেন দাদা, তখন প্রথম গেছি, একটা আঠারো সের কাতলা মাছ এনে দেওর বললে, বউদিকে কুটতে হবে।

ওরে বাপ রে, সে যা আমার ভয়! এখন আর আমার ভয় হয় না—আধ মণ, পঁচিশ সের মাছ দিব্যি কেটে ফেলি।

যাবার ইচ্ছে তো হয় রে, হয়ে ওঠে না। কলকাতা যাই, তাও অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সময় হয় না। আবার তুই অবিশ্যি যদি কলকাতায় থাকতিস, তবে নিশ্চয় যেতাম।

শৈল বলিল, আচ্ছা দেখব, আমাদেরও কলকাতায় বাড়ি হবে এইবার—

অর্ধপথে বাধা দিয়া দাদা বলিল, কোলকাতায় তোদের বাড়ি হচ্ছে নাকি?

শৈল বলিল, জায়গা কিনছেন। ধীরে ধীরে হবে এইবার।

মা পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করেন, জামাই এখন বেশ পাচ্ছেন, না রে শৈলী?

শৈল মুখ নত করিয়া বলিল দেশেও দালান করবেন।

মাস দুয়েক পরই কিন্তু শৈলের মা অনুভব করিলেন, কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে, জামাই বা বেয়ান কেহই তো শৈলকে পত্র দেন না, সংবাদ লন না! তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখ, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখ।

মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ব্যক্তি। শৈল অন্যের সম্বন্ধে যতই অত্যুক্তি করিয়া থাক্, তাহার পিতার উপার্জনকে যতই বাড়াইয়া বলিয়া থাক্, পিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যুক্তি সে করে নাই। সত্যই তিনি সাধু প্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর কথায় শঙ্কিত হইয়া পরদিনই বেয়ানকে পত্র দিলেন। লিখিলেন—

আমি আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তি, শৈলকে চরণে স্থান দিয়া আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি—প্রার্থনা করি, সে অনুগ্রহ হইতে আমি বা আমার শৈল যেন বঞ্চিত না হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সেখানে কি ঘটিয়াছে, শৈল কি অপরাধ করিয়াছে! কিন্তু অপরাধ যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কোন কথা প্রকাশ করে নাই; তবুও এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে কই

কোন আশীর্বাদ তো আসিল না! শ্রীমান অমর বাবাজীবনও তো কোন পত্র দেন না! দয়া করিয়া, কি ঘটিয়াছে, আমাকে জানাইবেন; আমি নিজে শৈলকে আপনার চরণে উপস্থিত করিয়া তাহার শাস্তি দিব।

তারপর শেষে আবার লিখিলেন—

অমর সংবাদ না দিলেও শৈলর নিকট তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কলিকাতায় বাড়ি করিবে শুনিয়া পরম আনন্দ হইল। আপনার মেজো ছেলের পরীক্ষার সংবাদ শুনিলাম, কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হইতে পারে নাই। আশীর্বাদ করি, বি. এ-তে সে যোগ্য স্থান লাভ করিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়ের চক্ষে জল আসিল।

মনে তাঁহার ক্রোধবহ্নি জ্বলিতেছিল, ইন্ধনের অভাবে সময়ক্ষেপে সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে তাঁহার শৈলর প্রতিমার মত মুখ মনে পড়িত। বলুক সে মিথ্যা, তবু মিষ্ট কথার সুরটি তাঁহার কানে বাজিত। আজ বেয়াইয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার সকল গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল। শুধু বিদূরিত হইয়া গেল নয়, পুত্রবধূর উপর মন তাঁহার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, পত্রের শেষভাগটুকু পড়িয়া আবার তিনি সেখানটা পড়িলেন,—কলিকাতার বাড়ি, ইত্যাদি।

তিনি অমরকে পত্র দিলেন। বেয়াইকে লিখিলেন—

বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কোন অপরাধ হয়? তবে কার্য-গতিকে সংবাদ লইতে পারি নাই, সে দোষ আমারই। শীঘ্রই অমর বউমাকে আনিবার জন্য যাইবে।

পত্র পাইবামাত্র শৈল পুলকিত হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

অমর আসিয়াছে। দশ-বারো সেরের একটা মাছ সে সঙ্গে আনিয়াছে। শৈল তাড়াতাড়ি সেটা কাটিতে বসিল।

বলিল, বড় জাতের মাছ বোধ হয় ধরা পড়ে নি। এগুলো মাঝলাজাত।

ওদিক হইতে ভ্রাতৃজায়া বলিল, এই আরম্ভ হল! শ্বশুর-বাড়ির অবস্থা ভাল আর কারও হয় না!

রাত্রে অমরের নিকট শৈল নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। অমর একখানা পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, এসব কি বল তো?—'একটি বড়

মাছ যেমন করিয়া হউক আনিবে, এখানে আমি আমাদের অনেক মাছ আছে বলিয়াছি।' বেশ, আমাদের ষোল-আনা একটাও তো পুকুর নেই অথচ—ছিঃ! আর 'এখানে মুক্তার গহনার চলন হইয়াছে, আমার জন্ত ঝুটা মুক্তার মালা একছড়া—' ও কি,—ও কি, কাঁদছ কেন শৈল, শৈল?

শৈল বিছানায় মুখ গুঁজিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। সে কথা যে অমরকে মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

অগ্রদানী

একটা ছয় ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা কাঠিকে মাঝামাঝি মচকাইয়া নোয়াইয়া দিলে যেমন হয়, দীর্ঘ শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্তীর অবস্থাও এখন তেমনই। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে সে এমন ছিল না, তখন সে বত্রিশ বৎসরের জোয়ান, খাড়া সোজা। লোকে বলিত, মই আসছে—মই আসছে। কিন্তু ছোট ছেলেদের সে ছিল মহা প্রিয়পাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিদের হাসি দেখিয়া সে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিত, হুঁ। কি রকম, হাসছ যে ?

এই দাদা, একটা রসের কথা হচ্ছিল।

হুঁ। তা বটে, তা তোমার রসের কথা—ও তোমার রস খাওয়ারই সমান।

একজন হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া দিত, না দাদা, তোমাকে দেখেই সব হাসছিল, বলছিল—মই আসছে।

চক্রবর্তী আকর্ণ দাঁত মেলিয়া হাসিয়া উত্তর দিত, হুঁ তা বটে। তা কাঁধে চড়লে স্বর্গে যাওয়া যায়। বেশ পেট ভরে খাইয়ে দিলেই, বাস, স্বর্গে পাঠিয়ে দোব।

আর পতনে রসাতল, কি বল দাদা ?

চক্রবর্তী মনে মনে উত্তর খুঁজিত। কিন্তু তাহার পূর্বেই চক্রবর্তীর নজরে পড়িত, অল্পদূরে একটা গলির মুখে ছেলের দল তাহাকে ইশারা করিয়া ডাকিতেছে। আর চক্রবর্তীর উত্তর দেওয়া হইত না। সে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িত।

কোন দিন রায়েদের বাগানে, কোন দিন মিঞাদের বাগানে ছেলেদের দলের সঙ্গে গিয়া হাজির হইয়া আম জাম বা পেয়ারা আহরণে মত্ত থাকিত। সরস পরিপক্ক ফলগুলির মিষ্ট গন্ধে সমবেত মৌমাছি-বোলতারা ঝাঁক বাঁধিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণের ভয় দেখাইলেও

সে নিরস্ত হইত না; টুপটাপ করিয়া মুখে ফেলিয়া চোখ বুঁজিয়া রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকিত।

ছেলেরা কলরব করিত, ওই, অ্যাঁ—তুমি যে সব খেয়ে দিলে, অ্যাঁ!

সে তাড়াতাড়ি ডালটা নাড়া দিয়া কতকগুলা ঝরাইয়া দিয়া আবার গোটা দুই মুখে পুরিয়া বলিত, আঃ।

কেহ হয়তো বলিত, বাঃ পুন্নকাকা, তুমি যে খেতে লেগেছ? ঠাকুর-পুজো করবে না?

পূর্ণ উত্তর দিত, ফল ফল, ভাত-মুড়ি তো নয়, ফল ফল।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে দিন এ কাহিনীর আরম্ভ, সেদিন স্থানীয় ধনী শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এক বিরাট শান্তি-স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষ্যে ছিল ব্রাহ্মণ-ভোজন। শ্যামাদাসবাবু সন্তানহীন, একে একে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া মারা গিয়াছে। ইহার পূর্বে বহু অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার শ্যামাদাসবাবু বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রী শিবরাণী সজল চক্ষে অনুরোধ করিল, আর কিছু দিন অপেক্ষা করে দেখ; তারপর আমি বারণ করব না, নিজে আমি তোমার বিয়ে দেব।

শিবরাণী তখন আবার সন্তানসম্ভবা। শ্যামাদাসবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শুধু তাই নয়, এবার তিনি এমন ধারা ব্যবস্থা করিলেন যে সে ব্যবস্থা যদি নিস্ফল হয় তবে যেন শিবরাণীর পুনরায় অনুরোধের উপায় আর না থাকে। কাশী বৈদ্যনাথ তারকেশ্বর এবং স্বগৃহে একসঙ্গে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। স্বস্ত্যয়ন বলিলে ঠিক বলা হয় না, পুত্রেষ্টিযজ্ঞই বোধ হয় বলা উচিত।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন বিপুল। শ্যামাদাসবাবু গলবস্ত্র হইয়া প্রতি পংক্তির প্রত্যেক ব্রাহ্মণটির নিকট গিয়া দেখিতেছেন—কি নাই, কি চাই! এক পাশে পূর্ণ চক্রবর্তীও বসিয়া গিয়াছে, সঙ্গে তাহার তিনটি ছেলে। কিন্তু পাতা অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি। বাড়তি পাতাটিতে অন্ন ব্যঞ্জন মাছ স্তূপীকৃত হইয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাতাটি তাহার ছাঁদা; তাহার নাকি এটিতে দাবি আছে। সে-ই শ্যামাদাসবাবুর প্রতিনিধি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে আবার আহারের সময় আহ্বান

জানাইয়াও আসিয়াছে। তাহারই পারিশ্রমিক এটি। শুধু শ্যামাদাস-বাবুর বাড়িতে এবং এই ক্ষেত্র-বিশেষটিতেই নয়, এই কাজটি তাহার যেন নির্দিষ্ট কাজ, এখানে পঞ্চগ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়িতেই হউক এবং যত সামান্য আয়োজনের ব্রাহ্মণ-ভোজন হউক না কেন, পূর্ণ চক্রবর্তী আপনিই সেখানে গিয়া হাজির হয়; হাঁটু পর্যন্ত কোনরূপে ঢাকে এমনই বহরের তাহার পোশাকী কাপড়খানি পরিয়া এবং বাপ-পিতামহের আমলের রেশমের একখানি কালী-নামাবলী গায়ে দিয়া হাজির হইয়া বলে, হুঁ, তা কর্তা কই গো, নেমন্তন্ন কি রকম হবে একবার বলে দেন? ওঃ, মাছগুলো বেশ তেলুক-তেলুক ঠেকছে! হুই হুই! নিয়েছিল এক্ষুনি চিলে!

চিলটা উড়িতেছিল আকাশের গায়ে, পূর্ণ চক্রবর্তী সেটাকেই তাড়াইয়া গৃহস্থের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়। দুর্দান্ত শীতের গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া সে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেরে; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরেও আহারের আহ্বান জানাইতে চক্রবর্তী ছেঁড়া চটি পায়ে, মাথায় ভিজা গামছাখানি চাপাইয়া কর্তব্য সরিয়া আসে; সেই কর্মের বিনিময়ে এটি তাহার পারিশ্রমিক। যাক।

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া পূর্ণকে বলিলেন, আর কয়েকখানা মাছ দিক চক্রবর্তী।

চক্রবর্তীর তখন খান-বিশেক মাছ শেষ হইয়া গিয়াছে; সে একটা মাছের কাঁটা চুষিতেছিল, বলিল, আজ্ঞে না, মিষ্টি-টিষ্টি আবার আছে তো! হরে ময়রার রসের কড়াইয়ে ইয়া ইয়া ছানাবড়া ভাসছে, আমি দেখে এসেছি।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, সে তো হবেই, একটা মাছের মুড়ো?

পূর্ণ পাতাখানা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল, ছোট দেখে।

মাছের মুড়াটা শেষ করিতে করিতে ও-পাশে তখন মিষ্টি আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্তী ছেলেদের বলিল, হুঁ, বেশ করে পাতা পরিষ্কার কর্ হুঁ। নইলে নোস্তা ঝোল লেগে খারাপ লাগবে খেতে। এঃ, তুই যে কিছুই খেতে পারলি না, মাছসুদ্ধ পড়ে আছে!—বলিয়া ছোট ছেলেটার

পাতের আধখানা মাছও সে নিজের পাতে উঠাইয়া লইল। মাছখানা শেষ করিয়া সে গলাটা ঈষৎ উঁচু করিয়া মিষ্টি-পরিবেশনের দিকে চাহিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে হাঁকিতেছিল, এই দিকে।

ওপাশে সকলে তাহাকে দেখিয়া টেপাটেপি করিয়া হাসিতেছিল। একজন বলিল, চোখ দুটো দেখ, চোখ দুটো দেখ—

উঃ, যেন চোখ দিয়ে গিলছে!

আমি তো ভাই, কখনও ওর পাশে খেতে বসি না। উঃ, কি দৃষ্টি!

ততক্ষণে মিষ্টান্ন চক্রবর্তীর পাতার সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়াছে।

চক্রবর্তী মিষ্টান্ন-পরিবেশকের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল, ছাঁদার পাতে আমি আটটা মিষ্টি পাব।

বাঃ, সে তো চারটে করে মিষ্টি পান মশায়!

সে দুটো করে যদি পাতে পড়ে, তবে চারটে। আর চারটে যখন পাতে পড়ছে, তখন আটটা পাব না, বাঃ!

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া বলিলেন, ষোলটা দাও ওঁর ছাঁদার পাতে। ভদ্রলোক বিনা-মাইনেতে নেমন্তন্ন করে আসেন; দাও দাও, ষোলটা দাও।

পূর্ণ চক্রবর্তী আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল, আঁচলে দাও, আমার আঁচলে দাও।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, কাল সকালে একবার আসবে তো! কেমন, এখানে এসেই জল খাবে!

যে আজ্ঞা, তা আসব।

ওপাশ হইতে কে বলিল, চক্রবর্তী, বাবুকে ধরে পড়ে তুমি বিদূষক হয়ে যাও—আগেকার রাজাদের যেমন বিদূষক থাকত।

চক্রবর্তী গামছায় ছাঁদার পাতাটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, হুঁ। তা তোমার, হলে তো ভালই হয়; আর তোমার, ব্রাহ্মণের লজ্জাই বা কি? রাজা-জমিদারের বিদূষক হয়ে যদি ভাল-মন্দটা—

বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া উঠিল।

বাড়িতে আসিয়া ছাঁদা-বাঁধা গামছাটা বড়ছেলের হাতে দিয়া চক্রবর্তী বলিল, যা বাড়িতে দিগে যা।

ছেলেটা গামছা হাতে লইতেই মেজো মেয়েটা বলিল, মিষ্টিগুলো ?

সে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যা।

অ্যাঁ, তুমি লুকিয়ে রাখবে। ষোলটা মিষ্টি কিন্তু গুনে নোব হ্যাঁ।

আরে আরে, এ বলছে কি। ষোলটা কোথা রে বাপু! দিলে তো আটটা, তাও কত ঝগড়া করে।

মা, মা, দেখ বাবা মিষ্টিগুলো লুকিয়ে রেখেছে, অ্যাঁ!

চক্রবর্তী-গৃহিণী যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্র্যের শতমুখী আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই। দেহ শীর্ণ, চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, তবুও হৈমবতী যেন সত্যই হৈমবতী। কাঞ্চননিভ দেহবর্ণ দেখিয়া সোনার প্রতিমা বলিতেই ইচ্ছা করে। চোখ দুইটি আয়ত সুন্দর, কিন্তু দৃষ্টি তাহার নিষ্ঠুর মায়াহীন। মায়াহীন অন্তর ও রূপময়ী কায়া লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি, প্রভাতের পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতই প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠে।

হৈমবতী আসিয়া দাঁড়াইতেই চক্রবর্তী সভয়ে মেয়েকে বলিল, বলছি, তুই নিয়ে যেতে পারবি না ; না, মেয়ে চেঁচাতে—

হৈমবতী কঠোর স্বরে বলিল, দাও।

চক্রবর্তী আঁচলের খুঁটটি খুলিয়া হৈমর সম্মুখে ধরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছেলেটা বলিল, বাবাকে আর দিও না মা। আজ যা খেয়েছে বাবা, উঃ! আবার কাল সকালে বাবু নেমন্তন্ন করেছে বাবাকে মিষ্টি খাওয়াবে।

হৈম কঠিন স্বরে বলিল, বেরো, বেরো বলছি আমার সুমুখ থেকে হতভাগা ছেলে! বাপের প্রতি ভক্তি দেখ! তোরা সব মরিস না কেন, আমি যে বাঁচি!

পূর্ণ এবার সাহস করিয়া বলিল, দেখ না ছেলের তরিবৎ যেন চাষার তরিবৎ!

হৈম বলিল, বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে, সেটুকুও ভাগ্যি মেনো। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই, রোগে ওষুধ নেই, গায়ে জামা নেই, তবু মরে না ওরা! রাক্ষসের ঝাড়, অথণ্ড পেরমাই!

চক্রবর্তী চুপ করিয়া রহিল। হৈম যেন আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া গেল। চক্রবর্তী ছেলেটাকে বলিল, দেখ দেখি রে, এক টুকরো হত্তুকি, কি সুপুরি এক কুচি যদি পাস! তোর মার কাছে যেন চাস নি বাবা!

সন্ধ্যার পর চক্রবর্তী হৈমর কাছে বসিয়া ক্রমাগত তাহার তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। হৈম কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। চক্রবর্তী এবং ছেলেরা আজ নিমন্ত্রণ খাইয়াছে। রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা নাই, যে ছাঁদাটা আসিয়াছে তাহাতে হৈম এবং কোলের ছেলেটারও চলিয়া গিয়াছে।

বহু তোষামোদেও হৈম যেন তেমন প্রসন্ন হইল না। অন্তত চক্রবর্তীর তাই মনে হইল; সে মনের কথা বলিতে সাহস পাইল না। তার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায়। তাহার তৃপ্তি হয় নাই, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্ধমান বহ্নিশিখার মতো জ্বলিতেছে।

ধীরে ধীরে হৈমবতী ঘুমাইয়া পড়িল। শীর্ণ দুর্বল দেহ, তাহার উপর আবার সে সন্তানসম্ভবা, সন্ধ্যার পরই, শরীর যেন ভাঙিয়া পড়ে। চক্রবর্তী হৈমর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হাঁ, হৈম ঘুমাইয়াছে; চক্রবর্তী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হৈমর আঁচল হইতে দড়িতে বাঁধা কয়টা চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই ছেলেরা নাচিতে নাচিতে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, ছানাবড়া খাব! বড় ছেলেটা ঘুর-ঘুর করিয়া বার বার মায়ের কাছে আসিয়া বলিতেছিল, আমাকে কিন্তু একটা গোটা দিতে হবে মা।

হৈম বিরক্ত হইয়া বলিল, সব—সব— সবগুলো বের করে দিচ্ছি, একটা কেন?

সে চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একটা রূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে শিকাতে মিষ্টিগুলি ঝুলানো ছিল, সেটা কিসে কাটিয়া ফেলিয়াছে, মিষ্টান্নগুলি অধিকাংশই কিসে খাইয়া গিয়াছে, মাত্র গোটা তিন-চার মেঝের উপর পড়িয়া আছে; তাও সেগুলি রসহীন শুষ্ক, নিঃশেষে রস শোষণ করিয়া লইয়া ছাড়িয়াছে! ছেঁড়া শিকাটাকে সে একবার তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, কাটা নয়, টানিয়া কিসে ছিঁড়িয়াছে। অতি নিষ্ঠুর কঠিন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল!

বাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, গিন্নীর একান্ত ইচ্ছে যে তুমি এবার তাঁর আঁতুড়-দোরে থাকবে।

এখানকার প্রচলিত প্রথায় সূতিকা-গৃহের দুয়ারের সম্মুখে রাত্রে ব্রাহ্মণ রাখিতে হয়। চক্রবর্তীর সন্তানদের মধ্যে সব কটিই জীবিত, চক্রবর্তী-গৃহিণী নিখুঁত প্রসূতি ; তাহার সূতিকা গৃহের দুয়ারে চক্রবর্তীই শুইয়া থাকে। তাই শিবরাণী এবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, কল্যাণের এমনই সহস্র খুঁটিনাটি লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত। শ্যামাদাসবাবুও তাহার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন না।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, তা আজ্ঞে—

একজন মোসাহেব বলিয়া উঠিল, তা না না—কিছু নেই চক্রবর্তী। দিব্যি এখানে এসে রাজভোগ খাবে রাত্রে, ইয়া পুরু বিছানা, তোফা ভরা পেটে, বুঝেছ ? বলিয়া সে ঘড়ঘড় করিয়া নাক ডাকাইয়া ফেলিল।

আহার ও আরামের বর্ণনায় পুলকিত চক্রবর্তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হুঁ, তা হুজুর যখন বলছেন, তখন না পারলে হবে কেন ?

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, বোসো তুমি, আমি জল খেয়ে আসছি। তোমারও জলখাবার আসছে।—বলিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। একজন চাকর একখানা আসন পাতিয়া দিয়া মিষ্টান্নপরিপূর্ণ একখানা থালা নামাইয়া দিল।

একজন বলিল, খাও চক্রবর্তী।

হুঁ। তা একটু জল, হাতটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

আর একজন পারিষদ বলিল, গঙ্গা গঙ্গা বলে বসে পড় চক্রবর্তী। অপবিত্র পবিত্রো বা, ওঁ বিষ্ণু স্মরণ করলেই—বাস্ শুদ্ধ, বসে পড় !

গ্লাসের জলেই একটা কুলকুচা করিয়া খানিকটা হাতে বুলাইয়া লইয়া চক্রবর্তী লোলুপভাবে থালার সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

পাশের ঘরে জলযোগ শেষ করিয়া আসিয়া শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, পেট ভরল চক্রবর্তী ?

চক্রবর্তীর মুখে তখন গোটা একটা ছানাবড়া; একজন বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, কথা বলবার অবসর নেই চক্রবর্তীর এখন।

সেটা শেষ করিয়া চক্রবর্তী বলিল, আজ্ঞে পরিপুন্ন, তিল ধরবার জায়গা নেই আর পেটে।

সে উঠিয়া পড়িল।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, তোমার কল্যাণে যদি মনস্কামনা আমার সিদ্ধ হয় চক্রবর্তী, তবে দশ বিঘে জমি আমি তোমাকে দেব। আর আজীবন তুমি সিংহবাহিনীর একটা প্রসাদ পাবে। তা হলে তোমার কথা তো পাকা, কেমন ?

সিংহবাহিনীর প্রসাদ কল্পনা করিয়া চক্রবর্তী পুলকিত হইয়া উঠিল। ,সিংহবাহিনীর ভোগের প্রসাদ—সে যে রাজভোগ !

হুঁ, তা পাকা বইকি। হুজুরের—

কথা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, দেখি·দেখি, ওহে, দেখি।

চোখ তাহার যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

খানসামাটা শ্যামাদাসবাবুর উচ্ছিষ্ট জলখাবারের থালাটা লইয়া সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। একটা অভুক্ত ক্ষীরের সন্দেশ ও মালপোয়া থালাটার উপর পড়িয়া ছিল। চক্রবর্তীর লোলুপতা অকস্মাৎ যেন সাপের মতো বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উদ্গার করিল। চক্রবর্তী স্থানকাল সমস্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিল, দেখি দেখি, ওহে দেখি দেখি।

শ্যামাদাসবাবু হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন, কর কি, এঁটো, ওটা এঁটো। নতুন এনে দিক।

চক্রবর্তী তখন থালাটা টানিয়া লইয়াছে। ক্ষীরের সন্দেশটা মুখে পুরিয়া বলিল, আজ্ঞে, রাজার প্রসাদ।

আর সে বলিতে পারিল না, আপনার অন্যায়টা মুহূর্তে তাহার বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে ! কিন্তু আর উপায় ছিল না, বাকিটাও আর ফেলিয়া রাখা চলে না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেটাও কোনোরূপে গলাধঃকরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের ছুতা করিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়িতে তখন মরুতে ঝড় বহিতেছে। হৈম মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ছেলেগুলা কাঁদিতেছে। বড়টা কোথায় পলাইয়াছে।

মেজো মেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিষ্টিগুলো কিসে খেয়ে দিয়েছে, তাই দাদা ঝগড়া করে মাকে মেরে পালাল। মা পড়ে গিয়ে—

কথার শেষাংশ তাহার কান্নায় ঢাকিয়া গেল। চক্রবর্তীর চোখে জল

আসিল। জলের ঘটি ও পাখা লইয়া সে হৈমর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে করিতে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চেতনা হইতেই হৈম স্বামীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি ছি! তোমাকে কি বলব আমি—ছিঃ।

চক্রবর্তী হৈমর পা জড়াইয়া ধরিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল, মাথা ঠুকে মরব আমি; ছাড়, পা ছাড়।

সমস্ত দিন হৈম নির্জীবের মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার দিকে সে সুস্থ হইয়া উঠিলে চক্রবর্তী সমস্ত কথা বলিয়া কহিল, তোমার বলছ আবার ওই সময়েই। তা হলে না হয় কাল বলে দেব যে, পারব না আমি।

হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল, না না না। মরুক, মরুক, হয়ে মরুক আমার। আমি খালাস পাব। জমি পেলে অন্যগুলো তো বাঁচবে।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই। সেদিন সন্ধ্যায় শ্যামাদাসবাবুর লোক আসিয়া চক্রবর্তীকে ডাকিল, চলুন আপনি, গিন্নীমায়ের প্রসববেদনা উঠেছে।

চক্রবর্তী বিব্রত হইয়া উঠিল; হৈমরও শরীর আজ কেমন করিতেছে।

হৈম বলিল, যাও তুমি।

কিন্তু—

আমাকে আর জ্বালিও না বাপু, যাও। বাড়িতে বড় খোকা রয়েছে, যাও তুমি।

চক্রবর্তী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। জমিদার-বাড়ি তখন লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, এস চক্রবর্তী এস। আমি বড় ব্যস্ত এখন। তুমি রান্নাবাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিও।

চক্রবর্তী সটান গিয়ে তখনই রান্নাশালে উঠিল।

হুঁ, ঠাকুর, কি রান্না হয়েছে আজ? বাঃ খোসবুই তো খুব উঠছে। কি হে ওটা, মাছের কালিয়া না মাংস?

মাংস। আজ মায়ের পুজো দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে কিনা।

হুঁ, তা তোমার রান্নাও খুব ভাল। তার ওপর তোমার বাদলার দিন। কত দূর, বলি দেরি কত? দাও না, দেখি একটু চেখে।

সে একখানা শালপাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙা করিয়া একেবারে কড়াই ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা লোভ তোমার কিন্তু চক্রবর্তী।

হুঁ, তা বলেছ ঠিক। তা একটু বেশি। তা বটে।

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল, সিদ্ধ হতে দেরি আছে নাকি ?

হাতাতে করিয়া খানিকটা অর্ধসিদ্ধ মাংস তাহার ঠোঙাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, এই দেখ, বললে তো বিশ্বাস করবে না। নাও, হুঁঃ!

সেই গরম ঝোলই খানিকটা সড়াৎ করিয়া টানিয়া লইয়া চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, বাঃ, ঝোলটা বেড়ে হয়েছে! হুঁ, তা তোমার রান্না, যাকে বলে উৎকৃষ্ট।

ঠাকুর আপন মনেই কাজ করিতেছিল, সে কোনো উত্তর দিল না।

চক্রবর্তী আবার বলিল, হুঁ। তা তোমার, এ চাকলায় তো কাউকে তোমার জুড়ি দেখলাম না। মাংসটা সিদ্ধ এখনও হয় নি, তবে তোমার গিয়ে খাওয়া চলছে।

ঠাকুর বলিল, চক্রবর্তী, তুমি এখন যাও এখান থেকে। খাবার হলে খবর দেবে চাকররা। আমাকে কাজ করতে দাও। যাও ওঠো।

চক্রবর্তী উঠিত কি না সন্দেহ! কিন্তু এই সময়ে তাহার বড় ছেলেটা আসিয়া ডাকিল, বাবা।

চক্রবর্তী উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি রে ?

একবার বাড়ি এস। ছেলে হয়েছে।

তোর মা—তোর মা কেমন আছে ?

ভালই আছে গো। তবে দাই-টাই কেউ নেই, দাই এসেছে বাবুদের বাড়ি ; নাড়ি কাটতে লোক চাই।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি ছেলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

হৈম!

ভয় নেই, ভালই আছি। তুমি শুদ্দুরদের দাইকে ডাক দেখি, নাড়ী কেটে দিয়ে যাক। আমাদের দাইকে তো পাওয়া যাবে না।

তাহাই হইল। দাইটা নাড়ী কাটিয়া বলিল, সোন্দর খোকা হয়েছে

বাপু, মা-বাপ সোন্দর না হলে কি ছেলে সোন্দর হয়! মা কেমন—তা দেখতে হবে।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, তা হলে, তাই তো! খোকা যাক, বলে আসুক বাবুকে, অন্য লোক দেখুক ওঁরা।

হৈম বলিল, দেখ, জ্বালিও না আমাকে। যাও বলছি, যাও।

চক্রবর্তী আবার অন্ধকারের মধ্যে বাবুদের বাড়ির দিকে চলিল।

মধ্যরাত্রে জমিদার-বাড়ি শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শিবরাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

পূর্ব হইতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত ছিল, সে-ই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নাড়ী কাটিল। গরম জলে শিশুর শরীরে ক্লেদাদি ধুইয়া মুছিয়া দাইয়ের কোলে শিশুটিকে সমর্পণ করিয়া সে যখন বিদায় হইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে।

প্রভাতে চক্রবর্তী বাড়ি আসিতেই হৈম বলিল, ওগো, ছেলেটার ভোররাত্রে যেন জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে।

চক্রবর্তী চমকিয়া উঠিল, বলিল, হুঁ, তা—

অবশেষে অনুযোগ করিয়া বলিল, বললাম তখন, যাব না আমি। তা তুমি একেবারে আগুন হয়ে উঠলে! কিসে যে কি হয়—হুঁ।

হৈম বলিল, ও কিছু না, আপনি সেরে যাবে। এখন পয়সা-টাকের সাবু কি দুধ যদি একটু পাও তো দেখ দেখি। আমাকে কাটলেও তো এক ফোঁটা দুধ বেরুবে না।

পয়সা ছিল না, চক্রবর্তী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবুদের বাড়ির দিকেই চলিল, দুধের জন্য। কাছারি-বাড়িতে ঘটিটি হাতে দাঁড়াইয়া সে বাবুকে খুঁজিতেছিল। বাবু ছিলেন না। লোকজন সব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে। কেহ চক্রবর্তীকে লক্ষ্যই করিল না।

খানসামাটা বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিল, সে চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আজ আর পেসাদ-টেসাদ মিলবে না ঠাকুর; যাও, বাড়ি যাও।

চক্রবর্তী ম্লান মুখে ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। একজন নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য একটা আড়াল দেখিয়া বসিয়া তামাক

টানিতেছিল, চক্রবর্তী তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ বাবা, ছেলের জন্যে গাই দোয়া হয়নি ?

সে উত্তর দিল, কেন ঠাকুর, খারস্ত খাবে নাকি ? আচ্ছা পেটুক ঠাকুর যা হোক ! না, গাই দোয়া হয়নি, বাড়িতে ছেলের অসুখ, ওসব হবে না এখন, যাও ।

শিশুর অসুখ বোধহয় শেষরাত্রেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোঝা যায় নাই। সারারাত্রিব্যাপী যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শিবরাণীও এলাইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রিজাগরণক্লিষ্টা দাইটাও ঘুমাইয়াছিল।

প্রভাতে বেশ একটু বেলা হইলে, শিবরাণী উঠিয়া বসিয়া ছেলে কোলে লইয়াই আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিল। এ কি, ছেলে যে কেমন করিতেছে ! তাহার পূর্বের সন্তানগুলি তো এমনই ভাবেই—। চোখের জলে শিবরাণীর বুক ভাসিয়া গেল। শিশুর শুভ্রপুষ্পতুল্য দেহবর্ণ যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ।

শিবরাণী আর্তস্বরে ডাকিল, যমুনা, একবার বাবুকে ডেকে দে তো ?

শ্যামাদাসবাবু আসিতেই সে বলিল, ডাক্তার ডাকাও, ছেলে কেমন হয়ে গেছে ! সেই অসুখ ।

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দুর্গা দুর্গা !

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। স্থানীয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল এবং তাহার পরামর্শ মতো শহরেও লোক পাঠানো হইল বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শিবরাণীর আশঙ্কা সত্য ; সত্যই শিশু অসুস্থ। ধীরে ধীরে শিশুর দেহবর্ণ হইতে আকৃতি পর্যন্ত যেন কেমন অস্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। এই সর্বনাশা রোগেই শিবরাণীর শিশুগুলি এমনই করিয়া সূতিকা-গৃহে একে একে বিনষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্ণে সদর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া শিশুকে কিছুক্ষণ দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, চলুন, আমার দেখা হয়েছে !

দাইটা বলিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, ছেলে—

তাহার প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই ডাক্তার বলিল, ওষুধ দিচ্ছি ।

শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে ডাক্তার বাহির হইয়া গেল ।

শ্যামাদাসবাবুর মাসীমা সূতিকা-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাইকে বলিলেন, কই, ছেলে নিয়ে আয় তো দেখি।

ছেলের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আ আমার কপাল রে!—বলিয়া ললাটে করাঘাত করিলেন। ঘরের মধ্য শিবরাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

মাসীমা আপন মনেই বলিলেন, আর ও বার করে দিতে হয়েছে কি করেই বা বলি! আর পোয়াতীর কোলেই বা—

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুকে বলিল, কিছু মনে করবেন না শ্যামাদাস-বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বলুন।

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুর যৌবনের ইতিহাস প্রশ্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়া বলিল, আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওই হল আপনার সন্তানদের অকালমৃত্যুর কারণ।

তা হলে ছেলেটা কি—

না, আশা আমি দেখি না।—বলিয়া বিদায় হইল।

শ্যামাদাসবাবু বাড়ির মধ্যে আসিতেই মাসীমা আপনার মনের কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, নইলে কি পোয়াতীর কোলে ছেলে মরবে? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা। আচার-আচরণগুলো মানতে হবে তো।

আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোন প্রয়োজন হয় না; এবং হিন্দুর সংসারে আচারের উপরেই নাকি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরাণীর কোল শূন্য করিয়া দিয়া শিশুকে সূতিকা-গৃহের বাহিরে বারান্দায় মৃত্যু-প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার কাছে রহিল দাই এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ, আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নির্মাল্যের রাশি। ঘরের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা শিবরাণীর সেবা ও সান্ত্বনার জন্য রহিল যমুনা ঝি।

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি। চক্রবর্তী বসিয়া ঘন ঘন তামাক খাইতেছিল। তাহার ঘরেও শিশুটি অসুস্থ। কিন্তু সে সারিয়া উঠিবে। চক্রবর্তী মধ্যে মধ্যে আপন মনেই বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, বিধিলিপি! তাহার শিশুটা মরিয়া যদি এটি বাঁচিত, তবে চক্রবর্তী অন্তত বাঁচিত। দশ বিঘা জমি আর সিংহবাহিনীর

প্রসাদ নিত্য এক থালা। ভাগ্যের চিকিৎসা কি আর ডাক্তারে করিতে পারে!

শিশুটি মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে।

চক্রবর্তী দাইটাকে বলিল, একটু জল-টল মুখে দে রে বাপু!

নিদ্রাকাতর দাইটা বলিল, জল কি খাবে গো ঠাকুর? তা বলছ, দিই।

সে উঠিয়া ফোঁটা দুই জল দিয়া শিশুর অধর ভিজাইয়া দিল। তারপর শুইতে শুইতে বলিল, ঘুমোও ঠাকুর, তোমার কি আর ঘুম-টুম নাই?

চক্রবর্তীর চক্ষে সত্য সত্যই ঘুম নাই। সে বসিয়া আকাশজোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশও এমনই অন্ধকার। আঃ, ছেলেটা যদি যাদুমন্ত্রে বাঁচিয়া উঠে? চক্রবর্তী পৈতা ধরিয়া শিশুর ললাটখানি একবার স্পর্শ করিল।

অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপে।

না, না, সে হয় না। জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। সে আবার তামাক খাইতে বসিল।

দাইটা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। ঘরের মধ্যেও শিবরাণীর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি আর শোনা যায় না। কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; জলন্ত অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন আগুন জ্বলিতেছে।

উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মূর্তি, তাহার শিশুও কুৎসিত নয়, দরিদ্রের সন্তান হইলেও জননীর কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার সন্তানের হইবে! উঃ!

পাপ যেন সম্মুখে অদৃশ্য কায়া লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চক্রবর্তীর চোখের সম্মুখে ঝলমল করিতেছে। চক্রবর্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুর নিকট আসিয়া কিন্তু আবার তাহার ভয় হইল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। পর-মুহূর্তে সে মৃতপ্রায় শিশুকে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল।

অদ্ভুত, সে যেন চলিয়াছে অদৃশ্য বায়ুপ্রবাহের মতো—নিঃশব্দ, দ্রুত-গতিতে। অন্ধকার পথেও আজ সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ কেহ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করে না, তাহারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাঙা ঘর। চারিদিকে প্রাচীরও সর্বত্র নাই! হৈমের সূতিকা-গৃহের দরজাও নাই, একটা আগড় দিয়া কোনরূপে আগলানো আছে। হৈমও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

চক্রবর্তী আবার বাতাসের মতো লঘু ক্ষিপ্রগতিতে ফিরিল।

দাইটা তখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

রোগগ্রস্ত শিশু, মৃত্যু-রোগগ্রস্ত নয়। সে থাকিতে থাকিতে অপেক্ষাকৃত সবল ক্রন্দনে আপনার অভিযোগ জানাইল। দাইটার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না। চক্রবর্তী ঘুমের ভান করিয়া কাঠ মারিয়া পড়িয়া রহিল!

শিশু আবার কাঁদিল।

ঘরের মধ্যে শিবরাণীর অস্ফুট ক্রন্দন এবার যেন শোনা গেল।

শিশু আবার কাঁদিল।

এবার যমুনা ঈষৎ দরজা খুলিয়া বলিল, দাই, ও দাই! ওমা নাক ডাকছে যে! ঠাকুরও দেখছি মড়ার মতো ঘুমিয়েছে! ও দাই!

দাইটা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। যমুনা বলিল, এই বুঝি তোর ছেলে আগলানো! ছেলে যে কাতরাচ্ছে, মুখে একটু করে জল দে।

দাইটা তাড়াতাড়ি শিশুর মুখে জল দিল, শুষ্ককণ্ঠে শিশু ঠোঁট চাটিয়া জলটুকু পান করিয়া আবার যেন চাহিল। দাই আবার দিল।

এবার সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, ওগো জল খাচ্ছে গো ঠোঁট চেটে চেটে।

শিবরাণী দুর্বল দেহে উঠিয়া পড়িয়া বসিল, নিয়ে আয়, ঘরে নিয়ে আয় আমার ছেলে, কারও কথা আমি শুনব না।

প্রভাতে আবার লোক ছুটিল সদরে! এবার অন্য ডাক্তার আসিবে। মৃত্যুদ্বার হইতে শিশু ফিরিয়াছে। দেবতার দান, ব্রাহ্মণের প্রসাদ! চক্রবর্তী নাকি আপন শিশুর পরমায়ু রাজার শিশুকে দিয়াছে! হতভাগ্যের সন্তান মারা গিয়াছে। প্রায়ান্ধকার সূতিকা-গৃহে শিবরাণী

জ্বর-কাতর শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাগ্য-দেবতা তাহার হারানো মানিক!

দশ বিঘা জমি চক্রবর্তী পাইল। সিংহবাহিনীর প্রসাদ এক থালা করিয়া নিত্য সে পায়। হৈম অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্তী সেই তেমনি করিয়াই বেড়ায়।

লোকে বলে, স্বভাব যায় না মলে।

চক্রবর্তী বলে, হুঁ, তা বটে। কিন্তু ছেলের দল দেখেছ, এক-একটা ছেলে যে একটা হাতির সমান।

হৈম ছেলেগুলিকে ইস্কুলে দিয়াছে বড় ছেলেটি এখন ইতরের মতো কথা বলে না, কিন্তু বড় বড় কথা বলে, বাবার ব্যবহারে ইস্কুলে আমার মুখ দেখানো ভার মা। ছেলেরা যা-তা বলে। কেউ বলে, ভাঁড়ের বেটা খুরি। কেউ কেউ আবার দেখলেই সড়াৎ করে মুখে ঝোল টানে। তুমি বাপু বারণ করে দিও বাবাকে।

হৈম সে কথা বলিতেই চক্রবর্তী সহসা যেন আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অস্বাভাবিক রূপ দেখিয়া হৈমও চমকিয়া উঠিল।

চক্রবর্তী বলিল, চলে যাব, চলে যাব আমি সন্ন্যেসী হয়ে।

ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু বাহির হইতে কে ডাকিল, চক্রবর্তী!

কে?

বাঁড়ুজ্জেরা পাঠালে হে! ওদের মেয়ের বাড়ি তত্ত্ব যাবে, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে; ওরা কেউ যেতে পারবে না। লাভ আছে হে, ভাল-মন্দ খাবে, বিদেয়টাও পাবে।

আচ্ছা, চল যাই।

চক্রবর্তী বাহির হইয়া পড়িল। বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ি গিয়া যেখানে মিষ্টি তৈয়ারী হইতেছিল, সেখানে চাপিয়া বসিয়া বলিল, ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। হুঁ, তা যেতে হবে বইকি। উনোনের আঁচটা একটু ঠেলে দিই, কি বল মোদক মশায়?

সে সতৃষ্ণ নয়নে কড়াইয়ের পাকের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৎসর দশেক পর শিবরাণী হঠাৎ মারা গেল। লোকে বলিল ভাগ্যবতী! স্বামী-পুত্তুর রেখে ডঙ্কা মেরে চলে গেল!

শ্যামদাসবাবু শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিলেন। চক্রবর্তীর এখন ওইখানেই বাসা হইয়াছে। সকালবেলাতেই ঠুকঠুক করিয়া গিয়া হাজির হয়, বসিয়া বসিয়া আয়োজনের বিলি-বন্দোবস্ত দেখে, মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে।

সেদিন বলিল, হুঁ, ছাঁদা একটা করে তো দেওয়া হবে। তা তোমার লুচিই বা কখানা আর তোমার মিষ্টিই বা কি রকম হবে?

একজন উত্তর দিল, হবে হবে। একখানা করে লুচি, এই চালুনের মতো। আর মিষ্টি একটা করে, তোমার লেডিকেনি, এই পাশ-বালিশের মতো, বুঝলে!

সকলে মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল। শ্যামাদাসবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, একটু থাম তো সব। হ্যাঁ, কি হল, পাওয়া গেল না?

একজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি কথা কহিতেছিলেন। কর্মচারীটি বলিল, আজ্ঞে, তাদের বংশই নির্বংশ হয়ে গিয়েছে।

তা হলে অন্য জায়গায় লোক পাঠাও। অগ্রদানী না হলে তো শ্রাদ্ধ হয় না।

আচ্ছা, তাই দেখি। অগ্রদানী তো বড় বেশি নেই, দশ-বিশ ক্রোশ অন্তর এক ঘর আধ ঘর।

কে একজন বলিয়া উঠিল, তা আমাদের চক্রবর্তী রয়েছে। চক্রবর্তী নাও না কেন দান, ক্ষতি কি? পতিত করে আর কে কি করবে তোমার?

শ্যামাদাসবাবুও ঈষৎ উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিলেন, মন্দ কি চক্রবর্তী শুধু দান-সামগ্রী নয়, ভূ-সম্পত্তিও কিছু পাবে, পঁচিশ বিঘে জমি দেব আমি, আর তুমি যদি রাজী হও, তবে বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা দেব আমি, দেখ।—বলিয়াই তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া চাকরকে ডাকিলেন, ওরে, চক্রবর্তীকে জলখাবার এনে দে। কলকাতার মিষ্টি কি আছে নিয়ে আয়।

শ্রাদ্ধের দিন সকলে দেখিল, শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিবরাণীর শ্রাদ্ধ করিতেছে, আর তাহার সম্মুখে অগ্রদান গ্রহণ করিবার জন্য দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে পূর্ণ চক্রবর্তী।

তারপর গোশালায় বসিয়া তাহারই হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চক্রবর্তী গোগ্রাসে পিণ্ড ভোজন করিল।

গল্পের এইখানেই শেষ, কিন্তু চক্রবর্তীর কাহিনী এখানে শেষ নয়। সেটুকু না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

লোভী, আহার-লোলুপ চক্রবর্তীর আপন সন্তানের হাতে পিণ্ড ভোজন করিয়াও তৃপ্তি হয় নাই! লুব্ধ দৃষ্টি, লোলুপ রসনা লইয়া সে তেমনই করিয়া ফিরিতেছিল। এই শ্রাদ্ধের চৌদ্দ বছর পরে সে একদিন শ্যামাদাসবাবুর পায়ে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্যামাদাসবাবু তাঁহার দুই বৎসরের পৌত্রকে কোলে লইয়া শুষ্ক অশ্বত্থতরুর মতো দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চক্রবর্তী তাঁহার দুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পারব না বাবু, আমি পারব না।

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না পারলে উপায় কি, চক্রবর্তী? আমি বাপ হয়ে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে—তার বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে পারবে, আর তুমি পারবে না বললে চলবে কেন, বল? দশ বিঘে জমি তুমি এতেও পাবে।

শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিশু-পুত্র ও পত্নী রাখিয়া মারা গিয়াছে, তাহারই শ্রাদ্ধ হইবে।

চক্রবর্তী নিরুপায় হইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

শ্রাদ্ধের দিন গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল।

পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী।

বেদেনী

শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা-কঙ্কালীর এস্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে, ভোজবাজি—'ছারকাছ'। ছোট তাঁবুটার প্রবেশপথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে 'ভোজবাজি—সার্কাস'। লেখাটার এক পাশে একটা বাঘের ছবি, অন্য পাশে একটা মানুষ, তাহার হাতে এক রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর হাতে একটা ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজবাজি অর্থে 'গোলকধামের' খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ', 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়', 'তাজবিবিকা কবর'। তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বশেষে একটা পর্দা ঠেলিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ! বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদিনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখামুখি দাঁড়াইয়া বাঘটাকে চুমা খায়, সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয় মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়। সর্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—ডুম ডুম ডুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী একজোড়া প্রকাণ্ড করতাল বাজায়—ঝন-ঝন-ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে, বাঘ! ওই বড়-বা-ঘ!

বেদেনী প্রশ্ন করে, বড় বাঘ কি করে?

—পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলা শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বার বার গর্জন করিতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহল-কম্পিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এ ছাড়াও বেদিনীর নিজের খেলা আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর গোটাকতক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর একটি বাজির তাঁবু আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেক বড় এবং কায়দাকরণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটা ঘোড়া, একটা গোরুর গাড়ির উপর একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে।

গোরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্মান্তিক ঘৃণায় হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা!

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল! শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ যেন মাখানো আছে। ক্রূর নিষ্ঠুরতাপরিব্যঞ্জক একধারার উগ্র তামাটে রঙ আছে—শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে; আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নীচেই একটা খাঁজ, সাপের মতো ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সে দন্তুর, সম্মুখের দুইটা দাঁত যেন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংসায় ক্রোধে সে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসায় ক্রোধে ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে

চকমক করিয়া উঠে তেমনই ঝকমক করিয়া উঠিল; সে বলিল, দাঁড়া, বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা!

রাধিকার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নূতন তাঁবুটার ভিতর ঢুকিয়া বলিল, কে বেটে, মালিক কে বেটে?

কি চাই?—তাঁবুর ভিতরের আর একটা ঘরের পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল এবং দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা হালকা দেহ,—'তেজী ঘোড়ার' যেমন মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে —লোকটির হালকা অথচ সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে। রঙ কালোই, নাকটি লম্বা টিকালো, চোখ সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুইটির উপর তুলি দিয়া আঁকা গোঁফের মতো একজোড়া গোঁফ সূচ্যগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি চুল, গলায় কারে ঝুলানো একটি সোনার ছোট চাকা তক্তি,—সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। দুইজনেই দুইজনকে দেখিতেছিল।

কি চাই?—নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কথার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নীচে বায়ুস্তর ভুরভুর করিয়া উঠিল!

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এইখানে বসছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া ধরিল, মাতালের হাসি হাসিল, বলিল, সে হবে, আগে মদ টুক্‌চা—

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, বলিল, কটি বোতল আছে তুমার নাগর—মদ খাওয়াইবা?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রাধিকাকে দেখিযা বিস্ময়ে মোহে কথা হারাইয়া নির্বাক হইয়া গেল।—কালো সাপিনীর মতো ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন-মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সুতার মতো সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্ধনিমীলিত ভঙ্গির মদিরদৃষ্টি দুইটি চোখে, সুচালো চিবুকটিতে—সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া

ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়াফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা। শুধু রাধিকারই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপবৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মতো ধারের ইঙ্গিত, চারিদিকে হিংস্র তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়, ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

রাধিকার খিলখিল হাসি থামে নাই, সে নূতন বাজিকরের বিস্ময়-বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল, বাক হর্যা গেল যে নাগরের?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল, বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে মদের অভাব! এস।

কথা সত্য, এই জাতিটি মদ কখনও কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায়; কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখনও ছাড়ে না। শাসন-বিভাগের নিকট পর্যন্ত ইহাদের এই অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিশ্বাসে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাতি, নতুবা—। সে রাধিকার দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তুই আইলি কেন এথেনে?

রাধিকা এবারও খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরণ তুমার! আমি মদ খাব নাই?

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকে পাখির মাংসের টুকরা টুকরা হাড়ের কুচি ও একরাশি মুড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস, আর একটায় কতকগুলা মুড়ি পেঁয়াজ লঙ্কা, খানিকটা নুন, দুইটি খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্ধসমাপ্ত। বিস্রস্তবাসা একটি বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল ধূলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া ঊর্ধ্ববাহুর ভঙ্গিতে মাটির উপর লুণ্ঠিত, মুখে তখনও মদের ফেনা বুদ্বুদের মতো লাগিয়া রহিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটি।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার বেদেনী? ই যি কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো!

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিতপদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা স্থানের আলগা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়াই রাধিকা বলিল, কি নাম গো তুমার বাজিকর?

নূতন বাজিকর কাঁচা লঙ্কা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল, নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

কেনে?

নাম বটে কিষ্টো বেদে।

তা গালি দিব কেনে?

তুমার যে নাম রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্র হস্তে কি বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, কই, কালিয়াদমন কর দেখি কিষ্টো, দেখি!

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল; কিন্তু কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কালো কেউটের বাচ্চা! আহত সর্পশিশু হিস্-হিস্ গর্জনে মুহূর্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল; শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল, 'আ-কামা', অর্থাৎ বিষদাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে ট্যাঁক হইতে ছোট একটা ছুরি বাহির করিয়া দাঁত দিয়া খুলিয়া ফেলিল; এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুই-ই কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও ত সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগে

সে মুহূর্তপূর্বের ওই সাপটার মতোই ফুলিয়া উঠিল, বলিল, আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে?

কিষ্টো বলিল, তুমি যে বল্ল্যা গো দমন করতে।—বলিয়া সে এবার হা-হা করিয়া উঠিল।

রাধিকা মুহূর্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার উপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনাদের ছোট তাঁবুটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু এখনও খাটানো হয় নাই। রাধিকার চোখ দুইটি হিংস্রভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল, আরও একটু দূরে একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কেষ্টা। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসা পূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী-ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরাণ-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। এমনই আর একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু-পুরাণ গান করে, তাহারা নিজেদের বলে—পটুয়া, বিপুল চিত্রকরের জাতি। বিবাহ-আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামি পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকরেরা সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়। অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়, কিন্তু এই নূতন তাঁবুর মত সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনও খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া

সে বাঘটাকে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকন লোম, মুখে হাসির মতো ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ, অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে। কতবার যে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কি যে মমতা ঐ বাঘটার প্রতি, তাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া শম্ভু ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, তুর ওই বুড়া বাঘের খেলা কেউ দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধ শম্ভু বলিল, তু জানছিস সব!

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না জেনে না আমি! তু-ই জানছিস সব!

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল, ওরে মড়া, বুড়ার নাচন দেখতে কার কবে ভাল লাগে রে! আমারে বলে তুই জানিস সব!

শম্ভু মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মতো ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল, ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিনীর মতো গর্জন করিয়া উঠিল, কি বুললি বেইমান?

শম্ভু আর কোন কথা বলিল না, অঙ্কুশভীত বাঘের মতো ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান তাহাকে এতবড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ, তুই তো বুড়া! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া আর কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স

তখন সতেরো ! তাহারও তিন বৎসর পূর্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ। সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি। সাপ, বাঁদর, ছাগল এসবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ,—ধামা বুনিত, চেয়ার-পালির কাজ করিত, ফুলের শৌখিন সাজি তৈয়ার করিত, তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত; সে কাঁধে ভার বহিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস, রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর, ছাগল। শিবপদর সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত বাঁশের বাঁশী। রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশী বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদর আর একটা কতবড় গুণ ছিল। তাহাদের সামাজিক মজলিসে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ, এবং লেখাপড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এইজন্য তাহার পরামর্শ প্রবীণেরাও গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার! আর সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মতো। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে! তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির উপর সাদা সুতার ঘন ঘন ঘরকাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালবাসিত, শিবপদ বারো মাস সেই কাপড়ই তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, একটা ছেঁড়া তাঁবু, আর এক বিগতযৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যেদিন শম্ভুকে দেখিল, সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠদেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত, সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল, এ-ই বেদেনী, দেখি তুর সাপ কেমন!

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, শথ দেখি যে খুব ! পয়সা দিবা ?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল, পয়সা দিব না ; তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা ? যেমন অদ্ভুত চেহারা, তেমনই কি অদ্ভুত কথা ; বলে—বাঘ দেখাইবে। সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, সত্যি বুলছ ?

বেশ, দেখ, আগে আমার বাঘ দেখ ! সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই বাঘ দেখাইয়াছিল। সবিস্ময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, হ, বাঘ নিয়া তুমি কি কর ?

লড়াই করি, খেলা দেখাই।

হাঁ ?

হাঁ, দেখবি তু ?—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা দুই হাতে ধরিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, তু এইবার সাপ দেখা আমাকে।

রাধিকা সে কথার উত্তর দেয় নাই, বলিয়াছিল, উটা তুমার পোষ মেনেছে ?

হি-হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, হি, বাঘিনী পোষ মানাতেই আমি ওস্তাদ আছি।

কি যে হইয়াছিল রাধিকার, এক বিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিনকয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক্, লজ্জা হওয়া দূরে থাক্, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি-ছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনীত শিবপদর অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার অন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া

আসিয়াছে, দুঃখেই দিন চলে আজকাল ; শম্ভু যাহা রোজগার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা এই কথা বলিল? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

ও দিকে নূতন তাঁবুতে আবার বাজনা বাজিতেছে। দোসরা দফার খেলা আরম্ভ হইবে। মদ খাইয়া রাধিকা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, ওই বাজনার শব্দে তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন .জ্বালা করিয়া উঠিল। উহাদের তাঁবুতে নিশীথরাত্রে· আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝকঝকে সাজ-পোশাক, চোখ রাঙা, সে-ই তখন কথা বলিতেছিল, কেনে, ইথে দোষটা কি হল? তুমরা বসে রইছ, আমাগোর খেলা হছে! খেলা দেখবার নেওতা দিলাম, তা দোষটা কি হল?

শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল, খেল দেখাবেন খেলোয়ারী আমার! অপমান করতে আসছিস'তু!

কিষ্টো কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই উত্তেজিত রাধিকা একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া বসিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে বলের মতো লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর ইটটাকে লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল। বিস্ময়ে রাধিকা সামান্য কয়টা মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে ঘোর কাটিতেই সে বর্ধিত উত্তেজনায় আবার একটা ইট কুড়াইয়া লইল; শম্ভু তাহাকে নিবৃত্তি করিল, সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল, এই মেলার বাদেই বাঘ কিনে লিয়ে আসব।

ওদিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, খোল কানাত, ফেলে দে খুল্যে।

তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাত খুলিয়া

দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে বাধ্য হয়। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে।

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরত দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিছু বার কর তুমি, নইলে বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আমাগোর।

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, পুলিসে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিয়া দিব।

ওদিকে টিয়াপাখিতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল, ইঃ—একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা!

রাধিকা আপনাদের খেলার দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশেও ফুলিতেছিল। তাঁবুর আগুন ধরিয়া ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া যায়! কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

পরদিন সকালে উঠিতে রাধিকার একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল; উঠিয়া দেখিল, শম্ভু নাই; সে বোধ হয় দুই-চারিজন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিষ্টোর তাঁবুর চারিপাশে পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা বসিয়া আছেন। এ কি? সে সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, ডাক সব, আমরা তাঁবু দেখব।

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল, কি কসুর করলাম হুজুর?

মদ আছে কি না দেখব আমরা। ডাক বেটাছেলেদের। এইখান থেকেই ডাক।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন; কিন্তু সে আর তাঁহার ভুল ভাঙাইল না। সে বলিল, ভিতরে আমার কচি ছেলে রইছে হুজুর—

আচ্ছা, ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটার আলগা মাটি সরাইয়া দেখিল, তিনটা বোতল তখনও মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে, শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিষ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া রাধিকা বলিল, পুলিস আইছে, বসে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে অকম্পিত সংযত পদক্ষেপে স্তন্যদানরত মাতার মতো শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল! তাহার পিছনে পিছনেই কিষ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা প্রশ্ন করিলেন, এ তাঁবু তোমার?

সেলাম করিয়া কিষ্টো বলিল, জী, হুজুর।

দেখব তাঁবু আমরা, মদ আছে কিনা দেখব।

মেলার ভিড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ততক্ষণে জলরাশির মধ্যে জলবিন্দুর মতো মিশিয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়া ছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিসকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভেল্কি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখে।

শম্ভু কঠিন আক্রোশভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল। রাধিকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল, খাবা, ছেলে খাবা?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বলিল, সব মাটি করে দিছিস তু; উয়াকে আমি জেহেলে দিবার লাগি পুলিসে বলে এলাম, আর তু করে এলি এই কাণ্ড!

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গত রাত্রির কথা। সত্যই, এ কথা তো বলিয়াছিল! সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে

শম্ভুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ণ হইতে এই তাঁবুতে খেলা আরম্ভ হইবে।

শম্ভু আপনার জীর্ণ পোশাকটি বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙের চোঙের মতো সরু প্যান্টলুন, আর একটা কালো রঙেরই খাটো-হাতা কোট। রাধিকার পরনে পুরানো রঙিন ঘাঘরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত, কিন্তু আজ সে বেণীই বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞায় ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল! উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মতো গাল-মোটা, স্থবিরার মতো স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জীর মত টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সাটিনের একটা জাঙ্গিয়া ও কাঁচুলি ঢঙের বডিস্। কুৎসিৎ মেয়েটাকে যেন সুন্দর দেখাইতেছে। উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসা-পিতলের বাসনের আওয়াজের মতো একটা রেশ শেষকালে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। আর এই কতকালের পুরানো একটা ঢ্যাপঢ্যাপে জয়ঢাক, ছি!

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজনা থামাইয়া হাঁকিল, ও—ই ব—ড় বা—ঘ।

রাধিকা রুদ্ধস্বর কোনোমতে সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বড় বাঘ কি করে?

শম্ভু খুব উৎসাহভরেই বলিল, পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভরে, চিবায় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বৃদ্ধ বনচারী হিংস্রক আর্তনাদের মতো গর্জন করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও-তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাচার উপরে রাধিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার শরীর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। ক্রূর হিংসাভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিষ্টো হাসিতেছে। রাধিকার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হাঁকিল, ফিন একবার।

ও-তাঁবুর ভিতর হইতে দ্বিতীবোর খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার প্রবল গর্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। রাধিকার চোখে জলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মতো কিষ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভুর তাঁবুতে অল্প কয়েকটি লোক সস্তায় আমোদ দেখিবার জন্য ঢুকিল। খেলা শেষ করিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুতপদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিল একটা কিসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিরক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কি উটা ?

কেরাচিনি। আগুন লাগায়ে দিব উহাদের তাঁবুতে। পুরা পেলুম নাই, হুসের কম রইছে। তাহার চোখ জলিতেছে।

শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জলিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, লিয়ে আয় মদ।

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল, দাউ-দাউ করে জলবেক যখন !

সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারের মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখনও খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিষ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরত দেখাইতেছে, উঃ, একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিতে লাগিল ! দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, এখুন লয়, সেই সেই—নিশুত রাতে !

তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ ; অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে ; বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল, এক মুহূর্তের জন্য তাহার চোখে ঘুম আসে নাই।

বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার থমথম করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথাও জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালিল, ওই কেরাচিনির টিনটা রহিয়াছে। তারপর শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর

ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে! সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া, টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহির হইয়া গেল।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ওদিকটা সমস্ত পুড়িয়া তবে এদিকে মেলাটার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মতোই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া সনসন করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক পাতিয়া মাথাটা গলাইয়া দিল। সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার। সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া ফস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

তাহার কাছেই এই যে কেষ্টো একটা অসুরের মতো পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতে লাগিল, কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস! উঃ বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলা কি নিটোল। তাহার আশেপাশে ঘোড়ার খুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে। ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন। দেশলাইটা নিবিয়া গেল।

রাধিকার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী মুহূর্তে যাহা করিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত। সে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপপ ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিষ্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, কে? রাধি—

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাধিকা বলিল, হ্যাঁ, চুপ।

কিষ্টো চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল, দাঁড়াও, মদ আনি।

না। চল, উঠ, এখুনই ইথান থেক্যে পালাই চল।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল।

কিষ্টো বলিল, কুথা?

হু-ই, দেশান্তরে।

দেশান্তরে? ই তাঁবু-টাবু—?

—থাক পড়্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উহার রাধিকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না?

সে নিম্নস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদিয়া—তাহার উপর দুরন্ত যৌবন—কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল, চল।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল, দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চল।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।

ডাইনী

কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নামটি আজও পূর্ণগৌরবে বর্তমান ;—ছাতি-ফাটার মাঠে জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মতো মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় ; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে। তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নামগৌরবে মহামাড়ীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মতো ধূলার একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে ; অপর প্রন্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের মসীরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর ! শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য-নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলারাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড় প্রান্তরটায় এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও সেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। কোনো বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না ; কোথাও জল নাই,—গোটা কয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু তাহাতে জল থাকে না।

মাঠখানির চারিদিকেই ছোট ছোট পল্লী—সবই নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম; সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না—তাহারা বলে, কোন অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চরমাণ পতঙ্গ-পক্ষীও পঙ্গু

হইয়া ঝরা-পাতার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রামের মধ্যে।

সে নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি-ফাটার মাঠ। তাহারই ভাগ্যদোষে ঐ বিষজর্জরতার উপরে আর এক ক্রূর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। মাঠখানার পূর্বপ্রান্তে দলদলির জলা, অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর পঙ্কিল ঝরনা-জাতীয় জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী—ভীষণ শক্তিশালিনী নিষ্ঠুর ক্রূর একটা বৃদ্ধা ডাকিনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে, তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবদ্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর।

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘর; ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে-ছাওয়া বারান্দা—সেই বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার কাজের মধ্যে সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই-তিনটা বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভয়ে ভিক্ষা বেশী পরিমাণেই দিয়া থাকে; সের-খানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ি ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্ধেক বিক্রি করিয়া দোকান হইতে একটু নুন, একটু সরিষার তেল, আর, খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে। বাড়ি ফিরিয়া আর একবার বাহির হয় শুকনো গোবর ও দুই-চারিটা শুকনো ডালপালার সন্ধানে। ইহার পর সমস্তটা দিন সে দাওয়ার উপর নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। এমনি করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ি সে কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে একথা নাকি নিঃসন্দেহ যে, তিন চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে

একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফাটার মাঠের নির্জনরূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে। নির্জনতাই উহারা ভালবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।

মানুষ দেখিলেই যে অনিষ্টস্পৃহা জাগিয়া উঠে! সর্বনাশী লোলুপ শক্তিটা সাপের মতো লকলকে জিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া উঠে। না হইলে সেও তো মানুষ।

আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া উঠে। বহুকালের পুরানো একখানি আয়না—সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজের ভয় হয়—ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুইটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মতো একটা ঝকমকে ধার! জরা-কুঞ্চিত মুখ, শনের মতো সাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানির চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কি সুন্দর লালচে রং, আর কি পালিশই না ছিল। আর আয়নার কাচখানা ছিল রোদ-চকচকে পুকুরের জলের মতো। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত। ছোট কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল—ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে; কপালের নীচেই টিকোল নাক; চোখ দুইটি ছোটই ছিল—চোখের তারা দুইটিও খয়রা রঙেরই ছিল—লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় করিত। কিন্তু তাহার বড় ভাল লাগিত, ছোট চোখ দুইটি আরও একটু ছোট করিয়া তাকাইলে মনে হইত, আকাশের কোল পর্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায়। অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল—নরুন দিয়া চেরা, ছুরির মতো চোখে, বিড়ালীর মতো এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভাল লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না। কোথা দিয়া যে কি হইয়া যায়, কেমন করিয়া যে হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না; তবে হইয়া যায়।

প্রথম দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

বুড়া শিবতলার সম্মুখেই দুর্গাসায়রের বাঁধাঘাটের ভাঙা রানার উপর সে দাঁড়াইয়া ছিল—জলের তলে তাহার ছবি উল্টা দিকে মাথা করিয়া

দাঁড়াইয়া জলের ঢেউয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া লম্বা হইয়া যাইতেছিল—জল স্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহার মতো দশ-এগার বৎসরের মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ বামুনবাড়ির হারু চৌধুরী আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া সান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর তাহাকে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার সে রূঢ় কণ্ঠস্বর সে এখনও শুনিতে পায়—হারামজাদী ডাইনী, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড় বাড়? খুন করে ফেলব হারামজাদীকে।

হারু সরকারের সে ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে।

সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল—ওগো বাবু গো, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি গো!

আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে যদি তোর লোভই হয়েছিল, তবে সে কথা বললি নে কেন হারামজাদী?

হাঁ, লোভ তো তাহার হইয়াছিল, সত্যই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা তো জলে ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিল!

হারামজাদী, আমার ছেলে যে পেট বেদনায় ছটফট করছে।

সে আজও অবাক হইয়া যায়, কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল—কেমন করিয়া এমন হয়! কিন্তু এ যে সত্য তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই! তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, সে হারু সরকারের বাড়ি গিয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়াছিল, আর বার বার মনে মনে বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, ভাল করে দাও, ওকে ভাল করে দাও। কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল—দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি, এই লইলাম। আশ্চর্যের কথা, কিছুক্ষণ পরেই বার দুই বমি করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সরকার বলিয়াছিল, ওকে একটা আম আর দুটি মুড়ি দাও দেখি।

সরকার-গিন্নী একটা ঝাঁটা তুলিয়াছিল, বলিয়াছিল, ছাই দেব হারামজাদীর মুখে। মা-বাপ-মরা অনাথা মেয়ে বলে দয়া করি—যেদিন হারামজাদী আসে সেই দিনই আমি ওকে খেতে দি। আর ও কিনা আমার ছেলেকে নজর দেয়! আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে দেখ! ওর ঐ চোখের দৃষ্টি দেখে বরাবর আমার সন্দেহ ছিল,

কখনও আমি ওর সাক্ষাতে ছেলেপুলেকে খেতে দিই নি। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে ঘাটে গিয়েছি, আর ও কখন এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি দিষ্টি ওর!

লজ্জায় ভয়ে সে পালাইয়া গিয়াছিল। সেদিন রাত্রে সে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ির দাওয়ায় শুইতে পারে নাই; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ঐ বুড়াশিবতলায়। অঝোরঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল আর বলিয়াছিল—হে ঠাকুর আমার দৃষ্টিকে ভাল করে দাও, না হয় আমাকে কানা করে দাও।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির মূর্তির মতো নিস্পন্দ বৃদ্ধার অবয়বের মধ্যে এতক্ষণে ক্ষীণ একটি চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। ঠোঁট দুইটি থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূর্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই—দেবতার দোষই বা কি, আর সাধ্যই বা কি? বেশ মনে আছে, গৃহস্থের বাড়িতে সে আর ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহির-দুয়ার হইতেই সে ভিক্ষা চাহিত—গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাহিত না, কোনও মতে বহুকষ্টে বলিত, দুটি ভিক্ষে পাই মা! হরিবোল!

কে রে? তুই বুঝি? খবরদার ঘরে ঢুকবি নে। খবরদার!

না মা, ঘরে ঢুকব না মা।

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে কি যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিত, এখনও উঠে। কি সুন্দর মাছভাজার গন্ধ, আহা-হা! বেশ খুব বড় পাকা-মাছের খানা বোধ হয়।

এই—এই! হারামজাদী বেহায়া! উঁকি মারছে দেখ! সাপের মতো।

ছি ছি ছি! সত্যিই তো সে উঁকি মারিতেছে—রান্নাশালার সমস্ত আয়োজন তাহার নরুন-চেরা ক্ষুদ্র চোখের এক দৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে। মুখের ভিতর জিভের তলা হইতে ঝরনার মতো জল উঠিতেছে।

বহুকালের গড়া জীর্ণ বিবর্ণ মাটির মূর্তি যেন কোথায় একটা নাড়া পাইয়া দুলিয়া উঠিল; ফাট-ধরা শিথিলগ্রন্থি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খলাহীন অসমগতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িল; অস্থিরভাবে বৃদ্ধা এবার নড়িয়া-চড়িয়া

বসিল—বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয়, সে কথা সারা জীবন ধরিয়াও যে বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিত্তের নিকট সমস্ত পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায়।

কিন্তু সে তার কি করিবে? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে, তার কি করিবে, কি করিতে পারে? প্রহৃত পশু যেমন মরিয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ-আঁ গর্জন করিয়া উঠে, ঠিক তেমনই ই-ই শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শণের মতো চুলগুলাকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে নরুন-চেরা চোখের চিলের মতো দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ভরিয়া ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্র মাস, বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠ-ভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মতো কি একটা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা ফুৎকার যদি সে দেয়, তবে মাঠের ধুলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে।

ঐ ধোঁয়ার মধ্যে জমাট সাদার মতো ওটা কি, নড়িতেছে যেন! মানুষ? হ্যাঁ মানুষই তো! মনের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। ফুঁ দিয়া ধুলা উড়াইয়া, দিবে মানুষটাকে উড়াইয়া? হি-হি-হি করিয়া পাগলের মতো হাসিয়া একটা অবোধ নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

দুই হাতের মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল—না-না-না। ছাতি-ফাটা মাঠে মানুষটা ধুলার গরমে শ্বাসরোধী ঘনত্বে মরিয়া যাইবে।

নাঃ; ওদিকে আর সে চাহিবেই না। তাহার চেয়ে বরং উঠানটার আর একবার ঝাঁটা বুলাইয়া, ছড়াইয়া-পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলাকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই সে ভাঙিয়া-পড়া দেহ-খানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে শুরু করিল।

জড়ো-করা পাতাগুলো ফর-ফর করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঝাঁটার মুখে টানিয়া-আনা

ধূলার রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়ীকেই যেন জড়াইয়া ধরিতেছিল, মুখে-চোখে ধূলা মাথাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্রুত আবর্তিত পাতাগুলা তাহাকে যেন সর্বাঙ্গে প্রহার করিতেছে। জরাগ্রস্ত রোমহীন আহতা মার্জারীর মতো ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটা-গাছটা আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো বেরো বেরো।

বার বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ঐ আবর্তটাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। আবর্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধুলা হু-হু করিয়া উড়িয়া ধূলার একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে! শুধু কি একটা? এখানে ওখানে ছোট বড় কত ঘুরণপাক উঠিয়া পড়িয়াছে—মাঠটা যেন নাচিতেছে। একটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে! একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মতো অধীর হইয়া উঠিল; সহসা সে ন্যুব্জ দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধ্যমত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোন অতলের দিকে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তিও তাহার ছিল না। ছোট শিশুর মতো হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে।

কে রইছ গো ঘরে? ওগো।

জলে পচা নরম মরা-ডালের মতো বৃদ্ধা বাঁকিয়া-চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়া ছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোনোমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল, কে?

ধূলিধূসরদেহে শুষ্ক-পাণ্ডুর মুখ একটি যুবতী মেয়ে বুকের ভিতর কোন একটা বস্তু কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহুকষ্টে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধ হয় ছাতি-ফাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে হাটিতে বলিল, একটুকুন জল।

মাটির উপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। মেয়েটির শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আহা-হা বাছা রে, আয়, আয়। বোস্।

সভয়ে সন্তর্পণে দাওয়ার এক পাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল, একটুকুন জল দাও গো! মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড় একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া এক টুক্‌রা পাটালির সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুরিয়া বলিল, আহা মা, এই রোদে ঐ রাক্ষুসী মাঠে কি বলে বের হলি তুই?

বাহিরে বসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, আমার মায়ের বড় অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে। মাঠের মাথায় এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তু এসে পড়লাম একেবারে মধ্যিখানে।

জলের ঘটি ও পাটালির টুকরাটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল—মেয়েটির পাশে একটি শিশু! গরম জলে সিদ্ধ শাকের মত শিশুটি ঘর্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল, দে, দে বাছা, ছেলেটার চোখে মুখে জল দে। মেয়েটি ছেলের মুখে চোখে জল দিয়া আঁচল ভিজাইয়া সর্বাঙ্গ মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে বসিয়া ছেলেটির, দিকে তাকাইয়া রহিল। স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধ হয়, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মত নরম সরস। দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, নরম গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে।

এঃ, ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে! দেহের সমস্ত জল কি বাহির হইয়া আসিতেছে! চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে! তবে কি—? কিন্তু সে তাহার কি করিবে? কেন তাহার সামনে আসিল? কেন আসিল? ঐ কোমল নধরদেহ শিশু ময়দার মত ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল-বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া—! জীর্ণ জর-জর ত্বকের উপর একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এ ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসাস্বাদ! যাঃ! নিতান্ত অসহায়ের মত আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল, খেয়ে ফেললাম—ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে। পালা পালা, তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি।

শিশুটির মা ঐ যুবতী মেয়েটি দুই হাতে ঘটি তুলিয়া ঢকঢক করিয়া

জল খাইতেছিল—তাহার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া পড়িয়া গেল; সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধার বিস্ফারিত-দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, এটা তবে রামনগর? তুমি সেই—? সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছেলেটিকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া যেন পক্ষিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে কি করিবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি! কাল সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন মুখে? লোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না, সে তাহা জানে; কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যে-কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে চোখে দেখিবে কি করিয়া? ছেলেমেয়েরা এমনিই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়াও উঠে; আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধ হয় আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে। ছি ছি ছি!

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাত্রে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সে দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে তো অনেকটা ডাগর হইয়াছে। তাহারই বয়সী তাহাদেরই স্বজাতীয়া সাবিত্রীর পূর্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে রোদ লইতেছিল। ছেলেটি শুইয়া ছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কি সুন্দর ছেলেটি।

ঠিক এমনি ভাবেই, ঠিক আজিকার মতই সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল, ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া নরম ময়দার তালের মত ঠাসিয়া, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া চুমায় চুমায় চুষিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পারিত না, মনে হইত, এ বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল, বলি ওলো, আক্কেলখাগী হারামজাদী, খুব যে, ভাবীসাবীর সঙ্গে মস্করা জুড়েছিস। আমার বাছার যদি কিছু হয়, তবে তোকে বুঝব আমি—হ্যাঁ।

তারপর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল, বেরো বলছি, বেরো। হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি!

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্বল শরীরে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। মর্মান্তিক দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল। বার বার সে মনে মনে বলিয়াছিল—ছি ছি! তাই নাকি সে পারে? হইলই বা সে ডাইনী, কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে? ছি ছি! ভগবানকে ডাকিয়া সে বলিয়াছিল—তুমি ইহার বিচার করিবে। একশ বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে, দয়া করিয়া প্রমাণ করিয়া দিও, সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালবাসি!

কিন্তু অপরাহ্নবেলা হইতে না-হইতেই তাহার অত্যুগ্র বিষময়ী দৃষ্টি-ক্ষুধার কলঙ্ক অতি নিষ্ঠুরভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমন ভাবে কাতরাইতেছে যে, ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের শ্মশানের জঙ্গলের মধ্যে সন্তর্পণে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া ছিল। বার বার মুখের থুথু মাটিতে ফেলিতে দেখিতে চাহিয়াছিল--কোথায় রক্ত! গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল। প্রথম বারদুয়েক বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার পরই কুটি কুটি রক্তের ছিটা, শেষকালে একেবারে খানিকটা তাজা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছিল। সেই দিন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।

গভীর রাত্রে—সে দিন বোধ হয় চতুর্দশীই ছিল, হাঁ চতুর্দশীই তো—বাকুলের তারাদেবী-তলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমার আগের প্রতি চতুর্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা-তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে—মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন দুঃখে হতাশায় উদাস হইয়া

গেল। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মত শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাসিয়া কোন্ নিরুদ্দেশলোকে হারাইয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিঙ্গল তারার অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল। সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছাতি ফাটার মাঠ ধূলায় ধূসর, বাতাস স্তব্ধ; ধূসর ধূলায় গাঢ় নিস্তরঙ্গ আস্তরণের মধ্যে সমস্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঐ অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলেটি এ গ্রাম হইতে খান দুই গ্রাম পার হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে। যে ঘাম সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া কে যেন বাহির করিয়া দিল। কে আবার? ঐ সর্বনাশী। মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়াছে, কেন গেলাম গো—আমি ঐ ডাইনীর কাছে কেন গেলাম গো! আমি কি করলাম গো!

লোকে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু-কামনা করিল। একবার জন কয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঝরনাটার কাছে আসিয়াও জুটিল। বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মত ফুঁসিয়া উঠিল—সে তাহার কি করিবে? সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরল লাবণ্যকোমল দেহ ধরিল কেন? অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে এক সময় চিলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। সেই চীৎকার শুনিয়া তাহারা পলাইয়া গেল। কিন্তু সে এখনও ক্রুদ্ধা অজগরীর মত ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদ্গার করিতেছে, আবার নিজেই গিলিতেছে। কখনও তাহার হি-হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চীৎকারে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছা হইতেছে—বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া পৃথিবী ফাটাইয়া হা-হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই। এঃ, সে আজ একটা গোটা শিশুদেহের রস অদৃশ্য-শোষণে পান করিয়াছে!

ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। শুক্লা নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা সাদা ফরাসের মত পড়িয়া আছে। কোথায়

একটা পাখি অশ্রান্তভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে—চোখ গে-ল! চোখ গে-ল। আমগাছগুলির মধ্যে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে। ঘরের পিছনে ঝরনার ধারে দুইটা লোক যেন মৃদুগুঞ্জনে কথা কহিতেছে। আবার সেই ছেলেগুলা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে নাকি? অতি সন্তর্পিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা ঘরের কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না, তাহারা নয়। এ বাউরীদের সেই স্বামীপরিত্যক্তা উচ্ছলা মেয়েটা আর তাহারই প্রণয়মুগ্ধ বাউরী ছেলেটা।

মেয়েটা বলিতেছে, না, কে আবার আসবে এখুনি, আমি ঘর যাব।

ছেলেটা বলিল, হেঁ! এখানে আসছে নোকে; দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে।

তা হোক। তোর বাবা যখন আমার সাথে তোর সাঙা দেবে না, তখন তোর সাথে এখানে কেন থাকব আমি?

ছি ছি ছি! কি লজ্জা গো! কোথায় যাইবে সে! যদি তাই গোপনে দুইজনে দেখা করিতে আসিয়াছে, তবে মরিতে ওখানে কেন? তাহার এই বাড়িতে আসিল না কেন? তাহার মত বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা কি? কি বলিতেছে ছেলেটা?—বাবা-মা বিয়ে না দেয়, চল্, তোতে আমাতে ভিনগাঁয়ে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব। তোকে নইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটির পছন্দর! ঐ কুপোর মত মেয়েটাকে উহার এত ভাল লাগিল! তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুর শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড় আয়নাটা। আয়নাটার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে চৌদ্দ-পনর বছরের একটি মেয়ের ছবি। একমাথা রুক্ষ চুল, ছোট কপাল, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট। চোখ দুইটি ছোট, তারা দুটি খয়রা রঙের; কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বইকি! আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজের ছবিই দেখিতেছিল। তখন আয়না তো তাহার ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে তখনও কোনদিন দেখে নাই। আরে, তুই আবার কেরে? কোথা থেকে এলি?—লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সে সবে বোলপুর আসিয়াছিল। সাবিত্রীর ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিয়া সেই

চতুর্দশীর রাত্রেই গ্রাম ছাড়িয়া বোলপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লোকটাকে দেখিয়া তাহার খারাপ লাগে নাই, কিন্তু তাহার কথার ঢঙটা বড় খারাপ লাগিয়াছিল। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, কেনে, যেথা থেকে আসি না কেনে, তোমার কি?

আমার কি? এক কিলে তোকে মাটির ভেতর বসিয়ে দিব। দেখেছিস কিল? ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ঐ লোকটির দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কালো পাথরের মত নিটোল শরীর। জিভের নীচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়াছিল। কোন উত্তর না দিয়া তীব্র তির্যক্ ভঙ্গিতে লোকটার দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন সূর্য ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বদিকে চুনে হলুদে রঙের প্রকাণ্ড থালার মত নিটোল গোল চাঁদ উঠিতেছিল, বোলপুরের একেবারে শেষে রেল-লাইনের ধারে বড় পুকুরটার বাঁধা ঘাটে বসিয়া আঁচল হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে সে ঐ চাঁদের দিকে চাহিয়া ছিল! চাঁদের আলো তখনও দুধবরন হইয়া উঠে নাই। ঘোলাটে আবছা আলোয় চারিদিক ঝাপসা দেখাইতেছিল। সহসা কে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল। সেই লোকটা। সে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজও বেশ মনে আছে—হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে দুইটা টোল খাইয়াছিল—হাসিলে তাহার গালে টোল খাইত—সে বলিয়াছিল, কথার জবাব না দিয়ে পালিয়ে এলি যে?

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, তুমি যাও বলছি, নইলে আমি চেঁচাব।

চেঁচাবি? দেখছিস পুকুরের পাঁক, টুঁটি টিপে তোকে পুঁতে দোব ঐ পাঁকে।

তাহার ভয় হইয়াছিল, সে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, লোকটা অকস্মাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরে পা ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া একটা ধমক দিয়া উঠিয়াছিল, ধ্যে-ৎ!

সে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল—আঁচল-ধরা হাতের মুঠিটা খসিয়া গিয়া মুড়িগুলি ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। লোকটার হি-হি করিয়া সে কি হাসি! সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিল, দুর-রো, ফ্যাচকাঁদুনে মেয়ে কোথাকার! ভাগ্।

তাহার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিয়াছিল, তুমি মারবা নাকি?

না না, মারব কেন? তোকে শুধালাম—কোথায় বাড়ি তোর, তু একেবারে খ্যাঁক করে উঠলি। তাথেই বলি—

বলিয়া আবার সে হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমার বাড়ি অ্যানেক ধুর, পাথরঘাটা।

কি নাম বটে তোর? কি জাত?

নাম বটে আমার 'সোরধনি', লোকে ডাকে 'সরা' বলে। আমরা ডোম বটে।

লোকটা খুব খুশি হইয়া বলিয়াছিল, আমরাও ডোম। তা ঘর থেকে পালিয়ে এলে কেনে?

তাহার চোখে আবার জল আসিয়াছিল, সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল, কি বলিবে?

রাগ করে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

না!

তবে?

আমার মা-বাবা কেউ নাইকো কিনা? কে খেতে পরতে দেবে? তাই খেটে খেতে এসেছি হেথাকে।

বিয়ে করিস না কেনে—বিয়ে?

সে অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহাকে—তাহার মত ডাইনীকে—কে বিবাহ করবে? সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তারপর হঠাৎ সে কেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা আজও অকারণে নতশিরে মাটির উপর ক্রমাগত হাত বুলাইয়া ধূলা-কাঁকর জড়ো করিতে আরম্ভ করিল। সকল কথার সূত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে,—মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হঠাৎ সূতা হইতে সূচটা পড়িয়া গেল।

আঃ, কি মশা! মৌমাছির চাক ভাঙিলে যেমন মাছিগুলা মানুষকে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই করিয়া সর্বাঙ্গে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। কই? মেয়েটা আর ছেলেটার কথাবার্তা তো আর শোনা যায় না! চলিয়া গিয়াছে! সন্তর্পণে ঘরের দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া বৃদ্ধা আসিয়া দাওয়ার

উপর বসিল। কাল আবার উহারা নিশ্চয় আসিবে। তাহার ঘরের পাশাপাশি জায়গার মত আর নিরিবিলি জায়গা কোথায়! এ চাকলার কেউ আসিতে সাহস করিবে না। তবে উহারা ঠিক আসিবে। ভালবাসায় কি ভয় আছে!

অকস্মাৎ তাহার মনটা কিলবিল করিয়া উঠিল। আচ্ছা, ঐ ছোঁড়াটাকে সে খাইবে? শক্ত সমর্থ জোয়ান শরীর!

সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া বার বার সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া উঠিল, না না।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে আপন মনে ঢুলিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর উঠিয়া উঠানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়া দিল। সে বাট বহিতেছে! আজ যে সে একটা শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আজ তো ঘুমাইবার তাহার উপায় নাই। ইচ্ছা হয়, এই ছাতি-ফাটার মাঠটা পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। লোকে বলে, সে গাছ চালাইতে জানে। জানিলে কিন্তু ভাল হইত। গাছের উপর বসিয়া আকাশ মেঘ চিরিয়া হু-হু করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত। কিন্তু ঐ মেয়েটা আর ছেলেটার কথাগুলা শোনা হইত না! উহারা ঠিক কাল আবার আসিবে।

হি হি হি! ঠিক আসিয়াছে! ছোঁড়াটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন ঘাড় ফিরাইয়া পথের দিকে চাহিতেছে। আসিবে রে, সে আসিবে!

তাহার নিজের কথাই তো বেশ মনে আছে। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় সেই জোয়ানটি ঠিক পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল। তাহার আগেই আসিয়া বসিয়াছিল, পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আপন মনে পা দোলাইতেছিল। সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

এসেছিস? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি।

বৃদ্ধা চমকাইয়া উঠিল। ঠিক সেই কথা, সে তাহাকে এই কথাটিই বলিয়াছিল। ওঃ, ঐ ছোঁড়াটাও ঠিক সেই কথাটিই বলিতেছে! মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; নিশ্চয় সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সে দিন সে একটা ঠোঙাতে করিয়া খাবার আনিয়াছিল।

তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, কাল তোর মুড়ি পড়ে গিয়েছিল। লে।

সে কিন্তু হাত বাড়াইতে পারে নাই। তাহার বুকের দুর্দান্ত লোভ—সাপের মত তাহার ডাইনী মনটা বেদের বাঁশী শুনিয়া যেন কেবলই দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়াছিল, ছোবল মারিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তারপর সে কি করিয়াছিল? হাঁ মনে আছে। সে কি আর ইহারা জানে, না, পারে? ও মাগো! ঠিক ত'ই। এ ছেলেটাও যে মেয়েটার মুখে নিজে হাতে কি তুলিয়া দিতেছে। বুড়ী দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই হাসি তাহার থামিয়া গেল। সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে স্তব্ধভাবে গাছে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল, ইহার পরই সে তাহাকে বলিয়াছিল—আমাকে বিয়ে করবি সরা?

সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। কিছু বলিতে পারে নাই, কিছু ভাবিতেও পারে নাই। শুধু কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, হাত-পা ঘামিয়া টসটস করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, আমি কলে কাজ করি, রোজগার করি অ্যানেক। তা জাতে পতিত বলে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি?

ঝরনার ধারে প্রণয়ী যুবকটি বলিল, এই গাঁয়ে সবাই হাঁ-হাঁ করবে—আমার জাতগুষ্টিতেও করবে, তোর জাতগুষ্টিতেও করবে! তার চেয়ে চল আমরা পালিয়ে যাই। সেইখানে দুজনার সাঙা করে বেশ থাকব।

মৃদুস্বরে কথা, কিন্তু এই নিস্তব্ধ স্থানটির মধ্যে কথাগুলি যেন স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। বুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহারাও পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিল, —মাড়োয়ারীবাবুর কলের ধারেই একখানা ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহারা বাসা বাঁধিয়াছিল। 'বয়লা' না কি বলে—সেই প্রকাণ্ড পিপের মত

কলটা—সেই কলটায় সে কয়লা ঠেলিত। তাহার মজুরী ছিল সকলের চেয়ে বেশি।

ঝরনার ধারে অভিসারিকা মেয়েটির কথা ভাসিয়া আসিল—উ হবে না। আগে আমার খুঁটে দশটি টাকা তু বেঁধে দে, তবে আমি যাব। লইলে বিদেশে পয়সা অভাবে খেতে পাব না, তা হবে না।

ছি ছি, মেয়েটার মুখে ঝাঁটা মারিতে হয়। এত বড় একটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে, তাহার নাকি খাওয়া-পরার অভাব হয় কোনদিন! মরণ তোমার! রূপার চুড়ি কি, একদিন সোনার শাঁখা-বাঁধা উঠিবে তোমার হাতে। ছি!

ছেলেটি কথার জবাব দিল না, মেয়েটিই আবার বলিল, কি, রা কাড়িস না যি? কি বলছিস্ বল্? আমি আর দাঁড়াতে লারব কিন্তক।

ছেলেটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কি বলব বল? টাকা থাকলে আমি তোকে দিতাম, রূপোর চুড়িও দিতাম, বলতে হত না তোকে।

মেয়েটা বেশ হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গ করিয়াই বলিল, তবে আমি চললাম।

যা।

আর যেন ডাকিস না।

বেশ।

অল্প একটু দূরে যাইতেই সাদা-কাপড়-পরা মেয়েটি ফুটফুটে চাঁদনীর মধ্যে যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। ছেলেটা চুপ করিয়া ঝরনার ধারে বসিয়া রহিল। আহা! ছেলেটার যেমন কপাল! শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটা যে কি করিবে—কে জানে! হয়তো বৈরাগী হইয়াই চলিয়া যাইবে, নয়তো গলায় দড়ি দিয়াই বসিবে। বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল। ইহার চেয়ে তাহার রূপার চুড়ি কয়গাছা দিলে হয় না? আর টাকা? দশ টাকা সে দিতে পারিবে না। মোটে তো তাহার এক কুড়ি টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটা টাকা, না হয় পাঁচটা, সে দিতে পারে। তাহাতে হইব? মেয়েটা আর বোধ হয় আপত্তি করিবে না। আহা! জোয়ান বয়স, সুখের সময়, শখের সময়—আহা। ছেলেটিকে ডাকিয়া রূপার

চুড়ি ও টাকা সে দিবে আর উহার সঙ্গে নাতি-ঠাকুরমার সম্বন্ধ পাতাইবে। গোটাকতক চোখা চোখা ঠাট্টা সে যা করিবে।

মাটিতে হাতের ভর দিয়া কুঁজির মত সে ছেলেটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে, লোকজন আসিলেও খেয়াল নাই। হাসিয়া সে ডাকিল, বলি, ওহে লাগর, শুনছ?

দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথার সাড়ায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল, পর-মুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্তে বৃদ্ধারও একটা অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল; ক্রুদ্ধা মার্জারীর মত ফুলিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল, মর্ মর্—তুই মর্! সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল, ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।

ছেলেটা একটা আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। পর-মুহূর্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্বনাশী ডাইনী বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ছেলেটা সন্ধ্যায় গিয়াছিল ঐ ঝরনার ধারে; মানুষের দেহরসলোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্টা বাঘিনীর মত জানিতে পারিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অতি তীক্ষ্ম একখানা হাড়ের টুকরা মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেই সে কি রক্তপাত! তাহার পরই প্রবল জ্বর; আর কে যেন তাহার মাথা ও পায়ে চাপ দিয়া তাহার দেহখানি ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে!

কিন্তু সে তাহার কি করিবে!

কেন সে পলাইতে গেল? পলাইয়া যাইবে? তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইবে? সেই তাহার মত শক্তিমান পুরুষ—যে আগুনের সঙ্গে

যুদ্ধ করিত—শেষ পর্যন্ত তাহারই অবস্থা হইয়া গিয়াছিল মাংসশূন্য একখানি মাছের কাঁটার মত।

কে এক গুণীন নাকি আসিয়াছে। বলিয়াছে, এই ছেলেটাকে ভাল করিয়া দিবে। তিলে তিলে শুকাইয়া ক্যাকাসে হইয়া সে মরিয়াছিল। রোগ—ঘুসঘুসে জ্বর, কাশি। তবে রক্তবমি করিয়াছিল কেন সে ?

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে উন্মত্ত অস্থিরতায় অধীর হইয়া বৃদ্ধা আপনার উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে ছাতি-ফাটার মাঠ আগুনে পুড়িতেছে নিস্পন্দ শবদেহের মত। সমস্ত মাঠটার মধ্যে আজ আর কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা নাই। বাতাস পর্যন্ত স্থির হইয়া আছে।

যাহাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালবাসিত, কোনদিন যাহার উপর এতটুকু রাগ করে নাই, সেও তাহার দৃষ্টিতে শুকাইয়া নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আক্রোশ, নিষ্ঠুর শোষণ হইতে বাঁচাইবে ঐ গুণীনটা !

হি-হি করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে সে হাসিয়া উঠিল। উঃ, কি ভীষণ হাঁপ ধরিতেছে তাহার। দম যেন বন্ধ হইয়া গেল ! কি যন্ত্রণা, উঃ—যন্ত্রণায় বুক ফাটাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। ঐ গুণীনটা বোধ হয় তাহাকে মন্ত্রপ্রহারে জর্জর করিবার চেষ্টা করিতেছে। কর্, তোর যথাসাধ্য তুই কর্ !

এখান হইতে কিন্তু পলাইতে হইবে। তাহার মৃত্যুর পর বোলপুরের লোকে যখন তাহার গোপন কথাটা জানিতে পারিয়াছিল, তখন কি দুর্দশাই না তাহার করিয়াছিল। সে নিজেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। কলের সেই হাড়ীদের শঙ্করীর সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার কাছেই সে একদিন মনের আক্ষেপে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার পর সে গ্রামের বাহিরে এক ধারে লোকের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া বাস করিতেছে। কত জায়গাই যে সে ফিরিল। আবার যে কোথায় যাইবে !

ও কি ! অকস্মাৎ উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি উচ্চ কান্নার রোল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়া পাগলের মত ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সন্ধ্যার মুখে সে একটি ছোট পুঁটলি লইয়া ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল। পলাইবে—সে পলাইবে।

একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সমস্ত নিথর, নিস্তব্ধ। তাহারই মধ্যে পায়ে পায়ে ধূলা উড়াইয়া বৃদ্ধা ডাইনী পলাইয়া যাইতেছিল। কতকটা দূর আসিয়া সে বসিল, চলিবার শক্তি যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, ওগো, তুমি ফিরে এসো গো!

উঃ, তাহার নরুন-দিয়া-চেরা ছুরির মত চোখের সম্মুখে আকাশের বায়ুকোণটা তাহার চোখের তারার মতই খয়ের রঙের হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পায়ের ধূলার আস্তরণের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কালবৈশাখীর ঝড় নামিয়া আসিল। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! দুর্দান্ত ঘূর্ণি ঝড়। সঙ্গে মাত্র দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি।

পরদিন সকালে ছাতি-ফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরী গুল্মের একটা ভাঙ্গা ডালের স্চালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশ-পথে যাইতে যাইতে ঐ গুণীনের মন্ত্রপ্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখির মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নীচে ছাতিফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মত ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে; ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে!

অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকের দিকচক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতগুলি সঞ্চরমাণ বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।

না

আট বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল যে হত্যাকাণ্ড, তাহারই বিচার। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দীর্ঘ আট বৎসর পরে দায়রা আদালতে তাহারই বিচার হইতেছে। আগামী কাল নিহত কালীনাথের স্ত্রী ব্রজরানীর সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।

ব্রজরানী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে ধ্যানস্তিমিতার মত বসিয়া ছিল; হরদাসবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া একেবারে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন—এই যে ব্রজ।

ব্রজ মুখে কোন উত্তর দিল না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চাহিল মাত্র। হরদাসবাবু বলিলেন, কাল তোর সাক্ষীর দিন। মনকে একটু শক্ত করে নিবি। শেখাবার মত কিছু নেই, কেবল ঘটনাগুলো স্মরণ করে নে ভাল করে। আমি বরং কাল সকালে তোকে তোর প্রথম এজাহারটা ভাল করে শুনিয়ে দেব।

হরদাস আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ভাল করিয়া শুনাইয়া দিবে! মনে করাইয়া দিবে! ব্রজরানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এক বিচিত্র হাসি হাসিল। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ রেখায় পরিস্ফুট নিঃশব্দ হাসি, হাসির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় চোখ দুইটি স্তিমিত হইয়া আসিল; উত্তেজনাহীন স্থির হিমশীতল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিচিত্র সে হাসি!

ব্রজরানীর মনের বাটালির আঘাতে কাটিয়া গড়া পাথরের মূর্তির মত সে ছবি অঙ্কিত হইয়া আছে, সে কি মুছিবার, না, মুছিয়া যায়!

হতভাগ্য নিহত কালীনাথের বিধবা স্ত্রী ব্রজরানী।

উঃ! সে ভীষণ শব্দ! সে যেন মৃত্যুর হুঙ্কার-ধ্বনি। বার বার। হাতটা প্রথম ভাঙ্গিয়া গেল, তারপর আবার, তারপর আবার, বার বার। রক্তাপ্লুত দেহে স্বামী তাহার লুটাইয়া পড়িল তাহার চোখের সম্মুখে।

ব্রজরানী সে মূর্তি স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, সভয়ে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল। স্বামীর সেই,

রক্তাক্ত মূর্তি আজ তাহাকে আতঙ্কিত করিয়া অস্থির করিয়া তোলে। প্রায় রাত্রেই স্বপ্নে সেই মূর্তি দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে, তাহার মা তাহার পাশে শুইয়া গায়ে হাত দিয়া থাকেন, সেই অভয় স্পর্শ নিদ্রার মধ্যেও সে অনুভব করে। সে হাত কিছুক্ষণ সরিয়া গেলেই আতঙ্কে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

ব্রজরানী ত্রস্ত পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইতেই মা প্রশ্ন করিলেন, কি রে? এমন করে—

প্রশ্নের আধখানা বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন, তাঁহার নিজের মনই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে।

ওদিকের বারান্দায় এক ভ্রাতৃবধূ যেন শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, বাপের জন্মে এমন ভয় দেখি নি কিন্তু। আজ আট বছর হয়ে গেল—

মা শাসন-কঠোর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, বউমা!

বধূ মুখ বিকৃত করিয়া একটা ভঙ্গী করিয়া নীরব ইঙ্গিতে বাকি মনোভাবটা প্রকাশ করিয়া তবে ছাড়িল। মা ব্রজরানীকে কাছে বসাইয়া তাহার রুক্ষ চুলের বোঝা লইয়া বসিলেন, পিঙ্গল রুক্ষ চুলে জটিলতার আর অন্ত নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রজরানী আজও তেল ব্যবহার করে নাই।

ব্রজরানীর বড় ভাই হরদাসবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন—মা!

মা মুখ তুলিয়া হরদাসের দিকে চাহিলেন; হরদাস বলিলেন, একটা কথা ছিল মা।

কি বল্?

একটু উঠে এস।

এইখানেই বল্ না।

একটু ইতস্তত করিয়া হরদাস বলিলেন, সেই ভাল। ব্রজরই শোনা দরকার বিশেষ করে। আবার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, মানে—ব্রজরানীর ছোট মামাশ্বশুর আর ওঁদের বেয়াই এসেছেন দেখা করতে!

মামাশ্বশুর? ব্রজরানীর স্বামীহন্তার পিতা আর তাহার শ্বশুর? ব্রজরানীর মায়ের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। ব্রজরানী চঞ্চল

হইয়া মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিল, যেন মামাশ্বশুর কাছেই কোথাও রহিয়াছেন। মা বলিলেন, কেন? কি জন্যে? কি দরকার তার? কেন তিনি বার বার আসেন? উত্তরোত্তর তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল।

হরদাস বলিলেন, বলবেন আর কি? সেই কথা—ক্ষমা। যা হয়েছে তার উপর আর হাত নেই। এখন ভিক্ষা, ক্ষমা—কোন রকমে ক্ষমা—

ক্ষমা—? মা কঠিন হাসি হাসিলেন। তার পর তিনি বলিলেন, তাঁকে বাইরে বাইরে বিদেয় করে দেওয়াই তোমার উচিত ছিল বাবা।

সে কি আর আমি বলিনি মা!—বলেছি—বার বার বলেছি; কিন্তু আমার হাতে ধরে ভদ্রলোক ছাড়েন না। শেষে পায়ে ধরতে উদ্যত।

তা হলে তাঁকে বল গে, ব্রজ আমার আজ আট বৎসর তেল মাখে নি, এই দিনটির জন্যে। ক্ষমা কি করে করবে?

হরদাস নিরব হইয়া রহিলেন, আবার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, আর একটা কথা মা। আমাকে যেন ভুল বুঝো না। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলতে। অনন্তর শ্বশুর বললেন, আমার মেয়ের প্রতি দয়া করতে হবে। যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তার পূরণ আজ ভগবানও করতে পারেন না। তবে মানুষের দ্বারা যেটুকু সম্ভব, যতটুকু পারা যায়—ব্রজর ভবিষ্যৎ আছে, তার ছেলেকে মানুষ করতে হবে—

বাধা দিয়া মা বলিলেন, মানে—টাকা দিতে চান, এই তো?

জ্যা-মুক্ত শরের মত মুহূর্তে ব্রজরানী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইয়া গেল, সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, না।

তারপর দৃঢ়পদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অনন্ত মামাতো ভাই, কালীনাথ তাহার পিতৃস্বসাপুত্র। কালীনাথ বয়সে কিছু বড়। কিন্তু যৌবনের একটা কোঠায় বিশ-ত্রিশের ব্যবধান বন্ধুত্বের সেতুবন্ধনে স্বচ্ছন্দে বাঁধা যায়, এ তো বৎসর-চারেকের ব্যবধান। সেই সেতুবন্ধনে অনন্ত এবং কালীনাথ পরস্পর প্রীতিবদ্ধ হইয়া একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াছিল। ভোর না হইতেই অনন্ত আসিয়া ডাকিল, কালীদা! বাপস্, কি ঘুম তোমার! তাঁহার কাঁধে এক বন্দুক, পকেটে বোঝাই কতুর্জ।

কালীনাথ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিবামাত্র সে উনানের ধারে উনান জ্বালিতে বসিয়া যাইত। কালীনাথ তখন অবিবাহিত, সংসারে বাপ মা ভাই ভগ্নী কেহ নাই, বাড়িটা দুইটি তরুণের খেয়াল ও খুশিমত চলিবার একটি কল্পরাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কালীনাথ মুখ-হাত ধুইতে ধুইতে অনন্ত চা তৈয়ারী করিয়া দুইটি পেয়ালায় পরিবেশন করিয়া ফেলিত, তারপর গত রাত্রের উদ্বৃত্ত পাখির মাংস সহযোগে প্রাতরাশ সারিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরের জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইত। গ্রাম পার হইয়াই কালীনাথ পকেট হইতে ছোট কলকে, সিগারেট মিক্‌শ্চার, আরও দুই-একটা সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিত। অনন্ত তৃষ্ণার্তের মত বলিত, হঁ্যা, দাও, নইলে জমছে না। চোখের টিপ, বুঝছ কি না—ও না হলে ঠিক আসে না।

অনন্ত নিতান্তই অল্পশিক্ষিত; মূর্খ বলিলেও চলে। কালীনাথ শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ-উপাধিধারী; কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেও ঐ নেশায় আসক্ত। শুধু আসক্তই নয়, এ বিষয়ে অনন্তর গুরু সে-ই। তাহাদের দুইজনের মিলনের সেতুবন্ধনে এই বস্তুটিই ছিল কাঠামো।

একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অনন্ত রিপীটারটা খুলিয়া একেবারে ছয়টা কার্তুজ ভর্তি করিয়া বলিত, বাস্‌। চল এইবার। হাত কিন্তু আমার নিশপিশ করছে, কি মারি বল তো?

দে, একটা মানুষই মেরে দে।

বেশ, দাঁড়াও তুমি, এখানে মানুষের মধ্যে তুমি। অনন্ত বন্দুকটা তুলিয়া ধরিত। কালীনাথ সভয়ে সরিয়া গিয়া বলিত, এই, এই অনু, ওসব ভাল নয় কিন্তু। বাবা! ও হল যমদ্বার, চাবি টিপলেই দোর খুলে যাবে।

অনু হি-হি করিয়া হাসিয়া বন্দুকটা ফিরাইয়া লইত; কালীনাথ একটা গ্রামান্তরযাত্রী কুকুরকে অথবা আকাশচারী কোন পাখিকে দেখাইয়া দিত—ওই মার্‌ না, মারবার জানোয়ারের আবার অভাব! অনন্ত মুহূর্তে বন্দুকটা তুলিয়া ধরিত। প্রান্তরের অনভ্যস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে অপরিচিত দুইজন মনুষের হাতে লাঠির মত অস্ত্রটাকে দেখিয়া ভীত কুকুরটার লেজ আপনি নত হইয়া আসিত, ভীত মৃদু শব্দ করিয়া সে

ছুটিয়া পলাইত, কিন্তু অনন্তর লক্ষ্য অব্যর্থ। গতিশীল জীবটা কোন-না কোন অঙ্গে আহত হইয়া আর্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িত, কখনও মরিত, কখনও মরিত না। না মরিলে কালীনাথ বলিত, দে, আমাকে দে তো বন্দুকটা, বড় জানোয়ার—হাতের টিপ করে নিই।

কিছু দূরে দাঁড়াইয়া গুলির পর গুলি ছুঁড়িয়া সেটাকে সে বধ করিয়া হাসিয়া বলিত, একেই বলে কুকুর-মারা, অ্যাঁ!

চুপ।

কি?

মাথার উপর পাখার শব্দ শুনছ! হরিয়ালের পাখার শব্দ। বসে পড়, গুঁড়ি মেরে বসে পড়।

তারপর বন্দুকের শব্দে, পাখির ভয়ার্ত কলরবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি চকিয়া আলোড়িত হইয়া উঠিত। পিছনে জুটিত ছেলের দল, তাহারা হত্যার আনন্দ উপভোগ করিত, আর সংগ্রহ করিত কার্তুজের খালি খোল।

একসঙ্গেই দুইটি বিবাহের উদ্যোগ হইয়াছিল। ব্রজরানীর পিতার বংশ চাকুরের বংশ—দুইপুরুষ সরকারী চাকরি করিয়া বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা খুঁজিতেছিলেন—প্রতিষ্ঠিতনামা ধনীর ঘরের ছেলে। ওদিকে কলিকাতার নিকটবর্তী এক প্রাচীন জমিদার-বাড়ি আধুনিক-আলোকপ্রাপ্ত হইয়া খুঁজিতেছিলেন—বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের পাত্র। সন্ধানী ঘটক দুই বিভিন্ন স্থান হইতে এই দুই সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করিল। এক পক্ষের জন্য অনন্ত ও অন্য পক্ষের জন্য কালীনাথকে সে খুঁজিয়া বাহির করিল। অনন্ত খুশী হইয়া বলিল, দাদা, তোমার পাত্রী দেখতে যাব আমি, আর আমার পাত্রী দেখতে যাবে তুমি।

কালীনাথ অনন্তর পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল, এক্সেলেণ্ট আইডিয়া! বহুৎ আচ্ছা ব্রাদার আমার রে।

ব্রজরানীকে দেখিয়া কালীনাথ মুগ্ধ হইয়া গেল! তারপর সে দুইখানি বেনামী পত্র লিখিয়া বসিল। ব্রজরানীর পিতাকে লিখিল, বড়লোকের ছেলে অনন্ত—তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে নেশাখোর

দুর্দান্ত, গোঁয়ার, সকল রকম নেশাতেই সে অভ্যস্ত, তাহার উপর চরিত্রহীন।

আর তাহার যেখানে সম্বন্ধ চলিতেছিল, সেখানে লিখিল, কালীনাথ এম এ পাশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু নিতান্ত হাঘরে বংশের ছেলে। তাঁহার পিতা সরকারী চাকরি করিয়া যাহা রাখিয়াছেন, তাহা মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষেও অকিঞ্চিৎকর। আরও একটি কথা, ছেলেটি বড় হীন স্বভাবসম্পন্ন। হীনতাটা তাহাদের বংশানুক্রমিক। পাঠ্যজীবনে কয়েকবার সহপাঠীদের বই চুরি করিয়া সে ধরা পড়িয়াছে। জ্ঞাতার্থে জানাইলাম, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।

তারপর ঘটকের চেষ্টায় ঘটিল অনুরূপ। সম্বন্ধ অদল-বদল হইয়া গেল। ঘটক বর্ণনা করিল, কালীনাথের অবস্থা বেশ ভালই, অর্থাৎ সূর্য থাকিলে যেমন চন্দ্রকে দেখা যায় না তেমনই মাতুল বংশ বিদ্যমান থাকিতে ভাগিনেয় চোখে পড়ে না—অন্যথা চন্দ্রই তমোনাশ করিতে পারিত। আর অনন্ত পাস না করিলেও লেখাপড়া বেশ ভালই করিয়াছে, তাঁহাদের ডিগ্রীর প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন বিদ্যার। অতঃপর বিদ্বান কাহাকে বলে, সে বিষয়ে বক্তৃতাও সে খানিকটা করিল। ফলে পাত্রী ও পাত্র পরিবর্তন করিয়া দুইটি বিবাহই হইয়া গেল।

মাটির নীচে অন্ধকার রাজ্যের অধিবাসী উই ; মধ্যে মধ্যে আলোক কামনায় তাহাদের পক্ষোদ্গম হইলে আর রক্ষা থাকে না, তাহারা পিচকারির মুখে জলের মত গহ্বর পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয়। পাখার শক্তি অপেক্ষা অহঙ্কারই হয় অধিক। অনন্তর শ্বশুরদের অনেকটা সেই অবস্থা। রক্ষণশীল জমিদার-বাড়ির সকলে অকস্মাৎ অবরোধ ঘুচাইয়া আলোকের নেশায় ঐ পতঙ্গগুলির মতই ফরফর করিয়া উড়িতেছে।

ফুলশয্যার রাত্রেই বধূটি প্রশ্ন করিল, তোমার পড়ার ঘর বুঝি বাইরে ?

অনন্ত প্রশ্নটা বেশ বুঝিতে পারিল না, বধূর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, পড়ার ঘর ?

বধূটি সলজ্জভাবে নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল, তোমার লাইব্রেরির কথা জিজ্ঞেস করছি আমি।

লাইব্রেরি! তারপর সোজাসুজি ঘাড় নাড়িয়া সে বলিয়া দিল,

ওসব লাইব্রেরী-টাইব্রেরির ধার-টার ধারি নে আমি। বছরে সরস্বতীর পুজো এক দিন—পাঁঠা কাটি, ফিষ্টি করি, বাস।

বধূ স্তম্ভিত হইয়া অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে যে সেই শুইল, আর সাড়াও দিল না, উঠিলও না। সাধ্যসাধনার মধ্যে অনন্ত আবিষ্কার করিল, সে কাঁদিতেছে।

কাঁদছ কেন? হল কি? শুনছ?

বধূ নিরুত্তর। অনন্ত আবার প্রশ্ন করিল, কি হল বলবে না? লক্ষ্মী, শোন, কথার উত্তর দাও।

ওগো, আমাকে আর জ্বালিয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি।

কাতর কণ্ঠস্বরের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিরক্তির সুর গোপন ছিল না। অনন্ত একটু আহত না হইয়া পারিল না। তবুও সে আবার প্রশ্ন করিল, কি হল সেইটে বল না?

আমার মাথা ধরেছে। এবার বেশ পরিস্ফুট বিরক্তির সহিতই বধূ জবাব দিয়া বসিল। অনন্তও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ রাত্রি। শুধু তাহাদের বাড়ির পাশের সারিবদ্ধ নারিকেলগাছ-গুলির কোন একটির মাথায় বসিয়া একটা পেচক কর্কশ স্বরে ডাকিতেছে। অনন্ত বিরক্ত হইয়া সরিয়া আসিল, তারপর অকস্মাৎ তাহার খেয়াল হইল. কালীদাদা কি করিতেছে দেখিয়া আসিলে হয় না!

কালীনাথের বিবাহও এই বাড়ি হইতেই অনুষ্ঠিত হইতেছিল। বিবাহের আচার অনুষ্ঠান শেষ হইলে বর-বধূ আপনাদের বাড়িতে গিয়া সংসার পাতিবে। অনন্ত কালীনাথের ফুলশয্যাগৃহের দরজায় আসিয়াই শুনিল, ভিতরে স্বামীস্ত্রীতে আলাপ চলিতেছে। সে কৌতুকপরবশ হইয়া কান পাতিল।

কালীনাথ বলিতেছে, তোমায় আমি রানী বলেই ডাকব। আমার হৃদয়-রাজ্যের রানী তুমি।

দূর, সে আমার লজ্জা করবে। তার চেয়ে সবাই যা বলে, তাই বলবে—ওগো।

সে তো সকলের সামনে বলতেই হবে। কিন্তু তুমি আর আমি যেখানে শুধু, সেখানে বলব—রানী।

অনন্ত কালীনাথকে আর ডাকিল না, আপনার ঘরে আসিয়া আবার জানালার ধারে দাঁড়াইল। তাহার ভাগ্য! নতুবা এই মেয়ে তো তাহার স্কন্ধে পড়িবার কথা নয়!

নারিকেলগাছের মাথার পেচকটা কর্কশ স্বরে আবার ডাকিয়া উঠিল। অকস্মাৎ অনন্তর সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল ঐ কর্কশকণ্ঠ নিশাচর পাখিটার উপর। সে ঘরের কোণ হইতে তাহার রিপীটারটা লইয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। আকস্মিক ভীষণ শব্দগজনে রাত্রিটা কাঁপিয়া উঠিল, নারিকেলগাছের মাথাটায় একটা আলোড়ন বহিয়া গেল, কি একটা নীচে সশব্দে খসিয়াও পড়িল।

পিত্রালয়ে আসিয়া বধূটির পুঞ্জিত ক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। তাহার মুখ দেখিয়াই মা একটা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তিনি একান্তে ডাকিয়া মেয়েকে প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁরে, তোর মুখ এমন ভার কেন রে?

মুহূর্তে কন্যা জ্বলিয়া উঠিল অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত—শেষকালে অশিক্ষিত মূর্খের হাতে আমাকে সঁপে দিলে তোমরা! একটা ফোর্থ ক্লাসের ছেলে যা লেখাপড়া জানে, ও তাও জানে না।

মা স্তম্ভিত হইয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; মেয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, সকাল থেকে ব্যাধের মত পাখি মেরে মেরে বেড়ায়। গুণ্ডার মত একে মারা, ওকে চাবকে শাসন করা হল গৌরবের কাজ।

অনন্ত বাহিরে বেশ গম্ভীর ভাবেই বসিয়া ছিল, সহসা তাহার এক শ্যালক একখানা ইংরেজি বই আনিয়া বলিল, এই জায়গাটা বুঝিয়ে দিন না জামাইবাবু।

অনন্ত রহস্য-যবনিকার বহির্ভাগেই ছিল; কিন্তু একটি ছোট শ্যালিকা আসিয়া একখানা ইংরাজী খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া সে যবনিকা ছিন্ন করিয়া দিল। বলিল, পড়ুন জামাইবাবু।

মুহূর্তে সমস্ত বিষয়টা অনন্তর চোখের সম্মুখে আলোকিত পৃথিবীর মত পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। মাথার মধ্যে ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল আগুনের শিখার মত! কিন্তু কোন উপায় ছিল না, সে নীরবে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

দিনে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করিবার জন্য একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, একটা কথা বলছিলাম বাবা, মানে—তোমার শ্বশুরের ইচ্ছে, আমারও ইচ্ছে—তুমি এখন কলকাতায় থাক। আমার বড় ছেলে থাকে কলকাতায়, বাসাও রয়েছে—সেখানে থেকে পড়াশুনা কর।

অনন্তর ইচ্ছা হইল, সে দৃপ্ত হুঙ্কারে বলিয়া উঠে—না, না, না। কিন্তু তাহা সে পারিল না। চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া রহিল। শাশুড়ী অনন্তর নীরবতায় সন্তুষ্ট হইয়াই চলিয়া গেলেন। 'হাঁ' না বলিলেও বলাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

অপরাহ্ণে শ্বশুর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, সেই কথাই লিখে দিলাম তোমার বাবাকে। সেই ভাল, এত অল্পবয়সে চুপচাপ বসে থাকা ভাল নয়। An idle brain is the devil's workshop—কলকাতায় থেকে পড়াশুনো কর।

অনন্ত কোন কথা না বলিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া একেবারে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জিনিসপত্র সব পড়িয়া রহিল! সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল এবং বাড়ি ফিরিয়া যেন আক্রোশভরেই নেশা আরম্ভ করিল।

অকস্মাৎ একদিন অনন্তর পিতা ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে স্ত্রীকে বলিলেন, আমি অনন্তর বিয়ে দোব আবার। ছোটলোকের মেয়ে—মেয়ের বাপ হয়ে চিঠি লিখেছে দেখ না! আস্পর্ধা দেখ দেখি—লিখেছে, আমরা নাকি মূর্খ ছেলের বিবাহ দেবার জন্যে কালীনাথের নামে অপবাদ দিয়ে বেনামী চিঠি দিয়েছি! তুমি চিঠি লিখে দাও বেয়ানকে, মেয়ে যদি না পাঠিয়ে দেয়, ছেলের বিয়ে দেব আমি। চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিয়া তিনি ক্রোধভরেই বাহির হইয়া গেলেন।

অনন্ত ছিল পাশের ঘরেই। সমস্তই সে শুনিয়াছিল, বাপ বাহির হইয়া যাইতেই সে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া মায়ের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া চিঠিখানা কাড়িয়া লইল।

নিতান্ত কটুভাষায় ঐ অভিযোগ করিয়া পত্রখানা লেখা। পরিশেষে লেখা—প্রমাণস্বরূপ বেনামী পত্রখানাও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ পত্র আপনাদের ইঙ্গিতক্রমেই লেখা হইয়াছিল।

বেনামী পত্রখানা উল্টাইয়াই অনন্ত চমকাইয়া উঠিল, এ কি! এ যে অত্যন্ত পরিচিত হাতের লেখা! এ যে, এ যে—। শ্বশুরের পত্রখানা মায়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সে বেনামী পত্রখানা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল। একেবারে কালীনাথের বাড়ি আসিয়া ডাকিল, কালীদা!

কে, অনু? আয় আয়।

অনন্ত আসিতেই ব্রজরানী ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া গেল। অনন্ত লক্ষ্য করিল, বাড়ির চারিদিকে একটি লক্ষ্মীশ্রী, সুপ্রসন্ন শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতায় যেন উছলিয়া পড়িতেছে।

কালীনাথ বলিল, আর তুই আসিসই না!

এলে খুশী হও কি না সত্যি বল দেখি?

হা-হা করিয়া হাসিয়া কালীনাথ সে কথার উত্তরটা আর দিলই না।

অনন্ত প্রশ্ন করিল, বউ খুব ভাল হয়েছে, না?

অকপট প্রসন্নমুখে কালীনাথ বলিল, রানীর গুণ একমুখে বলে শেষ করতে পারব না অনু। দেখছিস না ঘরদোরের অবস্থা। তুইও বউকে এইবার নিয়ে আয় বুঝলি?

অনন্ত চুপ করিয়া রহিল। কালীনাথ বলিল, তারপর হঠাৎ কি মনে করে এমন অসময়ে এলি বল্ তো?

অনন্ত বেনামী চিঠিখানা কালীনাথের হাতে দিয়া বলিল, চিঠিখানা দেখাতে এসেছি তোমাকে। দেখাতে কেন, দিতেই এসেছি। চিঠিখানা তুমি রাখ; আমার শ্বশুর পাঠিয়েছেন বাবার কাছে।

কালীনাথের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। অনন্ত আর অপেক্ষা করিল না, উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু দরজা হইতে বাহির হইবার মুখেই পিছন হইতে কে ডাকিল, ঠাকুরপো!

অনন্ত পিছন ফিরিয়া দেখিল, ব্রজরানী জলখাবারের থালা হাতে তাহাকে ডাকিতেছে। অনন্তর আর যাওয়া হইল না, সে ফিরিল—বউদির হাতের খাবার তো ফেলে যাওয়া হতে পারে না! কি বল কালীদা? বউদি আমার স্বর্গের দেবী—তার হাতের জিনিস, এ যে অমৃত!

কালীনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই অনন্তর স্ত্রী একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর পিতা চরম-পত্রই পাঠাইয়াছিলেন, সেই পত্রের ফলে আলোকপ্রাপ্ত হইয়াও বধূর পিতা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মেয়েকে পাঠাইয়া দিলেন।

ফুটবল টীম লইয়া অনন্তর সেদিন ম্যাচ দেখিতে যাইবার কথা। সকালবেলাতেই বধূকে এমন অযাচিতভাবে আসিতে দেখিয়া মনটা তাহার উল্লাসে ভরিয়া উঠিল। সে স্থির করিল, সে আজ আর যাইবে না। কিন্তু সে-ই টীমের সর্বশ্রেষ্ঠ হাফব্যাক, তাহার উপর সে-ই ক্যাপ্টেন। মনটা তাহার খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। অবশেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল, খেলা শেষ হওয়ার পরেই সে ট্যাক্সি করিয়া ফিরিয়া আসিবে—ত্রিশ মাইল রাস্তা বই তো নয়? ট্যাক্সি না পাওয়া গেলে বাইসিক্ল আছে। রাত্রির অন্ধকারকে সে ভয় করে না।

সে পুলকিত চিত্তে বাড়ির ভিতর আপনার শয়নকক্ষে গিয়া উঠিল। বধূটি পিছন ফিরিয়া কি যেন করিতেছিল, অনন্ত সন্তর্পিত পদক্ষেপে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। চকিত হইয়াই মুখ তুলিয়া অনন্তকে দেখিয়া সে সবলে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ছাড়।

হাসিয়া অনন্ত বলিল, এত রাগ কেন?

রাগ নয়; ছাড় তুমি।

রীতিমত রাগ! কিন্তু আমি তো আবার বিয়ে করব লিখি নি। বাবা লিখেছিলেন, বিয়ে দেব।

ছাড়, বলছি—ছাড়। নইলে আমি চীৎকার করব বলছি।

অনন্ত স্ত্রীকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু তোমার এমন ব্যবহার কেন?

বধূ সে কথার কোন উত্তর দিল না, ক্রুদ্ধ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকেই শুধু চাহিয়া রহিল। অনন্ত আবার বলিল, ওই তো কালীদাদার বউ, তার ব্যবহার দেখে এস, স্বামীকে সে কত ভক্তি—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বধূ বলিয়া উঠিল, কার সঙ্গে নিজেকে তুমি তুলনা করছ? শিবে আর বাঁদরে! সে বিদ্বান—

অনন্ত আর দাঁড়াইল না; হনহন করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। একেবারে আস্তাবলে গিয়া ডাকিল, নেত্য!

নিত্য সহিস কয়েকজন বন্ধুবান্ধব জুটাইয়া গোপনে চোলাই-করা-মদ খাইতেছিল, অসহিষ্ণু অনন্ত একেবারে দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া বলিল, হাণ্টার কই ?

হাণ্টারগাছটা লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে সে আবার ফিরিল—দেখি রে ?

নিত্য বুঝিতে না পারিয়া বলিল, আজ্ঞে ?

ওই বোতলটা।—বলিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া বোতলটা তুলিয়া লইয়া খানিকটা গিলিয়া ফেলিল। নির্জলা হলাহল বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার মত জ্বালা ধরাইয়া দিল—মাথার মধ্যে ক্রোধ হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে আবার দ্রুতপদে অন্দরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, কি বল্‌ছিলে, বল এইবার।

সে মূর্তি দেখিয়া বধূটি স্তম্ভিত হইয়া গেল, পরক্ষণেই সুরার গন্ধে ক্ষোভে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি মদ খাও? মাতাল তুমি ?

হ্যাঁ, খাই ; মদ খাই, গাঁজা খাই, সব খাই। তোমার বাপের পয়সায় খাই ?

আত্মবিস্মৃতা বধূ বর্ধিততর ক্ষোভে বলিয়া ফেলিল, মাতাল, মুখ্যু, বেরোও—

কথা তাহার অসমাপ্তই থাকিয়া গেল, হাণ্টারের আঘাতে তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। হাণ্টারের পাকানো কশাখানি তীক্ষ্ণ আঘাতে বাহুমূল হইতে সমস্ত হাতখানা দীর্ঘরেখায় কাটিয়া গিয়াছে। অনন্ত হাণ্টার হাতে করিয়াই তরতর করিয়া নামিয়া গেল।

ফুটবল টীম লইয়া যাত্রার পথে ক্ষুধা অনুভব করিয়া সে আসিয়া উঠিল কালীনাথের বাড়ি—কালীদা !

কালীনাথও বাহির হইতেছিল, সে বলিল, এই যে, আমি যে যাচ্ছিলাম তোর কাছে।

অনন্ত বলিল, সে সব পরে শুনব। বউদি কই ? বউদি ?

তোমার বউদির হুকুমেই যাচ্ছিলাম ; তার ব্রত আছে, তোমায় তার ব্রাহ্মণ করেছে।

সে হবে! কিন্তু এখন কিছু খেতে দাও তো বউদি।

ব্রজরানী অদূরে আসিয়াই দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, সে কি, আজ তোমার বউ এসেছে—

আঃ বৌদি, থাক না ও-কথা। এখন তুমি খেতে দেবে কিছু? বল, না তো অন্যত্র চেষ্টা দেখি। আমার সময় নেই, তোমার বাপের বাড়ির শহরে যাচ্ছি—ম্যাচ খেলতে।

ব্রজরানী ব্যস্ত হইয়া থালায় জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া নামাইয়া দিল। কালীনাথ প্রশ্ন করিল, ফিরবি কবে? পরশু যে তোর বউদির ব্রত।

ক্ষুধার শান্তিতে প্রসন্নভাবেই অনন্ত বলিল, কাল সকালে। পরশুর জন্যে ভাবনা কি? কিন্তু ব্রতটা কি?

লজ্জিত হইয়া ব্রজরানী নতমুখী হইয়া রহিল। উত্তর দিল কালীনাথ, অবৈধব্য-ব্রত, অর্থাৎ আমার আগে মরবার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছেন আর কি!

বাঃ। মেয়েদের এই ধারণাটা আমার ভারি ভাল লাগে কালী-দা। তারপর ব্রজরানীর মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, বউদি স্বর্গের দেবী তুমি।

লজ্জিতা ব্রজরানী প্রসঙ্গান্তর আনিয়া বলিল, আমার বাপের বাড়িতে গিয়ে কিন্তু তুমি যেন উঠো ঠাকুরপো। নইলে ঝগড়া হবে। আমারও উপকার হবে, ওঁদের খবর পাব। কদিন খবর পাই নি।

ম্যাচ জিতিয়াও অনন্তর মনটা ভাল ছিল না। প্রভাতের সেই তিক্ত স্মৃতি তাহার মনকে অহরহ পীড়া দিতেছিল। সে অবসন্নভাবেই ব্রজরানীর পিত্রালয়ের বাহিরের ঘরে নির্জীবের মত শুইয়া ছিল। ব্রজরানীর অনুরোধমত সে এইখানেই আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে। দলের সকলে দারুণ আপত্তি করিয়াছিল—না, না,সে হবে না ভাই। জিতলাম ম্যাচ, সমস্ত রাত আজ হৈ-হৈ করব, ফুর্তি করব। তুমি ক্যাপ্টেন—তুমি না থাকলে চলে।

সবিনয়ে হাতজোড় করিয়া অনন্ত বলিয়াছিল, সে হয় না ভাই। আমি কথা দিয়ে এসেছি বউদিকে।

বেশ। তবে একটু খেয়ে যাও। তাহারা বোতল গ্লাস বাহির করিয়া বসিল; কিন্তু জিব কাটিয়া অনন্ত বলিল, ছি, তাই হয়? কুটুম্বলোক!

বার বার অনন্তর চোখ ভরিয়া জল আসিতেছিল। মনটা যেন উদাস হইয়া গিয়াছে। ব্রজরানীর মা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, ব্রজ আমার ভাল আছে বাবা?

তাড়াতাড়ি অনন্ত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, হ্যাঁ মাউই-মা, বউদি ভালই আছে।

ব্রজ আমার সুখ্যাতি নিয়েছে তো বাবা? তোমাদের যত্ন-আত্তি করে তো?

উচ্ছ্বসিত হইয়া অনন্ত বলিল, এ যুগে এমন মেয়ে হয় না মাউই-মা। সতী-সাবিত্রী বইয়ে পড়েছি—বউদির মধ্যে চোখে দেখলাম।

ব্রজরানীর মা পরম তৃপ্ত হইয়া বলিলেন, বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘায়ু হও। তোমরা নিজেরা ভাল, তাই সেই দৃষ্টান্তে ব্রজ আমার ভাল হতে পেরেছে। অতঃপর বেয়াই-বেয়ানদের প্রণাম জানাইতে অনুরোধ করিয়া তিনি বিদায় লইলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি একটা বাটিতে দুধ লইয়া প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, বাবা!

অনন্তর মন তখন আপনার শ্বশুরবাড়ির সহিত এই বাড়িটার তুলনা করিতে ব্যস্ত ছিল, সে কোনও সাড়া দিল না। ভাল লাগিল না তাহার। ব্রজরানীর মা তাহার নিস্তব্ধতা দেখিয়া আপন মনেই বলিল, খেলাধুলো করে নিথরে ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা।

তিনি আবার বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ির ভিতরে হরদাস প্রশ্ন করিলেন, ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

হ্যাঁ, ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, আর ডাকলাম না।

ওঃ, খুব খেলেছে ছোকরা। ভাল খেলে। স্বাস্থ্যও ভাল—বেশ ছেলে।

মা বলিলেন, ভারি মিষ্টি কথা; ব্রজের কথা বলতে একেবারে পঞ্চমুখ। ভাল বংশের ছেলে। সেই চিঠিটা কিন্তু তা হলে কেউ হিংসে করে লিখেছিল। মাতাল, নেশাখোর, চরিত্রহীন, গোঁয়ার। দেখে তো মনে হয় না। তুই হাসছিস যে?

হাসছি।

কেন, তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

সে চিঠিখানা কিন্তু কালীনাথের হাতের লেখা। কালীনাথের এখনকার চিঠির লেখার সঙ্গে চিঠি মিলিয়ে দেখেছি আমি। ব্রজকে ও দেখতে এসেছিল তো—খুব পছন্দ হওয়ায় এই কাণ্ড সে করেছিল।

তা ব্রজর আমার তপস্যা ভাল। কালীনাথ আমার রূপে গুণে জামাইয়ের মত জামাই! ,ব্রজ বলতে পাগল।

অনন্তর মাথার ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করিয়া উঠিল। শেষরাত্রে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে স্থির করিল, সে পড়াশুনাই করিবে। জীবনে প্রশংসা, শান্তি এ তাহার চাই—তাহার জন্য তপস্যার প্রয়োজন হয়, সে তপস্যাই করিবে। সর্বান্তঃকরণে সে কালীনাথকে মার্জনা করিল, ব্রজরানীকে বার বার মনে মনে আশীর্বাদ করিল—তুমি চিরসুখী হও, চিরায়ুষ্মতী হও।

বাড়িতে আসিয়াই কিন্তু তাহার সব গোলমাল হইয়া গেল। দারুণ ক্রোধে তাহার পিতা বলিলেন, তোর মুখ দেখতে চাই না আমি। তুই আমাদের বংশের কলঙ্ক। তোর থেকে এত বড় বাড়ির মান গেল, মর্যাদা গেল। তুই মরলি না কেন?

কালই অনন্তর বধূ যে লোকের সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই লোকের সঙ্গেই পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। অনুনয় উপরোধ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া শেষ পর্যন্ত পুলিসের সাহায্য লইতে উদ্যত হইলে, এ-পক্ষ নীরবে পথ মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বধূটি যে কটু কথাগুলি বলিয়াছে, তাহার তীক্ষ্ণতায় মর্মাহত অনন্তর জননীর চোখের জল এখনও শুকায় নাই। অনন্তর সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। তবুও সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিল, আমি চললাম।

কোথায়?

শ্বশুরবাড়ি।

মা আর্তস্বরে বলিলেন না, না।

ভয় নেই মা। আমি শ্বশুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব।

সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, সেই বস্ত্রে, সেই অভুক্ত অবস্থায়। মা পিছনে পিছনে আসিয়াও পিছন-ডাকার অমঙ্গল ভয়ে আর ডাকিতে পারিলেন না।

শ্বশুরবাড়িতে আসিয়াই সে সত্য-সত্যই শ্বশুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল। শ্বশুর মুহূর্তে পা দুইটা টানিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া লাফ দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, হাণ্টার উদ্যত করিয়া রক্তচক্ষু শ্বশুর। অনন্ত এবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল, হাণ্টারের আস্ফালিত রজ্জুশিখা বার বার তাহার দেহখানাকে জর্জরিত করিয়া দিল। জামা ছিঁড়িয়া সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

বেরোও আমার বাড়ি থেকে—বেরোও।

অনন্ত স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

হাতের হাণ্টারগাছটা ফেলিয়া দিয়া গৃহকর্তা হাঁকিলেন, দারোয়ান! নিকাল দো ইস্‌কো। তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দারোয়ান আসিতে অনন্ত দ্রুতপদে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মাথার মধ্যে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠিল—সমস্ত সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল। সে স্থির করিল, বাড়ি হইতে রিভলভারটা লইয়া, ফিরিয়া ঐ দাম্ভিক জানোয়ারটাকে হত্যা করিবে, তারপর সে নিজে আত্মহত্যা করিবে। বাড়ির স্টেশনে নামিয়া দেখিল, তাহাদের লোকজন পালকি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। বধূ লইয়াই সে ফিরিবে, এমন প্রত্যাশাই সকলে করিতেছে। বাড়ির সরকার অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, বউমা—

আসেন নি।

এ কি ছোটবাবু! সর্বাঙ্গে—! সরকার শিহরিয়া উঠিল।

অনন্ত দ্রুত স্টেশন ত্যাগ করিয়া মাঠের রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

সকলের অলক্ষিতে একটা অব্যবহার্য সিঁড়ি দিয়া সে উপরে আসিয়া উঠিল। রিভালভারটা কোথায়? মুহূর্তে অব্যবস্থিত চিত্তে তাহার খেয়াল হইল, শ্বশুরকে হত্যা করিয়া কি হইবে? কন্যার বৈধব্যের যাতনা ভোগ করিবে কে? বার বার তাহার মন বলিল, সেই ভাল। সে আপনার পরম প্রিয় রিপীটারটা তুলিয়া লইল। তুলিয়া দেখিল, কয়টা কার্তুজ ভরাই আছে।

ঘরে—এই ঘরে? না, একবার কোনক্রমে ব্যর্থ হইলে তখন আর উপায় থাকিবে না। কোন নির্জন প্রান্তরে। আত্মহত্যার সঙ্কল্প লইয়া

স্লিপীটারটা হাতে করিয়াই অলক্ষিতে সে আবার বাহির হইয়া পড়িল। বিহ্বলের মত কোন্ দিকে কোন্ পথে সে চলিয়াছিল—খেয়াল ছিল না।

অনু! অনু!

কালীনাথের বাড়ির জানালায় অনন্তর প্রতীক্ষায় ব্রতচারিণী ব্রজরানী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীনাথ জল খাইতে বসিয়াছে, জল খাইয়াই অনন্তকে সে ডাকিয়া আনিবে। ওপাশে ব্রতের আয়োজন সাজানো। ব্রজরানীর চোখে পড়িল, অনন্ত বন্দুক-হাতে চলিয়াছে। সে বলিল, ওগো, অনু ঠাকুরপো পথ দিয়ে যাচ্ছে।

কালীনাথ ডাকিল, অনু! অনু!

কে? কালীনাথ? অনন্তের মস্তিষ্কের অগ্নিশিখার উপর যেন ঘৃতাহুতি পড়িয়া গেল; সহস্র শিখায় লেলিহান হইয়া সে জ্বলিয়া উঠিল। কালীনাথ! তাহার জীবনের কুগ্রহ—তাহার সুখে পরম সুখী কালীনাথ! কালীনাথ! কালীনাথ—তাহার জীবনের সাথী কালীনাথ! একা সে কোথায় যাইবে।

অনন্ত বাড়ির মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া বলিল, এই যে!

হা-হা করিয়া হাসিয়া কালীনাথ বলিল, এসেই বন্দুক হাতে?

কুকুর মারা মনে পড়ে? তেমনই করে মারব তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা সে তুলিয়া ধরিল। ব্রজরানী আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কালীনাথ সভয়ে বন্দুকের নলটা চাপিয়া ধরিয়া অন্য দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, অনু, ক্ষমা—ক্ষমা—

ভীষণ গর্জনে মৃত্যু তখন হুঙ্কার দিয়াছে। কালীনাথের যে হাতখানা নলটা চাপিয়া ধরিয়াছিল সেটা ভাঙিয়া গেল। ব্রজরানী কালীনাথকে সবলে আকর্ষণ করিয়া চীৎকার করিল, ঠাকুরপো!

আবার বন্দুকটা গর্জিয়া উঠিল, কালীনাথ পড়িয়া গেল, কিন্তু তখনও সে জীবিত। আবার। কালীনাথের রক্তাপ্লুত দেহ নিস্পন্দ নিথর।

অনন্ত দ্রুত বাহির হইয়া গ্রাম পার হইয়া প্রান্তরে পড়িল, তারপর এক স্থানে দাঁড়াইয়া বন্দুকের নলটা মুখে পুরিয়া পা দিয়া ঘোড়াটা

টানিয়া দিল। খট করিয়া একটা আওয়াজই হইল শুধু। এ কি! বন্দুকটা তুলিয়া কার্তুজের ঘর খুলিয়া অনন্ত দেখিল, শূন্য। নাই, আর নাই। তিনটি কার্তুজই ছিল, ফুরাইয়া গিয়াছে। যাক, দড়ি তো আছে। কাপড় ছিঁড়িয়া দড়ি যে সহজেই হইবে।

পরক্ষণেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বন্দুকটা ফেলিয়া দিয়া সভয়ে সে ছুটিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মূর্তি—ঐ যে রক্তাক্ত বিকৃতমূর্তি কালীনাথ ভাঙা হাতে ফাঁসির দড়ি লইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

প্রাণপণে সে ছুটিল।

ধরা পড়িল সে দশ দিন পরে বাংলার বাহিরে একটা দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে। সে তখন ঘোর উন্মাদ। আট বৎসর পাগলা গারদে থাকার পর প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, দায়রা-আদালতে সেই বিচার হইতেছে। কাল ব্রজরানীর সাক্ষ্য দিবার দিন।

আজ আট বৎসর ব্রজরানী অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছে। তৈলহীন স্নান, আপন হাতে হবিষ্যান্ন আহার, মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া সে এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

হরদাসকে মা বলিলেন, বুঝলাম সব বাবা। এই রাত্রি তিন প্রহর হয়ে গেল; একে একে অনন্তর মা বউ সকলে এলেন। কিন্তু উপায় কই? সে তো কথা শুনলে না। দেখে আয়, চোখ বুজে বসে আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে; চোখ খুলে সে তাকালে না পর্যন্ত। নইলে যা হবে হোক, ছেলেটার তো একটা ভবিষ্যৎ হত!

বলিতে ভুলিয়াছি কালীনাথের মৃত্যুর সময় ব্রজরানী ছিল অন্তঃসত্ত্বা। একটি পুত্র সে এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেও পাইয়াছে।

হরদাসবাবু নিজে গিয়া ডাকিলেন, ব্রজ!

চোখ না খুলিয়াই সে উত্তর দিল, না।

কথাটাই শোন্।

না।

মা আসিয়া বলিলেন, এইবার একটু ঘুমিয়ে নে ব্রজ।

শিহরিয়া উঠিয়া ব্রজ বলিল, না।

ঘুমাইলেই সে মূর্তি ব্রজর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। মা বলিলেন, আমি গায়ে হাত দিয়ে থাকব রে।

না।

আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। ব্রজরানীর সাক্ষ্য শুনিবার জন্য আজ লোক যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রজরানী কঠিন দৃঢ় পদক্ষেপে আসিয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিল।

সম্মুখের কাঠগড়াতেই একটি লোক—শুভ্রকেশ, শীর্ণ, ন্যুব্জদেহ, স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি, হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে ব্রজরানীর দিকে চাহিয়া সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিতে লাগিল। উত্তর যেন অতি পরিচিত স্থানে, অতি নিকটে রহিয়াছে, তবু সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

ব্রজরানী স্তম্ভিত হইয়া খুঁজিতেছিল, কোথায় সে দৃপ্ত দাম্ভিক বলশালী যুবা? কই, সে কোথায়? এ কি সেই মানুষ? না না, এ সে নয়, হইতে পারে না। তাহার অন্তরের মধ্যে একটা প্রবল আবেগ আসিয়া অকস্মাৎ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। চোখ দুইটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ ঐ জীর্ণ শীর্ণ হতভাগ্য যেন স্মৃতিকে খুঁজিয়া পাইল, সে পরম মুগ্ধ দৃষ্টিতে গভীর শ্রদ্ধায় তাহার দিকে চাহিয়া বার বার ঘাড় নাড়িয়া যেন নিজেকেই সমর্থন করিয়া বলিল, দেবী, দেবী। স্বর্গের দেবী! তুমি বউদি!

ব্রজরানীর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। করুণাময় মমতায় সে যেন দেবীই হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারী উকিল ব্রজরানীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, কেঁদে কি করবেন মা, এখন বিচার প্রার্থনা করুন। সুবিচার যাতে হয়, তাতে সাহায্য করুন।

পৃথিবীর দীনতা—পুঞ্জীভূত হীনতায় জীর্ণ ঘৃণাহত ঐ হতভাগ্য, হায় রে, গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিবে! এ কি বিচার! এ কাহার বিরুদ্ধে বিচার। ব্রজরানীর সমস্ত যেন গোলমাল হইয়া গেল।

সরকারী উকিল প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। ওদিকে জনতার মধ্য হইতে অস্ফুট গুঞ্জনে উচ্চারিত দুই-চারটি কথা ভাসিয়া আসিতেছিল।

—ফাঁসি নয়, বন্দুকের গুলি দিয়ে মারুক ওকে।

ব্রজরানীর চোখে আবার জল দেখা দিল। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত লোক নিষ্করুণ নেত্রে আক্রোশভরে চাহিয়া আছে ঐ হতভাগ্যের দিকে। গম্ভীরমুখে জজ সাহেব ইংরেজীতে কি মন্তব্য করিলেন, অর্থ না বুঝিলেও ব্রজরানী সে শব্দের কাঠিন্য অনুভব করিল।

আদালতের পিয়ন বার বার হাঁকিতেছিল, চুপ—চুপ—আস্তে।

এই লোকটিকে দেখুন। অনেক পরিবর্তন হয়েছে অবশ্য। এই অনন্ত কি আপনার স্বামীকে খুন করেছে?—সরকারী উকিল প্রশ্ন করিলেন।

ব্রজরানীর অন্তরাত্মা তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, তাহারই প্রতিধ্বনি জনতা স্তম্ভিত হইয়া শুনিল—না।

তারপর সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা।

ব্রজরানী ফিরিল যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত—হৃদয়ে একটা প্রগাঢ় প্রশান্তি—হৃদয়-মন যেন কত লঘু হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে ছিলেন হরদাসবাবু। তিনি তাহাকে বলিলেন, তোর মামাশ্বশুরের সঙ্গে একবার দেখা কর্ ব্রজ। যা দিতে চেয়েছিলেন—চেয়ে নে। ভবিষ্যতে—

ব্রজ বলিল, না।

বাড়িতে ব্যাপারটার সমালোচনার আর অন্ত ছিল না। ব্রজর মা পর্যন্ত কন্যার বুদ্ধিহীনতার সমালোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমিই একবার যাও হরদাস, ওর নাম করে। সে গেল কোথায়?

সন্ধ্যার অন্ধকারে ব্রজরানী ক্লান্ত হইয়া ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা আসিয়া দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আবার এখুনি স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে একটা কাণ্ড করে বসবে! ব্রজ—ও ব্রজ! চল্ নীচে শুবি, এখানে একা তোর আবার ভয় করবে।

ব্রজ নিদ্রারক্ত চোখ মেলিয়া বলিল, না।

সে আবার নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নয়ন নিমীলিত করিল।

পৌষ-লক্ষ্মী

১৩৫০ সালের পৌষ মাস। পঞ্চাশ হল শ'য়ের অর্ধেক। শ'য়ে শূন্য। শ'য়ের অর্ধেক পঞ্চাশেও গাঁয়ের অর্ধেক লোক ঝেড়ে মুছে নিয়ে গেছে, বাকি অর্ধেক যারা আছে, তারাও আধমরা, হিসাব ঠিক আছে। গাঁয়ের প্রবীণেরা এবং বিচক্ষণেরা পালপাড়ায় কালী-ঘরের সামনে অশথতলায় বসে তামাক খেতে খেতে সেই কথারই আলোচনা করে। এক ছিলিম তামাকেই গোটা মজলিসের এখন পরিতৃপ্তি হয়, কলকে আজকাল আর দুটো লাগে না; যে তামাক এক-একজনে পুরো এক ছিলিম খেয়েও তৃপ্তি পেত না, সেই তামাক দু-টান টেনেই লোকে এখন কাশতে শুরু করে, বুকে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে উঠে। এবারের বানের ঠাণ্ডা ক্রমে শ্লেষ্মা হয়ে মানুষের ম্যালেরিয়াজীর্ণ বুকে জমে বসেছে গাঁয়ের খিড়কি-ডোবার পচা জলে থকথকে দলাশের মত।

সবচেয়ে বয়স বেশি মুকুন্দ পালের—ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। ভারিক্কি লোক। কালো কষকষে রঙ পালের, এককালে জোয়ানও ছিল খুব ভারি, তখন নাকি মাথায় ছিল বাবরিচুলের বাহার। এতবড় দেহখানা তার জ্যালজ্যাল করছে। মাথার চুলগুলি একেবারে কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা, এখন পেকে সাদা ধপধপ করছে; পাল প্রায়ই এখন মাথায় হাত বুলায়, খুঁটিয়ে ছাঁটা চুলগুলির কড়া ডগার উজানের টানে হাতের তালুতে বেশ সুড়সুড়ি লাগে।

পাল হুঁকাটা ঘোষের হাতে দিয়ে বলে, একবারে যদি কেউ পুরো এক ছিলিম তামাক খেতে পারে ঘোষ—। বলেই সে কাশতে আরম্ভ করে, কেশে, কাশির ধমক সামলে কথাটা শেষ করে—তবে আর বুকে মালিশ লাগে না। বেবাক শ্লেষ্মা, বুঝেছ? আবার এক ধমক কাশি আসে, এবার মোটা এক চাকা শ্লেষ্মাও উঠে যায়, পাল আরাম পায়। ঘোষ

তখন কাশতে শুরু করেছে। তারপর আরম্ভ হয় শ'য়ের অর্ধেক পঞ্চাশের আলোচনা। হিসাব-নিকাশ ঠিক আছে। চিত্রগুপ্তের কলম। ভুল কি হয়?

ঘোষ কয়েকবার ঘাড় নেড়ে বললে, তা হয়। মুনি-ঋষিদেরই মতি-বেভ্রম হয়, তা চিত্রগুপ্ত। হাজার হলেও চিত্রগুপ্ত তো বামুন নয়, কায়স্থ—এবারেই ভুল হয়েছে।

সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কি ভুল হল? এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

নদীর ধার পর্যন্ত খোলা পূর্বদিকের পানে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে ঘোষ বলে, ধান।

পূর্বদিকের নদীর ধার পর্যন্ত গাঁয়ের মাঠ, তিন ভাগে ভাগ করা—ষাঁড়া জোল, মাঝের জোল, বেনো কূল। নামেই তিন ভাগে ভাগ করা, নইলে মাঠ একটাই। গ্রামের কোল থেকে নদীর ধার পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। গোটা মাঠখানি এবার ধানে থইথই করছে, সোনার বরন রঙ ধরে এসেছে! ওই ধানই জীবনকাঠি, মরণকাঠি; এবারের ধান ঘরে উঠলে জীবন থাকবে, নইলে মরণ—অবধারিত মরণ, তাতে আর কারও কোনও সন্দেহ নাই। ভরসার মধ্যে বাগদী-কাহার-মুচিরা যারা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তারা যদি ফিরে আসে। আর যদি আসে দুমকা থেকে সাঁওতালের দল।

গায়ের বাগদী-কাহার-মুচি এদের যারা দিনমজুরি খাটে, চাষ করে না, তারা প্রতি বছরই বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চলে যায়। বিশেষ করে অজন্মা আকাড়া হলে সেবার দল বেঁধে চলে যায়, অজন্মা না হলেও দু ঘর এক ঘর যায়, আবার ফেরে এই ধান কাটার সময়। কেউ কেউ সেই বছরই ফেরে, কেউ কেউ ফেরে পাঁচ বছর পর, কেউবা ফেরে এক পুরুষ পর। দল বেঁধে ফেরে এমনই বাহান্ন পঁউটির বছরে, ধানে ধানে ছয়লাপের পোষে। ওরা এমনই ধারা সুখের পায়রা চিরকাল, দুঃখের ঘরে থাকা ওদের স্বভাবের বাইরে। সকল সুখের মূল যখন লক্ষ্মী, তখন এবার ওরা আসবে—এই ভরসা নিয়ে খানিকটা শান্তি পায় পাল মশায়েরা। সকালে বিকালে ঠুকঠুক করে যায় ওদের পরিত্যক্ত পাড়াটার দিকে। পড়ো ভাঙা বাড়িগুলো খোঁজ করে, পাড়ার বাইরে

বটবাগানের বটগাছগুলোর তলার দিকে চায়। এখানে খোঁজ করে, নতুন আগন্তুক কেউ এল কি না! এ গ্রাম থেকে পালিয়ে যেমন এখানকার ওরা অন্য গ্রামে যায়, তেমন অন্য গ্রামের তারাও তো এ গ্রামে আসতে পারে! তেমন যারা আসে, তারা প্রথম বাসা পত্তন করে এই বটবাগানে কোন গাছের তলায়! কিন্তু কেউ আসে নাই আজও পর্যন্ত। পাল মশায়দের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। থই-থই-করা মাঠ-ভরা ধান, এ তারা তুলবে কি করে? রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয় না।

* * *

তবুও মাঠে ধান কাটা চলছে। রুগ্ন দুর্বল শরীর নিয়েও মানুষ ভোরবেলায় কাঁথা গায়ে দিয়ে কাস্তে হাতে মাঠে যায়! মাথায় গামছা বাঁধে কম্ফর্টারের মত। নাক দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে, পৌষের ভোরের শীতে হাতের আঙুল বেঁকে যায়, তবুও সেই আড়ষ্ট হাতের মুঠায় কোনমতে ধানের ঝাড়ের গোড়া চেপে ধরে ডান হাতের কাস্তে টানে।

মুকুন্দ পালের কৃষাণ কাল থেকে জ্বরে পড়েছে। পালকে আজ নিজেকেই আসতে হয়েছে মাঠে। কিন্তু কাস্তে যেন চলছে না। হেঁট হয়ে কাস্তে টানতে কোমরে টান ধরে অসহ্য বেদনায় টনটন করে উঠছে। যেন কোমরের দড়ির মত শিরাগুলো শুকিয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে; হাড়ের গাঁটে গাঁটে জমে গেছে বালিতে মাটিতে জমাট-বাঁধা পাথরের চাঁইয়ের মত। পাল কোমরে হাত দুটি রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হেঁট হয়ে থাকা যত কঠিন, হেঁট হয়ে কিছুক্ষণ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোও তেমনই কঠিন। শাঁখের করাত যেতেও কাটে, আসতেও কাটে, কোমরের ভিতরে যেন শাঁখের করাত চলছে মনে হচ্ছে!

হায় ভগবান।—পাল উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাজটুকুর দিকে চেয়ে দেখে আপন মনেই বললে, হায় ভগবান! শুধু আক্ষেপই নয়, নিদারুণ লজ্জায় তার মাথাও হেঁট হয়ে আসছে। আপনার কাছেই মাথা হেঁট হচ্ছে। কতটুকু কেটেছে সে। তালপাতায় বোনা চ্যাটাই, লম্বায় পাঁচ হাত, চওড়ায় আড়াই হাত, এখানে বলে তালাই, এক তালাই-ভোর জমির ধানও কাটা হয় নাই।

হঠাৎ তার 'চোখ ফেটে জল এল। তার পুরানো কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় তার সঙ্গীরা তাকে বলত—গাঁদা। যৌবনে মুরুব্বিরা তার নাম দিয়েছিল—ভীম। প্রৌঢ়ত্বে লোকে বলত—মোটা মোড়ল, এখনও বলে। মনে পড়ে গেল পুরানো আমলের ধান কাটার কথা। সে সব কাহিনী আজ মনে হচ্ছে। এমন মাঠ-থই-থই-করা ধান এবারেই নতুন নয়। কতবার হয়েছে। ভোরের আকাশে শুকতারা তখন জলজ্বল করত আঁধার ঘরের মানিকের মত। উত্তর দিক থেকে সিরসির করে বয়ে যেত হাড়-কনকনানি ঠাণ্ডা বাতাস। গাছপালার পাতা থেকে গাছতলার শুকনো পাতার উপর সত্যি সত্যি টপটপ শব্দে শিশির ঝরত, ঘাসের উপর পা দিলে গোড়ালি পর্যন্ত ভিজে যেত। পথের ধুলার উপর পাটালির মত এক পুরু ধুলা শিশিরে ভিজে জমে থাকত, পা দিলে ভেঙে যেত। ধানের মাঠে এলে শিশিরে-ভেজা নরম ধানের গাছে সে গন্ধ বেলায় এসে আজ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু সে গন্ধ মনে আছে তার। সেই ভোর থেকে আরম্ভ হত ধান কাটা।

পাল তার হাতখানা মেলে ধরলে চোখের সামনে; এ হাতের গ্রাসে, লোকে বলে, এক পো চালের ভাত ওঠে। এক পো কি আর ওঠে? লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে তার হাতখানা প্রকাণ্ড; এই হাতের এক মুঠায় সে থপথপ করে ধরত ধানের গোড়া আর ডান হাতে কাস্তের এক টানে কেটে চলত ঘাস-কাটার মত; তার এই মুঠার তিন মুঠা ধানে বাঁধা ধানের আঁটি অন্য লোকের বাঁধা আঁটির দ্বিগুণ না হোক দেড়া মোটা হত। বেলা এক প্রহর যেতে না যেতে, রোদের আঁচে ধানগাছ শুকিয়ে খড়খড়ে হবার আগেই ক্ষেতের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত শেষ করে ফেলত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি কমে আসারই কথা। তবুও গত বছর পর্যন্ত সে এক পহর বেলা পর্যন্ত আধখানা ক্ষেতের ধানও কেটেছে। কিন্তু এই কটা মাসে এ কি হল তার?

কি কত্তা, ডাঁরিয়ে রইচ যে? কি হল?

আপনার ভাবনার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল পাল, তার মন উদাস হয়ে সেকালের সেই আমলে চলে গিয়েছিল, মধ্যে মধ্যে এই জমিখানাই যেন দেখাচ্ছিল সমস্তটা কাটা হয়ে গেছে, এ-ধার থেকে ও-ধার পর্যন্ত

আঁটি আঁটি করে সাজানো রয়েছে কাটা ধান, ক্ষেতের লালচে মাটি দেখা যাচ্ছে, লালচে মাটির উপর কাটা ধানের গোড়া জেগে রয়েছে লাল রঙের দাবার ছকের উপর সাদা রঙের ঘুঁটির মত।

পিছন থেকে কে ডেকে কথা বললে। পাল ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টিও কমে এসেছে। গেল বছর পর্যন্তও পাল বিনা চশমায় চট-সেলাই-করা সূচে শণের সুতলির দড়ি পরিয়েছে, বস্তার মুখ সেলাই করেছে। কিন্তু এই বছরের এক ধাক্কাতে বেলা কাবার করে দিলে, চারিদিক ঝাপসা! তুলসীতলায় পিদিম জ্বালার সময় হয়ে এল আর! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাল লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, কে?

আমি গো; চিনতে পারছ না নাকি?

পালের এবার খেয়াল হল, ছোকরা-মানুষের গলা; মুহূর্তে সে চিনতে পারলে ছোকরাকে। মন তার বিষিয়ে উঠল।

নজর গেল তা হলে কত্তা! আমি গো, চিকেষ্ট!

চেকা?

হ্যাঁ গো। বলি ডাঁড়িয়ে রইচ যে?

তুই কোথা যাবি? মাঠ থেকে পালিয়ে এলি নাকি? জ্বর এল

জ্বর?—চিকেষ্ট হি-হি করে হাসতে লাগল।—জ্বর-ফর আমার কাছে ঘেঁষে না। সেই তোমার আশ্বিন মাসে একবার। তার পরে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

পালের বুক থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল, সাপের গজরানির মত, নিশ্বাসের সঙ্গেই সে বললে, হুঁ!

মদ আর মাস ও হল জ্বরের যম। বুয়েছ?—হি-হি করে আবার হাসতে লাগল চেকা।

তা যাবি কোথা, যা না কেনে? ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে বুঝি মজা লাগছে আমার ছামনে ডাঁড়িয়ে?

চেকা আবার হাসতে আরম্ভ করে দিলে। বললে, যাচ্ছি তোমার ওই মাঝের জোলে পাঁচ কিস্তে তিন বিঘের চকে—তোমার দরুন গো। এখন সারা হয়ে গেল।

পাল হঠাৎ হেঁট হয়ে ঘসঘস শব্দে আবার ধান কাটতে আরম্ভ করে দিলে। চেকার কথার ওই 'পাঁচ কিস্তে তিন বিঘে তোমার দরুন'

কথাটা তপ্ত লোহার শলার মত পালের বুকে যেন বিঁধে গিয়েছে। ওই জমিটা চেকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পালের কাছ থেকে কিনেছে এই বৎসরই বর্ষার ঠিক আগে। ধানের দর আঠারো টাকা, চাল তিরিশ, পালকে বাধ্য হয়ে বেচতে হয়েছে। চেকা বোধ হয় খোঁচা মারবার জন্যেই কথাটা বলেছে। খোঁচাটা লেগেছেও পালের বুকে।

চেকা তবুও গেল না। দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। বললে, সেই সকাল থেকে এই এক তালাই কাটলে নাকি?

পাল এ কথার কোন উত্তর দিলে না। সে ধান কেটেই চলল। চেকার এ কথার মধ্যেও হুল আছে।

কত্তা!

পালের কোমর আবার কনকন করে উঠেছে; মনের জ্বালার উপর শরীরের যন্ত্রণায় পাল এবার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। সে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল দেহের উপর একটা হ্যাঁচকা টান মেরে, মট করে শব্দ হল হাড়ে। পাল রাগে অধীর হয়ে বলে উঠল, কেনে রে শালা, কেনে? কি, বলছিস কি?

চেকার হাসি বেড়ে গেল, সে চটপট শব্দে বার কয়েক বাই ঠুকে বললে, হবে নাকি, এক হাত হবে নাকি এই ধানের গদির ওপর?

বলেই সে আর দাঁড়াল না, নিতান্ত অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে একটা গান ধরে সে চলে গেল। পাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত দিয়ে। চোখ দিয়ে এবার তার জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

মুকুন্দ পাল—এককালের ভীম, প্রৌঢ় বয়সের মোটা মোড়ল, তাকে ঠাট্টা করে গেল ওই শ্রীকৃষ্ণ—চেকা! সম্বন্ধে সে অবশ্য মুকুন্দের নাতি, সম্বন্ধটা ঠাট্টারই বটে; কিন্তু এ ঠাট্টা মুকুন্দের পক্ষে মর্মান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ এখন গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন চাষী। উঠানে গোলায় গোলায় ধান আছে, ঘরে টাকা আছে। 'মহামহিম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পাল বরাবরেষু' বয়ানে লেখা এ গাঁয়ের লোকের সই-করা খত আছে ওর ঘরে। 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘের চক' বলে সেই কথাটা চেকা ঠাট্টা করে বলে গেল। ওতে পাল ব্যথা পেয়েছে, দুঃখ পেয়েছে; কিন্তু ওর উপর হাত নাই। ও দুঃখ মনে মনেই চেপে রেখেছে মুকুন্দ। কিন্তু ও যে

ওই বাই ঠুকে বলে গেল—হবে নাকি এক হাত? ওর অর্থ হল, মুকুন্দের শরীরের এ অবস্থা দেখে সে আর তার সঙ্গে একদফা কুস্তি লড়তে চেয়ে গেল।

একালের ছোকরাদের মধ্যে চেকাই হল সকলের চেয়ে বড় জোয়ান। পালের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল। মনে পড়ল, বছর আষ্টেক আগে আমুতির লড়াইয়ের আখড়ায় যখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আছাড় দিয়ে আখড়ার মাটির উপর বাই ঠুকে পড়ে ছিল, তখন হাসতে হাসতে মুকুন্দ গিয়ে বলেছিল, কই আয় দেখি, আমার সঙ্গে আয় এক হাত।

অন্য পাঁচজনে, বিশেষ করে যগন্দ ঘোষ তার হাত ধরে টেনে বলেছিল, ছি ছি ছি! তোমাকে নাকি লড়তে হয় ওই বালকের সঙ্গে! ছি!

শঙ্কিত হয়ে বারণ করেছিল সবাই, পালের শরীরের যা ওজন তাতে সে যদি চেকার উপর কোনমতে চেপে পড়ে, তা হলেই ছোঁড়াটা ঘায়েল হয়ে যাবে। শঙ্কিত হয় নাই শুধু ছিকেষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, এই, হট যাও সব, লড়ব আমি। চেকার স্পর্ধা চিরকালের। পাঁয়তারায় ঘুরতে ঘুরতে আবার সে বলেছিল, মোটাকে সাথ আঁটা লড়েগা, হট যাও। পালের দেহখানা প্রকাণ্ড বলে এবং লোকে তাকে 'মোটা মোড়ল' বলে বলে, সেই দশের সামনেই সে নিজের নামকরণ করেছিল—আঁটা অর্থাৎ আঁটসাঁট-দেহ তরুণ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সে গরম জল হয়ে গিয়েছিল! মুকুন্দ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে গোটা আখড়াটার চারিধার ঘুরে আখড়ার উপর ফেলে দিয়েছিল—বেশ একটু জোরেই ফেলে দিয়েছিল।

তাই আজ চেকা মোড়ল তাকে ঠাট্টা করে গেল। বাই ঠুকে আস্ফালন করে লড়াই করবার জন্যে প্রায় হাঁক মেরে ডাক দিয়ে গেল।

হায় ভগবান! কি কাল জর তুমি দুনিয়াতে পাঠালে। রক্ত জল করে দিলে, মাংস সব যেন চিবিয়ে লোল করে দিলে, হাড়ে পর্যন্ত ঘুণ ধরিয়ে দিলে! চোখের দৃষ্টি গেল। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে। দু পা জোরে হাঁটলে হাঁপাতে হয়। নইলে সে তো বুড়ো নয়।

ষাট বছর বয়স কি এমন বয়স? তার বাপ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পাঁচসেরী কোদাল চালিয়েছে জোয়ান কৃষাণের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে। সে নিজে? নিজেই তো সে এই বর্ষাতেও কোদাল চালিয়েছে, লাঙলের মুঠো ধরেছে। হঠাৎ এ কি হল? হায় ভগবান! বুড়ো করে দিলে?

কি? চলছে না হাত? দাঁড়িয়ে আছ?

কে?

আমি। সকরুণ কণ্ঠে বললে যগন্দ ঘোষ, আমিও পারলাম না। ফিরে এলাম।

যগন্দ! এ কি হল ভাই যগন্দ?

যগন্দ বললে, লা এসে ঘাটে লেগেছে। আর দেরি নাই। যগন্দর গলা কাঁপছে, স্পষ্ট বুঝতে পারলে মুকুন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারও চোয়ালের নীচের সমস্ত মাংসটা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

যগন্দ এগিয়ে এসে বললে, তামাক খাও।

আলের উপর দুজনে বসল। মুকুন্দর হাতে হুঁকো ধরাই রইল। সে যেন বড়ই ভাবছে।

যগন্দ তাকে হুঁকোর কথা মনে পড়িয়ে দিল, খাও।

হুঁ। হুঁকোয় সে শুধু মুখই দিলে, টানলে না। তারপর হঠাৎ বললে, লায়ে পার হতে তো ভয় নেই যগন্দ, ‘হরি’ বলে নাপিয়ে লায়ে চড়তে পারতাম, তবে তো! কিন্তু এ কি পাপের ভোগ বল তো? হ্যা হে, তিন-চার মাসের কটা জ্বরে এ কি হল বল তো?

বুড়ো হয়ে গেলাম ভাই।

মুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, চেকা আমাকে বাই ঠুকে বলে গেল যগন্দ, এক হাত হবে নাকি! আমাকে ঠাট্টা করে গেল!

রোদ উঠেছে। শীত কেটে এসেছে। হাত-পা-কোমরের আড় ভাবটা কেটে গিয়েছে অনেকটা। হঠাৎ মুকুন্দ গায়ের র‍্যাপারখানা খুলে ফেললে।

যগন্দ বললে, করছ কি? ঠাণ্ডা লাগবে।

উঁহু। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। গা ঘামছে। দেখ তুমি।

যগন্দরের কিন্তু ততখানি উৎসাহ হল না। সে বললে, মাঠে বসে আর কি করবে? চল, বাড়ি যাই।

তুমি যাও যগন্দ। আমার ভাই, ভুঁইখানা না সারলে চলবে না। কিষেণ ছোঁড়ার জ্বর!

যগন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে, সকাল থেকে তো দেখলে, আবারও সাধ হচ্ছে তোমার?

যাও, যাও হে, তুমি যাও।

মুকুন্দ আবার নেমে পড়ল মাঠে। যগন্দ চলে গেল। রোদের তাপ এসেছে, বেদনা-ভরা সর্বাঙ্গে যেন মিঠা মিঠা সেক লাগছে। আরাম পাচ্ছে মুকুন্দ। আ-হা-হা, হে দেবতা, তোমার মত এমন মহিমা আর কারও নাই। তোমার রোদে পাঁশুটে ধানগাছে সবুজ রঙ ধরে, তোমার যত রোদ তত জল, তোমার তাপে আড়ষ্ট দেহে জোর ফিরে আসছে, গাঁঠে গাঁঠে বুড়ো বয়সের পুরু চর্বি গলছে। মুকুন্দ হাত দুটা উপরে তুললে, বার কয়েক ভাঁজলে, কব্জি থেকে হাতের মুঠাটা ভাঁজলে, বার কয়েক বসল উঠল। কিন্তু হাপ ধরছে। ধরুক। তবু তার মনে হল, সে যেন অনেকখানি ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে—হ্যাঁ, অনেকখানি।

হেঁট হয়ে সে আবার ধানের গোড়া মুঠোয় চেপে ধরলে। কাস্তে চলতে আরম্ভ করল।

*　　　*　　　*

ওরে বাস রে! এ যে ভীমের মত ধান কাটতে লাগছে!—বছর বাইশের একটি মেয়ে, এক হাতে জলখাবার, অন্য হাতে জলের ঘটি নিয়ে এসে দাঁড়াল। মুকুন্দ ধান কেটে চলেছিল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু তাতে ধান কাটার চেয়ে তার দেহখানাই যেন বেশি চলছিল। ভাঙা কল চলে, তাতে যেমন কাজের চেয়ে কলটা ঝাকুনি খেয়ে নড়ে বেশি শব্দ হয় জোর, তেমনিধারা ধান কাটার বেগের চেয়ে মুকুন্দের মনের আবেগটা শরীরে প্রকাশ পাচ্ছিল বেশি। সে কিন্তু মুকুন্দ বুঝতে পারছিল না। সে কাজ করেই চলেছিল। হঠাৎ মেয়ের গলায় ওই কথাটা শুনে, সে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। সমস্ত মাঠখানায় ঐ নদীর ধার পর্যন্ত তবকে তবকে

যেন সে হাসির প্রতিধ্বনি বিছিয়ে গেল। মোটা গলায় সে ছড়া কাটলে—

"সিঁদুর-মুখী ধানে ধানে
ভরিবে গোলা
আমার সোনামুখীর হবে
সোনার কাঠির মালা।"

ওই! তোমার হল কি আজ বুড়ো বয়সে?—মেয়েটি বললে। সে সত্যিই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

মুকুন্দ চমকে উঠল মুহূর্তে। তার হাসি থেমে গেল। মুখখানা হয়ে গেল পাথরের মত। তার অকস্মাৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল আগে, তখন তার বয়স ত্রিশ। উনত্রিশ বছর বয়সে তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মারা যায়। একুশ বছরে গিয়েছিল প্রথম স্ত্রী, পঁচিশ বছরে দ্বিতীয় জনা—একটি দু-বছরের মেয়ে রেখে গিয়েছিল; উনত্রিশ বছর বয়সে তৃতীয় জনা। লোকে বলত, মুকুন্দ পাল অজগর-পুরুষ; বিয়ে হলেই নির্ঘাত খাবে। মুকুন্দও এটা বিশ্বাস করেছিল। গণৎকারেও তাই বলেছিল, রাক্ষস গণ, পত্নীস্থানে শনি মঙ্গল রাহু; শিবের সাধ্যি নাই তোমার পরিবার রক্ষা করতে। মুকুন্দ নিজের হাতের তালুর কড়ে-আঙুলটার নীচে স্পষ্ট দেখেছে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ। তাই সে আর বিয়ে না করে ঘরে এনেছিল পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরের বাবুদের বাড়ির একটি বিধবা তরুণী ঝিকে। ব্রাহ্মণবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত, জলচল জাতের মেয়ে তাতে আর ভুল নাই; তবুও 'অধিকন্তু ন দোষায়'—মুকুন্দ তাকে বৈরাগীদের আখড়ায় কণ্ঠি পরিয়ে বৈষ্ণবী করে পেড়ে-শাড়ি, হাতে চুড়ি পরিয়ে ধরে এনেছিল। ত্রিশ বছর আগে এমনই করে সে আসত তার জলখাবার নিয়ে। তেরো শো বিশ সালও ছিল একটা শূন্যের বছর, সেবারও হয়েছিল এমনই বান, এমনই ধান। হয় নি শুধু চালের মণ তিরিশ টাকা, আর হয় নি এমন কাল জ্বর। সেবার সে ধান কাটছিল মাঠে। সে এসে বলেছিল ঠিক ওই কথাটি, ঠিক ওই কটি কথা। মুকুন্দ এমনই করে হেসেছিল আর ওই ছড়াটি কেটেছিল। আজও সেই রকম মাঠ-ভরা ধান। আজও সে যেন ঠিক তেমনই হুসহুস করে ধান কেটে চলেছে, এমন সময় তেমনই ভাবে এসে

দাড়িয়ে সেই কথা কয়টি বলায় মুকুন্দের ভুল হয়ে গেছে। বৈষ্ণবীও অনেককাল মরে গেছে। মুকুন্দ বলে, গত হয়েছে।

এ মেয়েটি মুকুন্দের নাতনী--মেয়ের মেয়ে। সম্বন্ধ ঠাট্টার। কিন্তু মুকুন্দ কখনও ঠাট্টা করে না। একটি ছেলে কোলে নিয়ে মেয়েটি পনরো বছরে বিধবা হয়েছে। মেয়ে বিধবা হয়েছিল ওই মেয়েকে কোলে নিয়ে। মুকুন্দ জীবনে দুটি শিশুকে কোলে করে মানুষ করেছে, প্রথম তার নিজের মেয়ে, তারপর এই নাতনীকে। নাতনীর ছেলেকে সে কোলে করে না। না, কাজ নাই।

দুই

মুকুন্দ বাড়ি এসে বসে হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু তাতে তার মেজাজ খারাপ হয়নি। শরীর এলে মেরে গিয়েছে, কিন্তু তাতে কোন অসুখ বোধ করছে না। কাজ সে অনেকটা করেছে, অনেকটা। সে খুশি হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে, সে বুড়ো হয় নাই। আসল দরকার ওষুধ আর খাওয়া-দাওয়ার, আর দরকার কাজের অভ্যাসের।

মেয়ে লক্ষ্মী এসে বাপকে দেখে কিন্তু শিউরে উঠল, বললে, বাবা, তোমার কি শরীরের ওপর এটুকু মায়া-মমতা নাই? মুখের চেহারা কি হয়েছে দেখ দেখি! সরস্বতী বলছিল --

কি বলছিল সরস্বতী?

লক্ষ্মীর মেয়ে সরস্বতী। পাল মশায়ের সেই নাতনীটি। লক্ষ্মী বললে, বলছিল—কত্তাদাদা ধান কাটছে, বাবা রে বাবা, একটা জোয়ানের সাধ্যি নাই এমন হাঁইহাঁই করে কাটতে।

পাল হা-হা করে হেসে উঠল। মাঠে আজ যে হাসি হেসেছিল, সে হাসি সে জোয়ান বয়সে হাসত; যে হাসি সে সরস্বতী বিধবা হবার পর আজকের আগে আর হাসে নাই, সেই হাসি। হাসির আওয়াজের ধাক্কায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কাঁসার বড় খোরাটায় মৃদু প্রতিধ্বনির রেশ বেজে উঠল।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। বাবার হল কি?

তোর বেটী বলে কি লক্ষ্মী, আমাকে বলে বুড়ো! তাই—। সে আবার হা-হা করে হেসে উঠে বললে, তাই তোর বেটীকে শুনিয়ে দিলাম সেই ছড়াটা, যে ছড়া বলতাম তোর মাকে।

লক্ষ্মী হাসলে।

পাল বললে, জানিস না, এবার ধান যা হয়েছে! আ-হা-হা। ধান নয় মা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এবার খামারে বোধ হয় ধান বাঁধতে জায়গাই হবে না। তা ছাড়া গোরু দুটোর যা হাল হয়ে আছে, তাতে—

পাল অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল।

কেলের জন্যে ভাবি না। ও আমার ঠিক আছে। ও আমার ক্ষ্যাণজন্মা! ভাবনা বাছুরটার জন্যে। হাজার হলেও কাঁচা হাড়।

কেলে, পাল মশায়ের প্রিয়তম হেলে বলদ! একেবারে শৈশব থেকে তাকে পালন করছে। এখন বুড়ো হয়েছে, কিন্তু ভরা বয়সে কেলে ছিল এখানকার বিখ্যাত হেলে। পাল একা নয়, এখানকার সকল চাষীতেই একবাক্যে বলে, কেলে ক্ষণজন্মা গোরু। একা কেলের সঙ্গে কাঁধ দিয়ে একে একে চারটা বলদ আকালে ঘায়েল হয়ে গিয়েছে। গতবার আবার একটা বাছুর অর্থাৎ সদ্য জোয়ান বলদ কেনা হয়েছে। কিন্তু আজও সে কেলের ডাইনে বইতে পারে না। এবার দুটা বলদেরই 'খুঁড়িয়া' হয়েছিল গো-মড়কের সময়। দুটাই ভাগ্যক্রমে বেঁচেছে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছে। পাল কেলের জন্য ভাবে না। ভাবনা তার ওই নতুন সদ্য জোয়ান হেলেটার জন্য।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পাল বললে, চেকা আমাকে আজ খাই ঠুকে ঠাট্টা করলে মা।

কেউ উত্তর দিলে না। পাল পিছনে তাকিয়ে দেখলে, লক্ষ্মী নাই, সে চলে গিয়েছে।

পাল উঠে গিয়ে দাঁড়াল কেলের কাছে। কেলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে পালের দিকে চাইলে, তার গা শুঁকলে, তারপর ঘাড়টা লম্বা টান করে মুখটা এগিয়ে দিলে মুকুন্দের বুকের কাছে। এর অর্থ হল, গলকম্বলে সুড়সুড়ি দিয়ে দাও। পাল হেসে তার গলায় হাত বুলিয়ে পিঠে দুটা চাপড় মেরে বললে, দেখব বেটা এবার, কেমন ক্ষ্যামতা তোমার, হ্যাঁ!

তারপর আবার বললে, দাঁড়া না, তাজা করে দিচ্ছি! রশির মেয়ার ব্যবস্থা করছি আজ থেকে। রশি হল ধেনো মদের সব চেয়ে কড়া তেজী অংশ। মেয়া হল তারই পচানো জিনিসের ছিবড়ে। ভারি উপকারী আর পোষ্টাই গোরুর পক্ষে। চেকা মোড়ল নিজে খায় 'গৃহজাত' অর্থাৎ ঘরে চোলাই-করা মদ। গোরুদের খাওয়ার রশি-মেয়া; একেবারে তাগড়া হয়ে আছে চেকার গোরুগুলা; চেকা খায় মদের সঙ্গে মাংস। হাঁস আছে একপাল, হাঁসের বাচ্চা খায়।

কি করছ কত্তা?—সরস্বতী দাঁড়াল এসে দাওয়ার উপর। খেতে দিয়েছি তোমার কেলেকে, উপোস করিয়ে রাখি নাই।

কি?

এস, ত্যাল মাখো। চান কর। খেতে-দেতে হবে না?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

পাল এসে বসল। তেলের বাটিটা এগিয়ে দিলে নাতনী। পাল বললে, এক কাজ কর্ দিকিন। ত্যালটা গরম করে নিয়ে আয় দিকিনি।

গরম তেল সর্বাঙ্গে মালিশ করতে বসে সে আবার ডাকলে, সরস্বতী!

কি?

এই পিঠে খানিক ত্যাল মালিশ করে দে তো বুন। খুব করে, আচ্ছা করে। উঁহু, উ তোর হচ্ছে না। আরও জোরে।

আর জোর নাই বাপু।

পাল হা-হা করে হেসে উঠল। বললে, আচ্ছা, তবে গোটাকতক কিল মার দিকিনি। যত জোর আছে তোর। আচ্ছা! আচ্ছা! আচ্ছা!

আমার হাতে লাগছে বাপু, আর আমি পারব না।—সরস্বতী সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

পাল আবার হা-হা করে হেসে উঠল। বললে, আমার কিন্তু তোর নরম হাতের কিল ভারি মিষ্টি লাগছে।

সরস্বতী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কর্তার মুখে এই ধারার কথাবার্তা কখনও শোনে নাই। হল কি কর্তার।

* * *

মাকে বললে সরস্বতী, কত্তার গতিক ভাল নয় মা।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। কথাটা তারও মনে হয়েছে, বাপের সেই হাসি শুনে। এ হাসি সে শুনেছে ছেলেবেলায়। বাপকে তখন লোকে বলত—ভীম। সন্ধ্যার পর বাইরের দাওয়ায় পাঁচজনের সঙ্গে বসে তার বাবা এমনই ভাবে হাসত; সে তখন ছোট মেয়ে, বাড়ির ভিতরের দাওয়ায় শুয়ে ঘুমাত, বাবার হাসিতে তার ঘুম ভেঙ্গে যেত।

বৈষ্ণবী মা বকত বাবাকে, কি এমন করে হাসো, মেয়েটার ঘুম ভেঙে যায়, চমকিয়ে ওঠে!

বাবা আবার হাসত হা-হা করে। কাঁসার বাসনে থনথনে আওয়াজের রেশ বেজে উঠত, দরজায় কি জানালায় হাত দিয়ে থাকলে মনে হত, কি যেন একটা শিউরে উঠছে তার ভিতরে। সে হাসির প্রথম পর্দা ছিঁড়েছিল বৈষ্ণবী মারা যাবার পর। তারপর খাদে নেমেছিল লক্ষ্মী নিজে বিধবা হবার পর, সরস্বতী বিধবা হবার পর সে হাসি আর হাসে নাই তার বাবা। আজ সেই হাসি হাসতে শুনে কথাটা তারও মনে হয়েছে।

সরস্বতী বললে, কত্তা হয়তো আর বাঁচবে না। নয়তো কত্তার মাথা খারাপ হয়েছে।

লক্ষ্মী শিউরে উঠে বললে, ও কথা বলিস না সরস্বতী। তা হলে আমাদের দশা কি হবে, ভাব দেখি।

সরস্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই চলে গেল সেখান থেকে।

লক্ষ্মী চুপ করে বসে ভাবছিল। যতই অশুভ হোক, সরস্বতী কথাটা মিথ্যা বলে নাই। আজ সন্ধ্যেবেলায় বলদ দুটোকে রশি আর মেয়া খাওয়াবার ঝোঁক উঠেছে। নিজে বৈষ্ণব মানুষ, মদকে যার এত ঘেন্না সেই লোক নিজে হাতে ওই সব জিনিস ঘেঁটেছে। বলদকে মেয়া রশি অনেকবারই খাওয়ানো হয়েছে, কিন্তু সেসব করত রাখালে। বাবা নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। সেই লোক নিজে হাতে এই বুড়ো বয়সে—! চোখে জল এল লক্ষ্মীর। রাখাল নাই, কিন্তু কাহার-পাড়ার কাউকে ডাকলেই হত। এ কি মতিভ্রম!

একটু বসে থেকে সে উঠল। উৎকণ্ঠা এবং কৌতূহলও হল বাবা কি করছে দেখবার জন্যে; সে চুপিচুপি বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে

গেল। আশ্চর্য হয়ে গেল কোঠার উপরে ধুপধাপ শব্দ শুনে। যেন দুরমুস দিয়ে কাঠের তক্তার উপর মাটি-বিছানো মেঝেটা পিটছে। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে আড়াল থেকে উঁকি মেরে সে অবাক হয়ে গেল। তার বাবা কুস্তিগীরের মত কাপড় সেঁটে রীতিমত বৈঠক দিচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। ধীরে ধীরে লক্ষ্মী নেমে এল। হায় রে! এই বয়সে বাবা শেষে পাগল হয়ে গেল।

তিন

শুধু মেয়ে আর নাতনীই নয়, গোটা গাঁয়ের লোকেরই কেমন যেন একটু খটকা লেগেছে। পালের হল কি? তার ওই হা-হা করে হাসি শুনে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। ভোর থেকে আরম্ভ করে জলখাবার বেলা পর্যন্ত পাল মাঠে ধান কাটে। তাতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করে না। পালের কৃষাণটার জ্বরের সঙ্গে বুকের দোষ হয়েছে, আধা-ডাক্তার আধা-কবরেজ ভাগবতচরণ বলেছে, 'মারে হরি রাখে কে?' লোকটা মরবে। আজও পর্যন্ত বাগ্দী-কাহার যারা বর্ষার সময় চলে গিয়েছে, তারা কেউ ফিরে নাই। দুমকার ওদিক থেকে একটি দল সাঁওতালও আজ পর্যন্ত এ অঞ্চলে আসে নাই। বর্ধমানে দামোদরের বাঁধ তৈরি হচ্ছে, রেলের সাঁকো তৈরি হচ্ছে, সারি-সারি ক্রোশ বরাবর লম্বা এক-একটা সাঁকো; উড়ো জাহাজের আস্তানা তৈরি হচ্ছে এখানে ওখানে সেখানে—কোনটা দু ক্রোশ, কোনটা পাঁচ ক্রোশ লম্বা; লাখে লাখ মজুর খাটছে, টাকাটার কমে মজুরি নাই, পাকা-মেঝে ঘরে দিচ্ছে নাকি থাকতে, ডাক্তার-ওষুধের পয়সা লাগে না, এই ঢাউস বড় বড় মোটরে চড়িয়ে নিয়ে যায়, আবার মোটরে করে দিয়ে যায়। সাহেবরা সেখানে সন্ধ্যার পর নাচ গান হল্লা করে। মোটা মোটা বকশিশ দেয়। ভাল ভাল বিলাতী মদের বোতল নাকি গড়াগড়ি যাচ্ছে; টিনে বন্ধ খাবার। এসবেরও প্রসাদ কি আর কিছু কিছু না পায় তারা? সব—সব মজুর গিয়ে সেখানে জুটেছে। কিসের জন্য এখানে আসবে!

নিজের নিজের ধান নিজে না কেটে উপায় কি? কাটেও তো তারা চিরকাল। এবার না হয় রোগ ধরেছে—কাল রোগ। তবু তো ধান তুলতে হবে। মাঠ-ভরা ধান, গোটা বছর রত্নাকর মুনির মত উইকে একপিঠ ভুঁইকে একপিঠ দিয়ে তপস্যার ফসল—লক্ষ্মীর আটনের দেবতা, গোটা বছরের মুখের ভাত, চালের খড়, গোরুর আহার—এ তো তুলতেই হবে। ঘরের খামার খাঁ-খাঁ করছে, লক্ষ্মীর আটন খালি পড়ে আছে; গোলার মধ্যে চামচিকেতে বাসা বেঁধেছে, মাকড়সায় জাল বুনেছে; গোলার মধ্যে নিকিয়ে পরিষ্কার করে সব পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। তুলবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেও সবাই। কিন্তু পালের ধান কাটা দেখে লোকে অবাক হয়েছে। পাল ধান কাটে আর আপন মনেই বলে, হেঁই-হেঁই। পা ফেলে যেন রোখা মাতালের মত। পাল কিছুদিন আগেও উঠত ধীরে ধীরে, বলত, আর কি সেদিন আছে? তাড়াহুড়া করে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে। বলে হাসত। সেই পালের হঠাৎ যেন নবযৌবন হয়েছে। এ তো ভাল নয়। এমন করে খাটতে গেলে কোন-দিন বুক ধড়ফড় করে মাঠেই মুখ গুঁজে পড়বে, আর উঠবে না। না হয় তো খাটুনির ধমকে পালটে পড়বে জ্বরে। এর উপর জ্বর হলে মেরে দিয়ে যাবে। নাও যদি মরে, তবুও উঠে আর হেঁটে বেড়াতে দেবে না সহজে।

তার উপর এসব কথা বললে ওই হাসি।

যোগেন্দ্র বললে, কি হল কি তোমার, বল দেখি?

পাল সেই হাসি হাসতে আরম্ভ করলে। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, সন্ধ্যাবেলায় বলব।

ওরে বাপ রে! এত হাসি কিসের গো কত্তা?

গলার আওয়াজেই চিনতে পেরেছিল পাল চেকা মোড়লকে। পিছন ফিরে দেখলে, চেকা পালই বটে। পাল ভুরু নাচিয়ে মাথা দুলিয়ে বললে, পারিস? বলি, তুই পারিস?

কি?

এমনই হাসতে? মরদ তো বটিস। জোয়ান বয়সও বটে, পয়সাও ঢের আছে। পারিস? কয়েক মুহূর্ত সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেকার দিকে চেয়ে থেকে আবার বললে, ফুসফুসি ফেটে যাবে কোলা-ব্যাঙের পেটের মত।—বলেই সে আবার হাসতে আরম্ভ করলে সেই হাসি।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গেল। তার আর কোন রকম সংশয় রইল না, পালের মাথার সত্যিই গোলমাল হয়েছে। চেকাও প্রথমটা চুপ করে ছিল। একটু পর সে বললে—পালকে কোন কথা না বলে যোগেন্দ্রকে বললে, ঘোষ-কত্তা। পাল কত্তার নাকটা দেখেছ ?

যোগেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়েই তার মুখের দিকে চাইলে। পালের ভুরুও কুঁচকে উঠল। চেকা যে এবার বাঁকা বঁড়শির মত কথা বলবে, তাতে তাদের সন্দেহ ছিল না। চেকাকে তারা চেনে। টাকার গরমে মাটিতে ওর পা পড়তে চায় না। ওর কথায় জলের মাছ গায়ের জ্বালায় ডাঙায় মাথা ঠুকে আছাড় খেয়ে পড়ে।

চেকা বললে, দেখ, ভাল করে দেখ। হঁ, হুঁ, ঠিক।

কি ?

বেঁকেছে। কত্তার নাকটা বেঁকে গিয়েছে।

নাক বেঁকে গেলে মানুষের ছ মাসের মধ্যে অবধারিত মৃত্যু। নীল তারা দেখতে পায় না চোখ টিপে, আকাশের অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখতে পায় না। এমনই নাকি অনেক কিছু হয়। চেকার কথা শুনে যোগেন্দ্র শিউরে উঠল। সে তার ঘোলাটে চোখের নিস্তেজ দৃষ্টি যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ করে চাইলে পালের মুখের দিকে। পালও চমকে উঠল, তার ডান হাতে ছিল কাস্তে, বাঁ হাতটা আপনি যেন উঠে গিয়ে পড়ল নাকের উপর।

চেকা হি-হি করে হেসে উঠল। শুধু হাসি নয়, তার সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী। হাসির ধমকে তার মাথাটা মাটিতে ঠেকে গেল প্রথমটা, হাসির ধমকেই আবার যেন সোজা হয়ে উঠে পিছনের দিকে উলটে পড়ে যাবার উপক্রম করলে।

চেকা বললে, ছ মাস—আর ছ মাস। বলেই সে চলতে আরম্ভ করলে। কিছু দূরে গিয়েই সে আবার দাঁড়াল, বললে, মরণের ছ মাস আগে, বুঝলে কত্তা, মানুষের এমনই নব-যৌবন হয়। বুঝলে।

পাল আবার উৎকটভাবে হেসে উঠল, নিজের বাই দুটোতে চাপড় মেরে বললে, হবে নাকি ?

চেকা কিন্তু আর দাঁড়াল না। চলে গেল। পাল তার দিকেই চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, যগন্দ !

কেউ সাড়া দিলে না। যোগেন্দ্র চলে গিয়েছে।

পাল কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার নাকে হাত দিলে। কত্তা, আজ যে ডাঁড়িয়ে রইচ ?

সরস্বতী। সরস্বতী এসেছে জলখাবার নিয়ে।

হুঁ।

হুঁ কি ? শরীর ভাল আছে তো ?

দেখ তো সরস্বতী, নাকটায় কি হল ?

কি হল ? কই, কিছুই তো হয় নাই।

যেমন ছিল তেমনই আছে ?

সরস্বতী খুব কাছে এসে খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখলে, হ্যাঁ কই, কিছুই তো—। উঃ, কত্তা, কি খেয়েছ তুমি কত্তা ? সরস্বতী শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল।

* * *

লক্ষ্মী বললে মেয়েকে, চুপ কর্, এ কথা কাউকে যেন বলিস না।

পাল কিন্তু নিজেই জানালে যোগেন্দ্রকে। সন্ধ্যাবেলায় তাকে ডাকলে, শোন, এস।

কোথা ?

এস না আমার সঙ্গে।

গাঁয়ের বাইরে বট-বাগানে একটা গাছতলায় বসল পাল, যোগেন্দ্রকে বললে, বস।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গিয়েছিলই, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করছিল। মাথা খারাপ লোক, কখন কি করে বসবে হয়তো!

পাল তার গায়ের আলোয়ানের ভিতর থেকে বের করলে একটি বোতল, তার মুখেই পরানো ছিল কাচের ছোট ওষুধ-খাওয়ার গেলাস একটি।

কি ?—যোগেন্দ্রের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পাল কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে বললে, গৃহজাত। খাও।

সে কি ?

গৃহজাত মানে—লুকিয়ে ঘরে চোলাই করা মদ। সাওড়াপুরের ভল্লা বাগদীরা তৈরি করে নদীর ধারে। এখানকার অনেকে গোপনে কিনে খায়! এ গাঁয়েরও দু-চারজন খায়; চেকা মোড়লই খায়। কিন্তু তা

বলে যোগেন্দ্র খাবে কি বলে? পালই বা খায় কি বলে? বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা তাদের, বয়স হয়েছে, যাকে বলে এক পা ডোঙায় এক পা ডাঙায়। আজ পালের এ কি আচরণ?

ততক্ষণে ছোট গেলাসে খানিকটা ঢেলে ঢুক করে ওষুধ খাওয়ার মত খেয়ে ফেলে পাল বললে, জ্বর পালাতে পথ পাবে না, তিন দিনে গায়ে তাগদ পাবে; আমার মতন খাটতে পারবে।

গেলাসটায় যোগেন্দ্ররে জন্যই খানিকটা ঢালতে ঢালতে সে বললে, ওই শালা চেকা, চেকা শালা একদিন আমাকে বলেছিল। বুঝলে, আমার খানিক আশ্চর্যও লাগত, সবাই জ্বরে ওলটপালট খেলে, ওই শালার একবার বই জ্বর হল না কেন? তা শালাই আমাকে বললে, সেই যে, যেদিন বাই ঠুকে আমাকে ঠাট্টা করেছিল, সেই দিন। বলেছিল —মদ-মাংস খাই, জ্বর আমার কাছে ঘেঁষতে পারে না। তা দেখলাম, হ্যাঁ, দবি্যটা উপকারী বটে। তাগদ আমি পেয়েছি। নাও, খাও।

যোগেন্দ্র সভয়ে সরে বসল। বললে, না।

না লয়, খাও।

ছি ছি, ছি পাল, ছি! এই বুড়ো বয়সে—

ধেৎ তেরি!—পাল ধমক দিয়ে উঠল।—কিসের বুড়ো বয়স হে? বুড়ো বয়স কিসের? বুড়ো বয়স! কই ডেকে আন তোমার কে ছোকরা আছে, আন আমার কাছে। বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্রের জন্য ঢালা গেলাসটি নিজেই সে খেয়ে নিলে।

আশি বছর। আশি বছরে তো সোজা হয়ে বেড়াব হে যগন্দ।

যোগেন্দ্র বললে, কিন্তু ধর্ম আছে তো!

হ্যাঁ, আছে বই কি। আলবৎ আছে। এ তো ওষুধ। ধম্মতে ওষুধ খেতে বারণ করে নাকি? ধম্মতে বলে নাকি, ওষুধ না খেয়ে রোগে ভুগে থকথক করে কেশে কুঁজো হয়ে মর তুমি? যদি বলে তো বলে। ধম্ম আমার ধান তুলে দেবে? ধম্ম! হঠাৎ সে নিজের হাতখানা শক্ত করে যোগেন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিলে। দেখ, শরীরটা কদিনেই কেমন বেঁধেছে দেখ। বুড়ো! বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্র হাতখানা নেড়ে দেখতে বাধ্য হল, কারণ পাল এক রকম হাতখানা তার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছিল। অবাক হয়ে গেল যোগেন্দ্র।

সত্যই, আর সে রকম তুলতলে ঝলঝলে নয় চামড়া। অনেকটা শক্ত হয়েছে। সে স্বীকার করতে বাধ্য হল।

হুঁ। তা হয়েছে।

পাল আবার খানিকটা গেলাসে ঢেলে বললে, তবে খা, খা রে খা, যৈবন ফিরে আসবে। বলে হা-হা করে হেসে উঠল।

যোগেন্দ্র এবার হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু হাসিতে চমকে উঠে বললে, না মাইরি, কি যে হাসছ! এখুনি কে এসে পড়বে! তা হলে আমি খাব না ভাই। পালের হাসি যেন শাঁখের আওয়াজ। কাছাকাছি শাঁখ বাজালে তার শব্দ যেমন কানের ভিতর থেকে মাথার ভিতরে, বুকের ভিতরে, কাঁধ থেকে হাতের শিরায় ধ্বনির রেশ তুলে টান হয়ে উঠে, পালের হাসির গমকগুলো তেমনই ভাবে যোগেন্দ্রের দেহের মধ্যে সুর তুললে। ভয়ও জাগল, আবার চঞ্চলও হল মন, কত কথা মনে পড়ে গেল! যোগেন্দ্র মুখের কাছে নিয়ে গিয়েও ভাবছিল। এঁ কি গন্ধ!

নাক টিপে ধর বাঁ হাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ। বাস্, দে ঢেলে মুখে। বাস ;—বলেই সে আবার হেসে উঠল হা-হা করে।

এই, এই, না, এমন করে হাসলে হবে না—না, না।

তবু থামল না পালের হাসি।

কিছুক্ষণ পর যোগেন্দ্রও হাসছিল পালের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে। কথাটা অবশ্য হাসির কথা। পাল বলছে, এবার পৌষ-লক্ষ্মীর দিনে ভাসান-গান করতে হবে, আগে যেমন হত। আমাদের যে দল ছিল, সেই দলের ভাসান-গান। সেকালে পাল চন্দ্রচূড় সাজত, আবার পায়ে কালি-মাখা ন্যাকড়া জড়িয়ে গোদা মালোও সাজত। পাল এখনও সেই দুটোই সাজতে চায়। আর যোগেন্দ্রকে বলছে, তুই বেউলো সাজতিস, তুই বেউলোই সাজবি।

এই বুড়ো বয়স, ভাঙা মুখ, ফোকলা দাঁত, এই চেহারায় বেউলো? যোগেন্দ্র হাসতে আরম্ভ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাল।

হাসিটা থেমে এল ধীরে ধীরে। দুজনেই চুপ করে বসে রইল, ক্লান্ত হয়েছে দুজনেই ; যোগেন্দ্রের বুকে তো ফিক-ব্যথার মত ধরে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে এই নীরবতার অবসরে তাদের মনের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে পুরানো দিনের কথাগুলি। নিজেদের সেই যৌবন-কালের চেহারা মনে পড়ছে। সেকালের সঙ্গীদের যারা আজ নাই, তাদের মনে পড়ছে। শূরবীরের মত চেহারা সব, কত হৈ-হৈ সে! ভাবনা-চিন্তা ছিল না।

হবে না কেন? খামারে সব গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা দুধালো গাই, কেঁড়ে-ভর্তি দুধ, জালায় জালায় গুড়, পুকুর-ভরা মাছ, পৌষ লক্ষ্মীতে সে কত সমারোহ,—গামলা-ভর্তি করে সরু চাকলি, আসকে পিঠে, ক্ষীরের পিঠে, গুড়তিলের পিঠে! কুড়ি গণ্ডায় এক পণ, সেই পণ দরুনে পিঠে খেত এক এক-জন। মাঘ মাসে মূলো খেতে নাই, লক্ষ্মীর রাত্রে 'মূলোমচ্ছি,' মূলোতে মাছে অম্বল হত। তারপর পড়ত ভাসানের আসর।

পাল চন্দ্রচূড় সাজত, রঙিন পাটের কাপড় পরে পাটের চাদরখানা পৈতের মত বেঁধে আসরে ঢুকত। আসরে জ্বলত সরকারী চল্লিশ-বাতির আলো। শিব শম্ভো! শিব শম্ভো! শঙ্কর! শঙ্কর! আসরখানা গমগম করে উঠত। উঠবার কথা যে। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই-করা ভৈরবমূর্তির দশাশয়ী চেহারা, সেই বাঘা গলায় আওয়াজ, লোকের বুকের ভিতর যেন গুরগুর করে উঠত। মেয়েরা বসত এক দিকে, পুরুষেরা বসত তিন দিকে, সব হাঁ করে চেয়ে থাকত চন্দ্রচূড়ের মুখের দিকে। মেয়েদের মাথার ঘোমটা খসে যেত। পুরুষদের হুঁকোর টান বন্ধ হত। ধীরে ধীরে তাজা কলকে নিবে আসত।

যোগেন্দ্রের ছিল ছিপছিপে মিষ্টি চেহারা, চোখ দু'টি ছিল ডাগর; সে সাজত বেহুলা। গোঁফ-দাড়ি কোনকালেই যোগেন্দ্রের বেশি নয়, তাও কামিয়ে পরচুলো পরে স্ত্রীর বিয়ের বেগুনী রঙের পাটের শাড়িখানা পরে আসরে এসে নামত, সঙ্গে সখী থাকত। মেয়েরা পরস্পরের গা টিপে মুচকি হাসত। পুরুষের চোখে পলক পড়ত না। লখীন্দরের দেহ নিয়ে কলার মাঞ্জাসে সে নদীর জলে ভাসত। বেহুলা বলত শাশুড়ীকে, বাসরে আমার রান্না-করা ভাত আছে, সে ভাত আমার মাটিতে পুঁতে রেখো। কাককে ডেকে বলত, কাক, তুমি আমার বাপের বাড়ি গিয়ে মাকে বোলো, বেউলা জলে ভেসে যাচ্ছে। গান ধরত, "জলে ভেসে যায় রে সোনার কমল!" গোটা আসর হাপুস-নয়নে কাঁদত।

এমন সময় ঠোঁটের কোণে চুন মেখে, গালে কপালে চুনের দাগ এঁকে, পায়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, ভুঁড়ি দুলিয়ে খুঁড়িয়ে নেচে আসরে ঢুকত গোদা মালো। পোশাক পালটে পালই সাজত গোদা মালো; দেখে কার সাধ্য যে বলে, এই লোকই সেই পাথরের মত মানুষ চাঁদ সদাগর। পালের ভুঁড়ি নাচানোর কায়দাটি ছিল অদ্ভুত। সত্যই যেন নাচত ভুঁড়িটি; দেখে আসরসুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়ত। মেয়েরা বাঁকা দৃষ্টি হেনে মুচকি হেসে বলত, মরণ। পৌষ মাস চলে যেত, মাঘ মাসের অন্তত পনরোটা দিন ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই বলত, ওরে, গোদা মালো আসছে। তরুণীর দল পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফিকফিক করে হাসত।

সে দিন আর এ দিন! আজকের দিনকালগুলা যেন ভাসান-গান ভাঙার পর শেষ রাত্রের আসর। চল্লিশ-বাতির চিমনিটা কালো হয়ে যেত কালি পড়ে। পৌষের শেষরাত্রিতে হিম ঝরত চারিদিকে, চট-তালাইগুলা ধূলাকীর্ণ হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে থাকত; আসর আগলে তারা জনকয়েক শুধু প্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বেঁকেচুরে শুয়ে থাকত, দু-চারটে কুকুরও এসে গা ঘেঁসে শুত; খাঁ খাঁ করত চারিদিক। ঠিক তাই। ঠিক তাই। তারাই কজন ভাঙা আসর আগলে বেঁকেচুরে কোনমতে পড়ে আছে। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে।

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, চল, বাড়ি চল।

চল। পালও উঠল।

বাগান থেকে বেরিয়ে এসে কিন্তু দুজনেই দাঁড়িয়ে গেল থমকে। চাঁদের আলোয় আর কুয়াশায় যেন একখানা বকের পাখার মত ধবধবে সাদা মলমলের চাদর দিয়ে ঘুমন্ত মা বসুমতীকে ঢেকে দিয়েছে। মদ অতি সামান্য খেয়েছে তারা। তবু অনভ্যস্ত মস্তিষ্কে তাই চনচন করছে। পাল বললে, চল, মাঠের ধার দিয়ে ঘুরে আসি একটু।

দুজনে এসে দাঁড়াল মাঠের ধারে। দুধ-বরন জ্যোৎস্নার মধ্যে সোনার বরন মেয়ে গা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। দুচোখ ভরে দেখেও আশ মেটে না।

পাল বললে, বগন্দ!

আ-হা-হা পাল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী শুয়ে আছেন, তুমি দেখ।

তাই বলছি যগন্দ, এইবার দিন ফিরল, তুমি দেখো।

যোগেন্দ্র কথাটার ঠিক কি মানে তা বুঝতে পারলে না। পালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাল বললে, এটা পঞ্চাশ সাল। গেল পঞ্চাশ বছর দুখের কাল গিয়েছে যগন্দ, আসছে পঞ্চাশ বছর, দেখো তুমি, সুখের কাল হবে, দেখো, আমি বললাম। এই তিরিশ টাকা মণ চাল, এই মড়ক—এই গেল দুর্ভোগের শেষ। এইবার, দেখ তুমি মাঠের দিকে তাকিয়ে, মা-লক্ষ্মী আবার এলেন।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

পাল বললে, দেখো তুমি, আবার আগেকার মত কাল আসবে। বছর বছর জল হবে। মাঠ ভরে ধান হবে। আবার সব তেমনই হবে। বোসো।

দুজনে বসল সেই শিশিরে-ভেজা মাঠের আলের ঘাসের উপর।

পাল বললে, সাধে বলছিলাম যগন্দ, লক্ষ্মীর রেতে এবারে ভাসানের গান করব। এবার মা লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে এসেছেন। অনেকদিন পরে সত্যি পৌষ-লক্ষ্মী হবে।

তা বটে।

আর একটুকুন লেবে নাকি? পাল আবার বের করলে বোতলটা, আর গেলাসটা মুখে লাগানোই আছে।

দাও। কিন্তু—

কিন্তু কি?

মা-লক্ষ্মী আবার গন্ধ সইতে পারেন না। হাজার হলেও নারায়ণের লক্ষ্মী, বষ্টুমের ঘরের বউ।

হুঁ। একটু ভেবে পাল বললে, তা বটে। তা—

যোগেন্দ্র বললে, বুঝে দেখ তুমি।

ধান কাটা হয়ে যাক, তারপর আর ছোঁব না। বুঝলে? দেখছ তো ধান। এর জোর তো বুঝতে পারছ। নইলে তুলব কি করে? নাও। নিজে খেয়ে পাল গেলাস বাড়িয়ে দিলে যোগেন্দ্রের দিকে।

বা বটে। যোগেন্দ্র হাত বাড়িয়ে নিলে গেলাসটি। জোর অনুভব করছে সে। পাল মিছে বলে নাই, ভোরে একটু খেয়ে মাঠে বের হলে

সেও পালের মত ধান কাটতে পারবে। গোটা মাঠখানা ধানে থইথই করছে। এ ধান নইলে তুলবে কি করে?

আর একটি মনের কথা বলি তোমাকে।

এ গেলাসটা খেয়ে যোগেন্দ্রের গায়ের জোর আর একটু বেড়েছে মনে হল। সে গলাটা সশব্দে বেশ সবল জোয়ানের মত ঝেড়ে নিয়ে মদের স্বাদভরা থুতু ফেলে বললে, কি?

ওই চেকা—

যোগেন্দ্র তার মুখের দিকে তাকালে।

ওই চেকার ধান কেটে ঘরে তোলার আগে আমাকে কেটে ঘরে তুলতে হবে। আমাকে বাই ঠুকে যায় হে! ওঃ।

তা চেকা—

দাঁড়াও না। সকলেরই সুসময় আসছে এই পঞ্চাশ সাল থেকে! ওর ভিরকুটি, টাকার গরম, ধানের গরম এইবার ভাঙবে। মা এসেছেন, তুমি দেখো যগন্দ। এইবারেই দেখো, দেনা-ভুনি শোধ করব আমি। খাজনা-দেনা এক পয়সা বাকি রাখব না। যা থাকবে, থাকবে তোমার অনেক—বিঘে ভুঁই চার বিশ তো ফলবেই, কি বল?

তা খুব।

তা হলেই, আমি হিসেব করেছি, সব দিয়ে-থুয়ে পৌটি তিনেক থাকবে। তিন ভাগ করব—বুঝলে? তিনটি গোলা। একটি সবস্বতীর, একটি লক্ষ্মীর, একটি আমার। এই আমার বরাবর চলবে। এখনও বছর বিশেক বাঁচব আমি, খুব বাঁচব। দুটো গোলা নির্দিষ্ট রেখে দোব আমার কম্মের জন্যে। বাকি যা থাকবে, ওরা যা খুশি তাই করবে।

যোগেন্দ্র বললে, ভাল যুক্তি, ভাল যুক্তি। আমাকেও এমনই বন্দোবস্ত করতে হবে।

করতে হবে নয়, করে ফেলাও।

কাল ভোরে যখন যাবে মাঠে, ডেকো আমাকে। আর বোতলটা বরং নিয়ে এসো, এক ঢোক না খেয়ে তো যেতে পারব না মাঠে।

পাল বললে, আনব। তারপর হঠাৎ যেন তার কথাটা মনে পড়ল, বললে, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি।

কি ?

এর ওপর দুধ ভাল নয়। দুধ খাও তো বিকেলে খেয়ো। এর পর ভাল হল মাংস। তা ভাই, সে তো উপায় নাই। মাছটা বেশি খেয়ো।

মাছ ?—যোগেন্দ্র হাসলে।—পাব কোথা ?

আঃ! জাল-টাল সব গিয়েছে হে।—নইলে—। নইলে বাবুদের সায়রপুকুরে সে-কালের ফিষ্টির রাত্রের মত জাল ফেলে ধরা কিছু বিচিত্র ছিল না মুকুন্দের পক্ষে। শরীরে তার যথেষ্ট জোর আছে। ওই চেকার চেয়ে জোরে ঘুরিয়ে জাল সে ফেলতে পারে—একথা সে বাজি রেখে বলতে পারে। বাবুদের পুকুর কেন ? জাল থাকলে আজ চেকার পুকুরেই ফেলত জাল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

যোগেন্দ্র বললে, ভোরে ডেকো যেন।

চার

মাঠ-থইথই-করা ধান মুকুন্দ কেটে চলে জোয়ানের মত। হা-হা করে হাসছে। যোগেন্দ্রও কাটছে। সেও যেন তাগদ অনেকটা ফিরে পেয়েছে। অন্য সকলেও কাটছে। মুকুন্দ-যোগেন্দ্রের মৃতসঞ্জীবনীর নেশার জোর তাদের নাই, কিন্তু ধানের নেশা তাদের পেয়েছে।

মাঠে মাঠে থাকবন্দী ধান ছোট ছোট ঘরের মত আকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন মেলা বসে গেছে বলে মনে হচ্ছে দূর থেকে। গাড়িতে গাড়িতে সেই ধান ক্রমে ক্রমে ঘরে নিয়ে চলেছে সব। মুকুন্দের কেলে সত্যিই সাবাস জোয়ান, মুকুন্দ এবার তার ওই নাম দিয়েছে। সমানে টেনে চলছে জোয়ান বলদটার ডাইনে থেকে। মুকুন্দ গাড়িতে ধান বোঝাই করছিল। দুখানা জমির ওপারের খানার উপর দিয়েই পড়েছে জমিবরাবর গাড়ির রাস্তা। একখানা গাড়ি চলেছে, হৈ-হৈ করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। কোঠা-ঘরের মত ধান বোঝাই করেছে গাড়িতে। ধুলো উড়ছে। চেকার গাড়ি চলেছে। নইলে এমন গোরু আর কার হবে! হ্যাঁ, চেকাই বটে। ওই যে গাড়িতে বোঝাই ধানের মাথায় বসে আছে, চালের মটকায় হনুমানের মত।

হ কত্তা!

মুকুন্দ দাঁতে দাঁতে টিপে ধরে তার দিকে চাইলে শুধু।

হবে নাকি?—বাই ঠুকছে চেকা, হি-হি করে হাসছে।

পাল একটা মাটির ঢেলা নিয়ে ছুঁড়লে, অবশ্য অন্য দিকে ছুঁড়লে, ছুঁড়ে বলে উঠল, উ-লে-লে-লে। অর্থাৎ হনুমান তাড়াচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠল। সেই হাসি। তারপর সে দুই হাতের মুঠোতে ধরে টেনে তুলতে লাগল ধানের আঁটি। এবারকার ধানে তার আড়াই মুঠোয় বাঁধা আটি। আড়াই হাত তিন হাত লম্বা খড়। ধান তুলছিল আর হাসছিল।

যাঃ শালা! পাল হাতের আটিগুলো ফেলে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। হাঁপ ধরে গেছে হেসে। শালা চেকা। শালা আবার লক্ষ্মীতে অন্নপূর্ণাপুজো কববে এবার। হিংসুটে বদমাস। রক্তের তেজ, জোয়ানীর দেমাক, আর টাকার গরমে ধরাকে সরার মত দেখছে। এবার লক্ষ্মীপুজোয় বারোয়ারী থেকে ভাসান গান হবে ঠিক হয়েছে। ও অমনই অন্নপূর্ণাপুজোর ধুয়ো তুলেছে। তুলুক। দশের লাঠি একের বোঝা। দশজনের চাঁদায় হবে বারোয়ারী। ওর একার পুজো। দেশও এবার লক্ষ্মীছাড়া নয়। উনো লক্ষ্মী এবার দুনো হয়েছেন। মাঠ-ভরা ধানের খামার গোলা ছয়লাপ হয়ে যাবে। দশ টাকা মণ ধানের। পঞ্চাশের পর থেকে মা দুনো হয়েই আসবেন বছর বছর।

* * *

'এস পৌষ বোসো পৌষ-জন্ম-জন্ম থাকো; গেরস্থ ভরিয়ে থাকো দুধে-ভাতে রাখো।' এবার সেই দুধে-ভাতে রাখার পৌষ এসেছে। পঞ্চাশ বছর দুখের পর পঞ্চাশ বছর সুখ। এতদিন পৌষ এসে 'বাউনির বাঁধন' মানে নাই, মাঘ মাস যেতে না যেতে গোলা খালি হয়েছে, খাজনায় মহাজনের পাওনায় সব কর্পূরের মত যেন উবে গিয়েছে। আসছে বছরের খোরাকির জন্য আবার মহাজন ঠিক করতে হয়েছে। এ গাঁয়ের মহাজন ওই চেকা। ওই ওরই দোরে যেতে হয়েছে মানুষকে। এবার যা নমুনা তাতে ওর দোরে আর যেতে হবে না। বছর বছর যদি এমনই পৌষ আসে, মাঠ-থই-থই-করা ধান, খামার-ভর্তি গোলা-ভর্তি ঘর-ভর্তি করা পৌষ, তবে সে পৌষ আর যাবে না। সে

জন্ম-জন্মই থাকবে, গেরস্থকে দুধে-ভাতেই রাখবে। ছেলেপুলে খোরা-পাথর ভরে ভাত খাবে। আবার হবে এই জোয়ান, মোল্যানীরাও হবে আবার দলমলে মেয়ে, তাদের ফুঁয়ে শাঁখ বেজে উঠবে শিঙের মত, এক দুপুর ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটে তুলবে বিশ দরুনে ধান। গোটা বাড়িটা নিত্য নিকিয়ে তুলবে গোবর আর রাঙা মাটির গোলায়, ঘরে থামারের চতুঃসীমায় কোথাও থাকবে না এতটুকু ঝুল কি পাতা কি কুটো কি ময়লা। পৌষ-সংক্রান্তির ভোররাত্রে তারা যখন প্রদীপ জেলে, ধূপ দিয়ে, রঙ-করা চালগুঁড়োর আলপনা এঁকে, শুদ্ধ কাপড়ে, শুদ্ধ মনে পৌষকে বলবে—পৌষ পৌষ বড়ঘরের মেঝেয় উঠে বোসো, পৌষ তখন কি যেতে পারবে? পঞ্চাশ সাল, শয়ে শূন্যের অর্ধেক হল পঞ্চাশ—এটা হল সর্বনাশের বছর। হয়েছেও সর্বনাশ, কাল যুদ্ধে নাকি লাখে লাখে মানুষ মরছে, তিরিশ টাকা মণ চাল, দশ-পনরো টাকা জোড়া কাপড়, নুন নাই, চিনি নাই, ওষুধ নাই, দেশ-ভাসানো বান রোগ-মড়ক, সর্বনাশের আর বাকি কি? কিন্তু অতি মন্দর পরেই নাকি ভাল আসে, শুকনো গাছে ফুল ফোটার মত এবার সেই ভালর নমুনা দেখা দিয়েছে মাঠ-ভরা ধানে। পালের অকাট্য ধারণা তাই। ভাল বছর এইবার থেকে আরম্ভ হল। নিশ্চয়—নিশ্চয় নিশ্চয়। এই চৈত্র নাগাদ যুদ্ধ মিটে যাবে, রোগ এই বসন্তের বাতাস বইলেই দূর হবে। সুবাতাসের মুখে রোগ কতক্ষণ? সুসময় এলে, দুঃখ অভাব সব পালায় আলো ফুটলে দুঃস্বপ্নের মত।

পাল আবার তুলতে আরম্ভ করলে ধানের আঁটি। হাঁপটা এইবার গিয়েছে। ধান-পান তুলে সে একেবারে যাবে পারুলের কবরেজের কাছে। চিকিৎসা করাবে। শরীরটাকে তাজা করতে হবে। বয়স অবশ্য হয়েছে, তবে ষাট বছর কি এমন বয়স? তার বাবার জ্যাঠা ষাট বছর বয়সে ফের বিয়ে করেছিল; সেই স্ত্রীর তিন কন্যে হয়। শুধু তাই নয়, সে স্ত্রী যখন মরে, তখনও বুড়া বেঁচে ছিল, তার পরও সে মাঠে যেত। বাঁচতে তাকে হবে। সমর্থও থাকতে হবে। সরস্বতীর ছেলেটাকে মানুষ না করে সে মরতে পারবে না। তা হলে ওই চেকাই সর্বনাশ করে দেবে। সরস্বতীর উপর নজরও যে সে না দিতে পারে, এমনও নয়। হুসহুস করে সে ধান তুলতে লাগল।

আবার হৈ-হৈ উঠছে। কার গাড়ি আসছে! কিন্তু গাড়ি কই? কোথায়? তবে? কি হল? কার কি হল? কান খাড়া করে পাল শুনলে, কোন্ দিক থেকে আসছে হৈ-হৈ শব্দটা? গ্রামের দিক থেকে মনে হচ্ছে। কার কি হল? বুকটা তার ধড়াস করে উঠল। সরস্বতীর ছেলেটা—? পাল দ্রুতপদে চলতে আরম্ভ করলে।

কে? কে হে? ওহে!—একটা লোক গাঁয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর হাঁটনে চলেছে কোথায়।—কে হে?

আমি শশী।

গাঁয়ে গোল কিসের?

রমণকাকা—

কি, কি হল?

রমণকাকা মারা গেল। ধানের পালুই বাঁধতে বাঁধতে, 'বুকে কি হল' বলে, বাস্। আমি চললাম কাকার জামাইকে ডাকতে।

রমণ পাল মরে গেল! মুকুন্দদের দলের লোক সে। একবয়সী। ভাল লোক, ভাল লোক—বন্ধু লোক। ভাসানের দলে সাজত নারদ মুনি। দিনরাত্রি হরি হরি করেই সারা হত রমণ। পালের চোখে জল রমণকে মনে ক'রে। কিন্তু এইটুকু জোরে হেঁটেই আবার হাঁপ ধরেছে। একটু মৃতসঞ্জীবনী হলে হত। ভাল ওষুধ। বার বার—বার বার মুকুন্দ রমণকে বলেছিল, রমণ, ওষুধটা ভাল ওষুধ, খাও। নইলে পারবে না। রমণ বলেছিল, ছি! না! নারায়ণ নারায়ণ! আমার গোবিন্দ আছেন। মূর্খ—মূর্খ! গোবিন্দ ওষুধ খেতে বারণ করেন না, আর যদিও করেন, তবে যাও ধর্ম নিয়েই স্বর্গে যাও।

পাল ফিরল মাঠের দিকে। ধান পড়ে আছে, গোরু বাঁধা আছে। আজ এ ক্ষেতের ধানটা তুলতেই হবে। শুধু তোলা নয়, আজ কতকটা ধান পিটে, কিছু ধানও বিক্রি করতে হবে। পৌষের আজ হল চব্বিশে। জমিদারের লাটবন্দী যাবে আটাশে। তার আগে খাজনা কিছুটা দিতেই হবে। সে না দেওয়াটা দারুণ অন্যায়। চিরকাল দিয়ে এসেছে। তা ছাড়া লক্ষ্মীর আয়োজন আছে। সরস্বতীর কাপড় ছিঁড়েছে, লক্ষ্মীরও কাপড় চাই, নিজেরও চাই, সরস্বতীর ছেলের একটা দোলাই চাই। পূজা থেকে কাপড় হয় নাই। সে আবার মাঠে এসে

ধান বোঝাই করতে লাগল। হুসহুস করে বোঝাই করে চলল ধান। বাপ রে, বাপ রে, ধান আর শেষ হবে না যেন! এ গাড়িতে আর ধরবে না! বোধ হয় এ-ই বেশি হয়ে গেল। বোঝাই ধানের উপরে বাঁশটা দিয়ে শণের রশি টেনে কষে বাঁধতে বাঁধতে একবার ভাবলে পাল। বেশি হয়েছে কিছু। তা হোক। পরক্ষণেই সে হাসলে। বেশি? হায় রে কলিকাল! সে আমল হলে—হায়, হায়, হায়! সে কাল কি আর আছে? সে আমলে পালের একবার একটা বলদ হঠাৎ মরে গিয়েছিল, এমনই ভর্তি ধান তোলার সময়। গোরুর জন্ত ধান তোলা বন্ধ ছিল না পালের। এক দিকে গোরু জুড়ে, আর এক দিকে নিজে দুই হাতের খাঁজে জোয়াল ধরে বুক দিয়ে টেনে তুলেছিল ধান। আর আজ? এ ধান কটা না হলে চলবে না যে, বরং আরও চারটি হলে ভাল হত। খাজনা, লক্ষ্মীর উয্যুগ, কাপড়। বাঁশটা কষে পাল নিজে গাড়ির মুখটা একবার তুলে দেখলে। হুঁ বেশি হয়েছে!—কি রে কেলে? পারবি না বেটা?

কেলে নিজের নাম বেশ বুঝতে পারে। পালের দিকে চেয়ে সে ফোঁস করে উঠল। পাল হাসলে; হ্যাঁ, পারবি। তোর জন্যে তো ভাবি না রে। ভাবনা—ওই মর্কট জোয়ানটার জন্যে। বেটা আমার জোয়ান! পারে কেবল শিং নাড়তে। নে, চল্ দেখি। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। আপন মনেই পাল গোরু দুটোর সঙ্গে বকতে বকতে গাড়ি জুতলে; ধানের গাদায় লুকানো ছিল সঞ্জীবনী বোতলটা। এক ঢোক খেয়ে শরীরটা চাড়া দিয়ে নিজের শক্তিটা অনুভব করে নিয়ে বললে, চল্, চল্, বেটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ।

গাড়ির জোয়ালটা গোরু দুটার কাঁধে চেপে বসেছে; কেলের পিঠ ধনুকের মত বেঁকেছে, পিছনের পা দুটোর ঠেলা তীরের মত সোজা করতে চাইছে সে। ঘাড়টা টানের চোটে লম্বা হয়ে উঠেছে। নড়েছে। সাবাস বেটা! আচ্ছা! জোয়ানটাও টানছে।—বলিহারি, বলিহারি রে ব্যাটা! বাপ রে—ধন রে—মানিক রে! হ্যাঁয়—হ্যাঁয়—হ্যাঁয়! গাড়ি চলেছে—গাড়ির উপর কোঠা ঘরের মত বোঝাই-করা ধান দুলছে—মা-লক্ষ্মী হেলে-দুলে চলেছেন তার ঘরে।

গাড়িটা থেমে গেল, শব্দ হল একটা ঘ্যাচ করে। একটা আলের কাটে চাকা আটকে গেল। বা দিকে জোয়ান গোরুটাকে তাড়া দিয়ে পাল বললে, শালা, ভাত খাবার যম তুমি! সে কষে দিলে এক পাঁচন লাঠির বাড়ি। গোরুটা টানলে। চাকাটা নড়ল। কিন্তু ওদিকের চাকাটা নড়ল না। কেলে টানছে; মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে তার, কিন্তু চাকা নড়ছে না।

কেলে, লে বেটা, লে। হ্যাঁয়—হ্যাঁয়! কেলে!

চাকা নড়ছে না। কেলে পারছে না টেনে তুলতে।—কেলে! কেলে! পাল খেয়ে নিলে আর এক ঢোক। শরীরটাকে আর একবার চাড়া দিলে। তারপর চাকার কাঠ দুই হাতে ধরে বুক দিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করলে—দাঁতে দাঁতে কষে টিপে। পাকা শাল-খুঁটির মত পালের সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে উঠল। উঠছে, হাঁ, উঠেছে। বহুৎ আচ্ছা। উঠে গেছে গাড়িখানা। আবার চলছে। পালের বুকে, হাতে, মুখেও লেগেছে চাকার ধুলা। শরীরটা যেন সেকালের শরীরের মত ফুলে উঠেছে। হ্যাঁ, ঠিক হ্যায়! সে জোয়ানই আছে। শুধু হাঁপ ধরেছে খানিকটা। বুকের ভিতরটা ধড়ধড় করেছে একটু বেশি। হাঁ, একটু বেশি। পাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গাড়ির উপরে ধানের বোঝাই ঠিক আছে। হেলছে দুলছে। উঃ! বুকটা নিয়ে সোজা হওয়া যাচ্ছে না। এ কি! এ কি হল? আঃ, নাক দিয়ে কি গড়াচ্ছে গরম? আঃ, বুকের ভিতরটা! এক হাত বুকে দিয়ে, আর এক হাতে নাকটা মুছলে। এ কি! এ যে রক্ত! এ কি! থরথর করে কেঁপে উঠল পাল। বুকের ভিতর কেমন করছে। চারিদিক কেমন হয়ে আসছে! চাঁদনী রাতের বকের পালকের মত রঙের মলমলে ঢাকা মা-বসুমতী—! এ কি! তার এ কি হল? সরস্বতী, তার ছেলে, লক্ষ্মী, মাঠ-ভরা ধান, এ ফেলে—। সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলে তার গাড়িতে বোঝাই ধানের আটির ডগা। আটির ডগায় ফলন্ত ধান। জোরে, সজোরে চেপে ধরলে। নইলে পড়ে যাবে সে। গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠার মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠা-ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল। মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত। বারকতক পা দুটো ছুঁড়লে—

নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতে ধূলার উপর, এক মুখ ধূলা কামড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধান-ভরা মুঠা-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পর-মুহূর্তে।

*

সংক্রান্তির শেষরাত্রে পালের বাড়িতে পৌষ আগলাতে উঠে সরস্বতী লক্ষ্মী শুধু কাঁদলে। কাঁদতে কাঁদতেই কোন রকমে পৌষ পুজোর ছড়া বললে। শাখটা বাজাতে গিয়ে বাজাতেই পারলে না।

যোগেন্দ্র উঠে বসে ছিল ঘরে চুপ করে। রমণ মরেছে, মুকুন্দ মরেছে, এইবার—সে দড়াম করে জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

দেবতার ব্যাধি

দীর্ঘকাল পরে বুড়ো হেডমাস্টার চিঠি পেলেন—ডাক্তার গরগরির কাছ থেকে। ডাক্তার গরগরি। কতকাল আগের কথা! অনেক দিন আগের কথা। ঠিক কতদিন হল কারোই মনে নেই। তবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে, এতে আর ভুল নেই।

ছ ফুটের উপর লম্বা একটি মানুষ, পাতলা ছিলছিলে কাঠামো, মাথাটি ছোট, টিয়াপাখির ঠোঁটের মত নাক, চোখ দুটিতে কোন বিশেষত্ব না থাকলেও চোখের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত রুক্ষ—তীব্র। এই ছিল গরগরি ডাক্তারের চেহারা। ডাক্তার এসে উঠল—সন্ন্যাসীচরণ প্রধান মশায়ের নটকানের দোকানে। দোকানের পাশেই ছিল ছোট ছোট দুটি কুঠুরি—সেই কুঠুরি দুটি ভাড়া নিয়ে প্রথমেই টাঙিয়ে দিলে দুটি টিনের পাতে লেখা সাইনবোর্ড। একটায় ইংরেজীতে লেখা—Doctor Gargari, Experienced Physician। অপরটায় বাংলায় লেখা—ডাক্তার গরগরি, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। লোকে ঠাট্টা করে নাম দিলে ডক্টর গ্রে-গ্রবী।

রাঢ়দেশের পল্লীগ্রাম—গণ্ডগ্রাম অবশ্য বলা চলে, সপ্তাহে দুদিন হাট বসে, ছোটখাট বাজারও বসে; মিষ্টির দোকান, নটকানের দোকান, কাপড়ের দোকান, মনিহারি দোকান, কাটা কাপড়ের দোকান না থাকলেও বৈরিগী খোঁড়া আর তিনু মিয়া দুজনের দুটো সেলাইয়ের কল চলে—একটা বাজারের এ-মাথায় একটা ও-মাথায়। কিন্তু বাজার হাট—সব এই দিকে হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের যাকে বলে মুখপাত, সেটা এদিকে নয়। সেটা হল ভদ্রলোক-পল্লীতে। সে আমলের কথা। তখন টাকা-পয়সা যার যত থাক, জমিদারেরাই ছিল সমাজের প্রধান।

গ্রামটির ভদ্রলোক-পল্লীটির চেহারা ছিল—বেঙাচি-ভরা খিড়কি ডোবার মত। জমিদারে জমিদারে প্রায় শিবময় কাশীধামের মত অবস্থা। বছরে পঞ্চাশ-একশো-দুশো, পাঁচশো-হাজার-দুহাজার আয়ের জমিদার সব। তিন-চার ঘর চার-পাঁচ-হাজারী, এক ঘর পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে বাড়ছেন দিন দিন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত। ঘরে ঘরে মজলিস বসে, কাছারি হয়, খানা-পিনা গীত-বাদ্য হয়, রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত আসর সরগরম থাকে। ডাক্তার ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্ন্যাসী প্রধান মশায়কে বললে, আই ডোণ্ট কেয়ার। ইউ আণ্ডাস্ট্যাণ্ড মিঃ প্রডানা ?

সন্ন্যাসীচরণ ইংরেজী বুঝত না। সে ডাক্তারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, কি বলছেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার গরগরি বললে, ওদের আমি গ্রাহ্যও করি না। বলে হাসলে। বোধ হয় কথাটাকে একবার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বললে, আপনাদের ওই জমিদারদের।

তারপর ডাক্তার বের হল—সাজগোজ করে বিকেলবেলা বেড়াবার জন্যে। ডক্টর বলে, ইভিনিং ওয়াক। মর্নিং ওয়াক অবশ্য সব চেয়ে ভাল, বাট, ইউ সি, ভোরে ঘুম আমার ভাঙে না। আবার হেসে বলে, ইট ইজ এ ডক্টর'স ডিজিজ। সব বড ডাক্তারের ঘুম ভাঙে নটার পর। বলে সে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে বেরিয়ে পড়ল। ছ ফুট লম্বা ডাক্তারের মাথায় একটা গুজরাটী কালো টুপি, গায়ে হাঁটু-পর্যন্ত-ঝুল চায়না কোট, পরনে সাদা থান কাপড়, পায়ে সে আমলের হুডবার্নিশ—পায়ে স্প্রিং-দেওয়া জুতো। মুখে একটি সিগার। কড়া সিগারের গন্ধে রাস্তার লোক নাকে কাপড় দেয়। ডাক্তার তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, আনসিভিলাইজ্‌ড ক্রীচার্স। ডাক্তারও নাকে রুমাল দেয় বাড়ির পাশের ড্রেনগুলো দেখে। বলে, ডার্টি, নুইসেন্স! তার বেশভূষার দিকে হাঁ করে যারা চেয়ে থাকে, তাদের সে বলে—হামবাগ!

পশ্চিম রাঢ়ের পল্লী, লোকদের কথায় বিচিত্র টান, ঐ-কার, এ-কার চন্দ্রবিন্দু, ড়-কারের ছড়াছড়ি ; 'গিয়েছে' 'হয়েছে' স্থলে বলে—'গৈছে'

'হইছে' ; 'কেন'কে বলে—'কেনে' ; 'খেয়েছি'কে বলে—'খেঁয়েছি' ; "হার'কে—'হাড়', রাম'কে বলে—'ড়াম'। নিতান্ত নিম্নস্তরের লোকে আবার 'রাম'কে বলে—'আম' আর 'আম'কে বলে—'ড়াম'। ডাক্তার শুনে বলে, বারবেরিয়ানস ব্রুটস্! বাংলাতে বলে, অনার্য—বর্বরের দেশ।

বাজারের ভিতরের রাস্তাটা ধরে সে বরাবর চলে গেল ইস্কুলের দিকে। এখানে একটি এম. ই. ইস্কুল আছে। পথে থানা। সে আমলের থানা, খানকয়েক চেয়ার, দুখানা টেবিল থাকলেও তক্তাপোশের আধিক্য ছিল বেশি ; দারোগাবাবুর ভুঁড়ি ছিল ; তক্তাপোশের উপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে পান চিবুচ্ছিলেন আর গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। হঠাৎ এই এমন সজ্জায় সজ্জিত ডাক্তারকে দেখে তিনি ডাকলেন, চামারী সিং, দেখো তো—উ কৌন্ যাতা হ্যায়!

চামারী সিং পালোয়ান লোক, সে এসে গম্ভীরভাবে বললে, এ বাবু সাব!

মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে ডাক্তার অল্প একটু পাশ ফিরে বললে, ইয়া-স! 'ইয়েস'কে ডাক্তার বলে—'ইয়া-স', লম্বা করে টেনে উচ্চারণ করে।

চামারী ঈষৎ চকিত হয়ে গেল, বললে, আপকে দারোগাবাবু বোলাতে হে।

হোয়া-ট? বোলাতে হেঁ? হোয়াই? কাহে? আই অ্যাম নট এ চোর, নট এ জুয়াচোর, নায়দার এ ডেকইট—নর এ ফেরারী আসাইমী। দেন, হোয়াই? থানামে কাহে যায়েগা?

চামারী উত্তরোত্তর ভড়কাচ্ছিল, তবুও সে থানার জমাদার লোক, বললে, কেয়া নাম আপকে? পাতা কেয়া? কাঁহা আয়ে হ্যায় হিঁয়া—বাতাইয়ে তো।

ডাক্তার পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে চামারীর হাতে দিয়ে বললে, সব লিখা হায় ইসমে। দেও তোমহারা দারোগা-বাবুকো।—বলেই আবার চুরুটটা মুখে দিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে অগ্রসর হল।

পথে কয়েকটা কুকুর টুপি-পরা অপরিচিত এই মানুষটিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল। ডাক্তার হাতের ছড়িটা তুললে বিরক্তি

ভরে; দেখতে শৌখিন হলেও তার ছড়িটা বাবুছড়ি নয়—দস্তুরমত যষ্টি। পাকা বেতের এবং মোটা, অর্থাৎ বেড়ে প্রায় সে আমলের ডবল পয়সার মত, তার ওপর ডাক্তারের মত লম্বা মানুষের উপযুক্ত লম্বা; দু-চার ঘা বেশ দেওয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেলে ডাক্তার ছড়ি নামিয়ে নিলে। কুকুরগুলোকেই বললে, দ্যাট্স গুড। বিশ্বাসী গ্রামভক্ত কুকুর! এঁটো-কাঁটার নুন খেয়ে নিমকহালাল! অ্যাঁ! দ্যাট্স গুড!—বলেই আবার অগ্রসর হল।

গ্রামের প্রান্তে এম. ই. ইস্কুল। খড়ো বাংলো-ধরনের লম্বা বাড়ি। পাশেই একটা কোঠাঘরে হেডমাস্টার থাকেন। প্রবীণ লোক। বাসার সামনে বেঞ্চি পেতে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন, আর খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সে আমলের কাগজ—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, অবশ্য ইংরেজী। ডাক্তার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। হ্যালো, আর ইউ দি ভেনারেবল হেডমাস্টার অব দি স্কুল?

হেডমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। ইয়েস।—বলে সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডাক্তার বললে, গুড ইভনিং! তারপর নিজের একখানি কার্ড বের করে হেডমাস্টারের হাতে দিয়ে বললে, এখানে প্র্যাক্‌টিস করতে এসেছি আমি। বাট ইউ সি, জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন। আই হ্যাভ কাম টু আস্ক ইউ টু বি এ ফ্রেণ্ড অব মাইন।

হেডমাস্টার হেসে বললেন, বসুন—বসুন।

লেট মি হ্যাভ ইওর হ্যাণ্ড ফার্স্ট। মাস্টারের হাতখানি নিয়ে হ্যাণ্ডশেক করে ডাক্তার বসল।

মাস্টারমশায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় উঠেছেন? এখানে কেউ জানাশোনা আছে কি না? দেশে কে কে আছে? কোথায় দেশ? কেমন অবস্থা—সে কথাও ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন।

বেঞ্চের উপর বসে ডাক্তার তার লম্বা পা দুখানির একখানি নাচাতে নাচাতে উত্তর দিলে আর চুরুট টানলে। শেষের প্রশ্নের উত্তরে বললে, দেশ কলকাতার কাছেই। মা আছেন, তিনি থাকেন কাশীতে; স্ত্রী আছেন, পুত্র আছেন—কন্যাও আছেন। গরিব মানুষ আমি হেডমাস্টার—এ পুয়োর ম্যান।

মাস্টার প্রশ্ন করলেন, এইখানেই যখন থাকবেন, তখন নিয়ে আসবেন তো এখানে ?

ডাক্তারের পা দুটো ঘন ঘন নাচতে আরম্ভ করলে।—না হেডমাস্টার, সে আইডিয়া আমার নাই।

তা হলে ? তাঁরা সেখানে থাকবেন কার কাছে ?

ও !—ডাক্তার বললে, তাদের আমি বাপের বাড়িতে, আই মীন, আমার শ্বশুর-বাড়িতে রেখে এসেছি। সেইখানেই তারা থাকবে। একটু চুপ করে থেকে অনেকটা যেন হঠাৎ আবার বললে, ইয়া-স হেডমাস্টার, সেইখানেই তারা থাকবে। এখানে আনার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

এর পরে সে প্রায় চুপ করেই গেল এবং অত্যন্ত দ্রুতভঙ্গীতে পা নাচাতে আরম্ভ করলে।

হেডমাস্টার বললেন, চলুন, আমি যাব গ্রামের দিকে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ হবে। চলুন।

ডাক্তারও উঠে দাঁড়াল—সন্ধ্যার আবছাওয়ার মধ্যে টুপি মাথায়, চায়না-কোট-পরা, লম্বা লোকটিকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, স্থির সুদীর্ঘ একটি রেখার মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে, গুড নাইট হেডমাস্টার।

সে কি ? গ্রামের মধ্যে যাবেন না ?

নো। মাফ করবেন হেডমাস্টার। তাঁরা সব ধনী ব্যক্তি, পুরুষানুক্রমে জমিদার। আমি একজন গরিব মনুষ্য। খেটে খাই। ওয়াটার অ্যাণ্ড অয়েল, ইউ সি, হেডমাস্টার—কখনও মিশ খায় না। গুড নাইট !

কথাটা অজানা রইল না কারুর। জানাতে অবশ্য বারণ করে নি ডাক্তার, কিন্তু ঢাক বাজিয়ে বলার মত ইচ্ছেও তার ছিল না। ঢাক বাজিয়ে যে কথাই বলতে যাক, তাতে গলাই শুধু উঁচুতে চড়ে না, রঙ চড়ে, কথাও ফলাও হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। গাঁয়ের বাবুপাড়ায় কথাটা ঘোরালো এবং জোরালো হয়ে আলোচিত হতে আরম্ভ হল। কেউ বললেন, ডাক্তার বলেছে—গুণ্ডার দল সব। না কামিয়ে দর্জি। বাপের পয়সায় খায় নিষ্কর্মার দল। মাতাল। লম্পট। অত্যাচারী।

ডাক্তারও শুনলে। শুনে হেসে বললে, ওরা নিজেরা নিজেদের সত্যি বিশেষণগুলো রাগের মাথায় আমার কথা বলে বলে ফেলেছে। ওর কোনটা আমার কথা নয়।

কেউ বললে, ডাক্তার বলেছে—ইতর, ওদের আমি ঘেন্না করি। বলে থু থু করে থুথু ফেলেছে।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললে, না। এ কথা আমি বলতে পারি না।

বাবুরা বললে, দেখে নেব আমরা।

ডাক্তার একবারও কোন জবাব দিলে না। শুধু হাসলে।

বাবুরা প্রায় হুকুম জানিয়েই প্রচার করে দিলে, ওকে বাবুরা কেউ ডাকবেই না। অন্য লোকেও যেন না ডাকে। দারোগাবাবুর সঙ্গে বাবুদের খুবই সদ্ভাব। দারোগাবাবুও সে মজলিসে ছিলেন।

সন্ন্যাসী প্রধান বললে, ডাক্তারবাবু, কাজটা ভাল হচ্ছে না। চলুন, একদিন বাবুদের ওখানে যাই। গেলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে।

ডাক্তার নিবানো আধখানা চুরুটটা কামড়ে ধরে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে ফেললে, বললে, বাবুরা আপনার যদি ক্ষতি করতে পারে বলে মনে করেন সন্ন্যাসীবাবু, বলবেন আমাকে, আমি তা হলে চলে যাব আপনার এখান থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ব্যাপার ঘটে গেল; বাবুদের টমটমে চামারী সিং ছাতা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল একটি ছেলেকে—দশ-বারো বছরের ছেলে। ছেলেটি চীৎকার করে উঠল, ও মাগো—ও বাবারে! প্রায় সে নেতিয়ে পড়ে গেল টমটমের উপর। চামারী সিং ব্যস্ত হয়ে উঠল, টমটমের কোচম্যানকে বললে, রোখো। গাড়িটা দাঁড়াল।

চামারী লাফ দিয়ে নেমে সন্ন্যাসীকে বললে, থোড়া পানি দিবেন তো প্রধান মাশা।

ডাক্তার উঠে এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে। ছেলেটি পেট ধরে কাতরাচ্ছে। চামারী জল আনতেই ডাক্তার প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে এর?

চামারী বললে, দারোগাবাবুর লড়কা।

লড়কা তো বটে। কি হয়েছে?

প্রধান বললে, ভারি দুঃখের কথা ডাক্তারবাবু, ছেলেটির এই বয়েসেই অম্বলশূল হয়েছে।

আই সি। তা, এই রোদ্দুরে এই অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

কালীতলা। পাশের গাঁ দেবীপুরে ভারি জাগ্রত কালীমা আছেন, সেইখানে যাচ্ছে। ফি মাসে অমাবস্তেতে যেতে হয়। কালীমায়ের ওখানেই পড়েছে শেষ পর্যন্ত।

হুঁ। কে বললে—শূলবেদনা?

মা-কালীর ভরণে বলেছে।

ডাক্তার বললে, হামবাগ।

চামারী বিব্রত হয়ে প্রধানকে বললে, কি করি হামি প্রধান মাশা?

ডাক্তার নিজেই ছেলেটিকে কোলে নিয়ে নিজের ঘরে এনে শোয়ালে। চামারীকে বললে, বোলাও তোমার দরোগাবাবুকে। যাও বলছি।

ডাক্তার দারোগাকে বললে, শূল-ফুল নয়। এ আপনাদের মা কালীর বাবারও সাধ্যি নাই যে ভাল করে দেয়। বুঝলেন?

দারোগা অবাক হয়ে গেলেন, বিশেষ করে ডাক্তার যখন মা-কালীর বাবা তুলে জোর দিয়ে বললে, তখন আর তিনি কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। কারণ কালীকেই তিনি ভাল করে জানেন না, কিন্তু ডাক্তার তার বাবার সংবাদ পর্যন্ত জানে। সে ক্ষেত্রে তিনি আর কি জবাব দেবেন?

ডাক্তার বললে, আমি ভাল করে দিতে পারি। কিন্তু ফী দু টাকা ওষুধের দাম এক টাকা—তিন টাকা লাগবে। ভাল না হয় টাকা ফেরত দেব আমি।

দারোগা বললেন, ওষুধ দিন, আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চুরুটে টান দিয়ে ডাক্তার হঠাৎ অত্যন্ত নিরাসক্ত হয়ে বললে, ধারে কারবার আমি করি না।

চামারী সিং দৌড়াল। সন্ন্যাসী ব্যস্ত হয়ে বললে, আমি টাকা দিচ্ছি ডাক্তারবাবু।

দেবেন তাতে আমার আপত্তি কি আছে? কিন্তু আপনি ফের পাবেন তো?

ডাক্তার ওষুধ দিলে। একটা পুরিয়া আর এক দাগ ওষুধ! বললে, পাইখানা হবে। ভয় পাবেন না।

দারোগা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন।—পাইখানার সঙ্গে নাড়ীর মত লম্বা কি বেরিয়েছে! ডাক্তার বললে, শূল বেরুচ্ছে। কৃমি—কৃমি। ছেলের পেটে কৃমি ছিল।

এত বড় কৃমি?

হ্যাঁ! ভাল হয়ে গেল শূলবেদনা। যান, বাড়ি যান। তারপর আবার বললে, আপনার মাথাতেও দেখছি কৃমি আছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন যে বড়! হাসতে হাসতে আবার বললে, ওর ওষুধ আমার কাছে নাই। যান, বাড়ি যান। প্রধান মশাইয়ের টাকা তিনটে দিয়ে দিবেন। বুঝলেন?

* * *

এক চিকিৎসাতেই ডাক্তারের পসার জমে গেল। দারোগা প্রত্যেককে বললেন, ধন্বন্তরি—সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

ডাক্তার এতেও হাসে। এ হাসি কিন্তু অন্য রকম। ডাক্তারের কথায় যে একটা ধারালো ভাব আছে, সেটা নেই এ হাসিতে। সন্ন্যাসীচরণও একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। ডাক্তার সন্ধ্যায় হেডমাস্টারের ওখানে যেতেই হেডমাস্টার হেসে বলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, রাতারাতি বিখ্যাত ব্যক্তি।

ডাক্তার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে লম্বা ঘাড়টা একটু তুলে আপন মনে চুরুট টেনে যায়। আসর জমে না।

হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে চুরুটটার দিকে তাকিয়ে বলে, নাথিং হেডমাস্টার।

তবে?

ডাক্তার কোন উত্তর না দিয়ে বসে থাকে চুপ করে। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে, আকাশে তারা ফুটে ওঠে। ডাক্তার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বলে, হেডমাস্টার!

বলুন।

এগুলো ঠিক আমি পছন্দ করি না।

কি? কি পছন্দ করেন না? ব্যাপারটা কি বলুন তো?

ব্যাপার কিছু নয়। এই যে অনাবশ্যক—অনুচিত—অবাঞ্ছনীয় কৃতজ্ঞতা। দারোগার ছেলেটার কৃমি হয়েছিল পেটে, অত্যন্ত সাধারণ

সোজা অসুখ—এক পুরিয়া স্যান্টোনাইন, এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েলে ভাল হয়ে গেল ; আমি তার জন্যে দু টাকা ফীজ—এক টাকা ওষুধের দাম নিয়েছি। তবুও দারোগা আমার প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে গেল, চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছে, আমি ধন্বন্তরি। এগুলো অত্যন্ত—অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় মনে করি।

হেডমাস্টার অবাক হয়ে গেলেন। কি বলছেন ডাক্তারবাবু? মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

না—ডাক্তারের কণ্ঠস্বর যত রূঢ় তত দৃঢ়। হেডমাস্টার খানিকটা আহত হলেন মনে মনে, ডাক্তারের কথা বলার এই ধরনের জন্য। তিনি একটু চুপ করে থেকে বেশ শক্তভাবেই জবাব দিলেন, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না আমি।

ইউ আর এ ফু-ল।

কি বলছেন আপনি?

ইউ ডোণ্ট নো হেডমাস্টার, ইউ ডোণ্ট নো। এই ধরনের কৃতজ্ঞতা ব্যাড—ভেরি ব্যাড, অত্যন্ত খারাপ।

হেডমাস্টার দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে উঠলেন, কখনও না। এটা আপনার মনের দোষ।

ডাক্তার আবার বললে, ইউ আর এ ফু-ল।

এর পর ডাক্তারের সঙ্গে হেডমাস্টারের আরম্ভ হয় ঈষদুষ্ণ তর্ক। ক্রমশ সে উষ্ণতা বাড়তে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর—অত্যন্ত রূঢ় তীব্র উচ্চধ্বনিতে চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল। বলতে ভুলেছি, ডাক্তারের কণ্ঠস্বরটাই তীক্ষ্ণ, সরু আওয়াজ, কিন্তু ডাক্তারের আকৃতির মতই প্রস্থে কম হলেও ছ ফুট উচু ডাক্তারের মতই বর্শাফলকের মত দীর্ঘ এবং ধারালো।

ইস্কুলের সঙ্গে সঙ্গে লাগাও একটা ছোট বোর্ডিং আছে,—এই বাদ-প্রতিবাদের উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে ছেলেরা অন্ধকারের মধ্যে অদূরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই হেডমাস্টার চুপ করে গেলেন। তিনি আসন ছেড়ে উঠে স্থানত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন ছেলেদের সঙ্গে। ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর উঠল এবং উচ্চস্বরে বললে, হেডমাস্টার, আমি চললাম। গুড নাইট!

কয়েক দিনের মধ্যেই ডাক্তারের খ্যাতি আরও বেড়ে গেল। খ্যাতি বইকি। সু কিংবা কু সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা যে ডাক্তারের বাড়ল তাতে আর সন্দেহ নেই। লোকে বলতে লাগল, ভারি তেজী ডাক্তার। আগুন একেবারে।

কেউ বললে, ডাক্তার ভাল হলে কি হবে, যেমন দুর্মুখ তেমনই চামার।

কেউ বললে, পাষণ্ড।

দারোগা একদিন নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন, ডাক্তার তাঁকে প্রায় হাঁকিয়ে দিয়েছে।—না না না, ওসব আমার অভ্যেস নেই। রোগীর বাড়ি ফীজ নিই, চিকিৎসা করি। নেমন্তন্ন খাই না।

মানুষ মরছে, কি মরে গেছে—সেখানেও ডাক্তার ফীয়ের জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দয়ার জন্যে কেউ কাকুতি করলে বলে, দয়া করতে আমি আসি নি এখানে স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়ি ছেড়ে। ফীজ ছাড়তে আমি পারব না। না দিতে পার, ডেকো না আমাকে।

হেডমাস্টারকে বলে—হেডমাস্টারের সঙ্গে পরের দিনই আবার মিটে গেছে—বিনা বেতনে আগেকার গুরুদেবের মত ছেলে পড়াতে পারেন আপনি?

হেডমাস্টার চুপ করে থাকেন। এই উগ্রমস্তিষ্ক লোকটির সঙ্গে কোন মতামত নিয়ে আলোচনা করতে তিনি চান না। বিশেষ করে যেখানে সামান্য মত-বিরোধের সম্ভাবনা থাকে।

ডাক্তার পা নাচাতে শুরু করে। চুরুট টানতে টানতে বাঁকা সুরে বলে, অবশ্য এর চেয়ে তাতে লাভ বেশি হেডমাস্টার।

হেডমাস্টার মৃদু হাসেন।

ডাক্তার বলে, আরুণি গুরুর আল বাঁধতে গিয়ে জল আটকে শুয়ে থাকে। উতঙ্ক দেবদুর্লভ কুণ্ডল এনে দেয় গুরুপত্নীর জন্য। শুঁড়ো থেকে, গোরু থেকে ধন-রত্ন মণি-মাণিক্য সব পাওয়া যায়। এমন কি শিষ্যের জীবনও চাইলে পাওয়া যায়।

আবার একটু চুপ করে হেসে বলে, আমি ঠিক জানি না তবে আমার মনে হয়, আরও বহুতর গুরুদক্ষিণার উপাখ্যান পুরাণে উল্লিখিত

হয় নাই। আমি যদি ডাক্তার না হতাম হেডমাস্টার, তবে এগুলো নিয়ে রিসার্চ করতে পারতাম।

ব্যাপারটা চরমে উঠল। একটা সদনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী তরুণ অনেক জল্পনা-কল্পনা করে একটি সেবা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করলে। দরিদ্র গৃহস্থকে সাহায্য, অনাথ-আতুরের সেবা করবে তারা। প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়িতে একটি করে ভাঁড় দিয়ে বলে গেল, দৈনন্দিন গৃহস্থের খোরাকির চাল থেকে এক মুঠো করে এই ভাঁড়ে তুলে রাখবেন। সাত দিনের সাত মুঠো চাল রবিবারে এসে নিয়ে যাব। এ ছাড়া অবশ্য ভদ্রলোকদের, ব্যবসায়ীদের কাছে মাসিক চাঁদাও তারা পাবে।

তারা ডাক্তারকে এসে বললে, আপনার কাছে টাকা সাহায্য আমরা নেব না। আপনাকে আমাদের ডাক্তার হিসাবে সাহায্য করতে হবে।

ডাক্তার প্রায় ক্ষেপে গেল। সোজা বলে দিলে, থিয়েটার কর তো চাঁদা দেব। মদ খাও, গাঁজা খাও, তাতে কোনদিন পয়সার অভাব হয়, আমার কাছে এস। কিন্তু এসব চলবে না।

তারা অবাক হয়ে গেল।

ডাক্তার বললে, যাও, যাও। ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট!

একজন রুখে উঠল, কি বলেন আপনি?

ডাক্তার বললে, আমি বলছি—গেট আউট। চলে যাও এখান থেকে।

গোটা গ্রাম জুড়ে এবার ডাক্তারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন উঠল। জনকতক ছেলে ডাক্তারকে প্রহার দেবার জন্য ষড়যন্ত্র করলে। জনকতক তাকে বয়কট করবার চেষ্টা করতে লাগল, অন্য ডাক্তার আনবার জন্য।

ডাক্তার কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। দাওয়ার উপর চেয়ারখানিতে বসে পা দোলাতে লাগল। প্রধান মশায় কিছু অস্বস্তি বোধ করছিল। অদ্ভুত মানুষ! লোকের অনুরাগে বিরাগে সমান নিস্পৃহ। নিঃসন্দেহে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর। লোকটি গ্রামের লোকের প্রীতি অনুরাগ সব কিছুকে কর্কশভাবে উপেক্ষা করে অপমানিত করে তারই ঘরে

রয়েছে, এতে তার মন খানিকটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে পারছিল না। কিন্তু উপায় নেই, ডাক্তার পুরো বছরের ভাড়া দিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া, তার ব্যবহারে রূঢ়.কর্কশ যাই হোক, অন্যায্য কিছু নেই। সে তিক্ত অথচ শঙ্কিত দৃষ্টিতেই নিজের গদিতে বসে আড়চোখে ডাক্তারের দিকে প্রায় চেয়ে দেখে।

ডাক্তার শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে চুরুট টানে।

হঠাৎ যেন ডাক্তার উদাসীন হয়ে গেল। এটা নজরে পড়ল সর্বাগ্রে প্রধানের। সে কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলে না। তারপরই লক্ষ্য করলেন হেডমাস্টার। ডাক্তার যেন অতিরিক্ত মাত্রায় স্তব্ধ। তর্ক প্রসঙ্গে অত্যধিক উগ্র হয়ে ওঠার পর ডাক্তার অনেক সময় স্তব্ধ হয়ে থাকে। হেডমাস্টার লোকটিকে ভালবেসেছেন। তিনি তখন বলেন, কি মশাই? এখনও আপনার রাগ গেল না?

ডাক্তার তাতেও উত্তর না দিলে হেসে মাস্টার বলেন, অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না, আমিও চীৎকার করব না, রাগ যদি না মিটে থাকে তো আমাকে নয় দু ঘা মেরেই রাগটা মিটিয়ে ফেলুন।

ডাক্তার তাতে হেসে ফেলে। কিন্তু এবারে স্তব্ধতার সে রকম কোন কারণ নেই। তা ছাড়া এ স্তব্ধতার ধরনটাও অন্য রকমের। ডাক্তার শুধু স্তব্ধই নয়, অত্যন্ত অন্যমনস্ক, চুরুট থাওয়ার মাত্রাও বেড়ে গেছে। তর্কে পর্যন্ত রুচি নেই।

হঠাৎ উঠে ডাক্তার চলে যায়; খানিকটা গিয়ে বোধ হয় মনে পড়ে বিদায়-সম্ভাষণের কথা। থমকে দাঁড়িয়ে বলে, গুড নাইট হেডমাস্টার!

হেডমাস্টার প্রশ্ন করেন নানাভাবে, কি হল ডাক্তার?

চুরুট টানতে টানতে ডাক্তার বলে, নাথিং হেডমাস্টার!

বাড়ির খবর ভাল তো!

ভাল। হুঁ, ভাল। গুড নাইট হেডমাস্টার।—ডাক্তার উঠে পড়ে।

হেডমাস্টার চিন্তিত হলেন। কয়েকদিনই ডাক্তার আসছেন না। নিজেই সেদিন গেলেন তিনি ডাক্তারের ওখানে। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল না। ডাক্তার বেড়াতে বেড়িয়েছে। প্রধান মশায় ছিলেন দোকানে। তিনি সসম্ভ্রমে মাস্টারকে বসতে দিলেন তাঁর দোকানের

সবচেয়ে ভারী চেয়ারখানায়। 'তামাক, তামাক' করে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মাস্টার বললেন, থাক্। ব্যস্ত হবেন না প্রধান মশায়। আমি তো রয়েছি। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা না করে যাচ্ছি না। ধীরে-সুস্থে আসুক না তামাক।

প্রধান বললেন, আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেল মাস্টার মশায়। ডাক্তার হয় ক্ষেপে গেছে, নয়, ছ-মাসের বেশি বাঁচবে না। হঠাৎ আর এক রকম হয়ে গেল।

বলেন কি?

হ্যাঁ গরীব-দুঃখীর কাছে ফীজ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, ওষুধও অনেককে বিনা পয়সায় দিচ্ছে। আবার কাউকে কাউকে পথ্যের জন্যে পয়সাও দিচ্ছে।

হেডমাস্টার হাঁপ ছাড়লেন। বরাবরই তাঁর সন্দেহ ছিল। মনে হত, এ কঠোরতাটা তার অস্বাভাবিক, ধার-করা, ছদ্মবেশের মত। যাক, লোকটা তা হলে স্বাভাবিক হয়েছে।

ডাক্তার ফিরল প্রায় রাত্রি নটার সময়। নিস্তব্ধ পল্লীর পথ। ডাক্তার গান গাইতে গাইতে আসছিল; অবশ্য মৃদুস্বরে গান! হেডমাস্টারকে দেখে স্মিতহাস্যে সে বললে, হেডমাস্টার!

হ্যাঁ।—হেডমাস্টার উঠে ডাক্তারের হাত চেপে ধরে বললেন, আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড—আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড ডক্টর। সব শুনলাম।

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললে, কি শুনলেন হেডমাস্টার।

হেসে হেডমাস্টার বললেন, আপনার গান তো নিজে কানেই শুনলাম। তারপর শুনলাম, আজকাল আপনার ছদ্মবেশ ফেলে দিয়েছেন! গরীব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় দেখছেন, ওষুধও দিচ্ছেন অনেককে বিনা পয়সায়, কাউকে কাউকে পথ্যের পয়সাও দিচ্ছেন। আমার সন্দেহ বরাবরই ছিল ডাক্তার।

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললে, এক কালে—প্রথম যৌবনে মাস্টারমশাই—! আজ আর সে হেডমাস্টার বললে না, বললে মাস্টার-মশাই।—আমি সেবাধর্মকে গ্রহণ করেছিলাম জীবনের ব্রত হিসাবে। বিবাহ করি নি। সংকল্প ছিল এমনি ভাবেই জীবন কাটিয়ে দেব। সে কি আনন্দ, সে কি তৃপ্তি! কিন্তু—। ডাক্তার চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ

চুপ করে থেকে ডাক্তার বললে, কিন্তু উপকারের ঋণ বড় মারাত্মক ঋণ, মাস্টারমশাই। আর মানুষ বড় ভাল—অত্যন্ত ভাল, এ ঋণ শোধ করতে তারা—। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বললে, জীবন দিতে পারে মানুষ। ডাক্তার আবার চুপ করে গেল। এবার বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তারপর বললে, গুড নাইট হেডমাস্টার!

পরের দিন হেডমাস্টার প্রত্যাশা করেছিলেন—ডাক্তার আজ আসবে, কিন্তু ডাক্তার এল না। তার পরের দিন সকালেই প্রধান এসে সংবাদ দিলে, ডাক্তার চলে গেছে কাল রাত্রে।

চলে গেছে!—হেডমাস্টার চমকে উঠলেন। চলে গেছে? ব্যাপার কি?

ঘাড় নেড়ে প্রধান বললে, জানি না। যাবার সময় শুধু বলে গেল—তক্তাপোশ চেয়ার এগুলো আপনি নেবেন প্রধান মশায়। ওষুধপত্রগুলো সদর শহরের ডাক্তারখানায় দিলাম। চিঠি লিখে দিলাম একটা—তাদের লোক এলে দিয়ে দেবেন। শেষ কথা বললে—দয়া ধর্ম একবার যখন করেছি, তখন আর এর জের মিটবে না। এ আর বন্ধ হবে না। সুতরাং এখানে আর থাকা চলবে না।

হেডমাস্টার স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

দীর্ঘকাল পরে হেডমাস্টার একখানা চিঠি পেলেন। ডাক্তার লিখেছে। মৃত্যুশয্যায় লেখা চিঠি—ডাক্তারের মৃত্যুর পর একজন উকিল চিঠিখানা রেজিষ্ট্রি করে পাঠিয়েছে—ডাক্তারের অভিপ্রায় অনুযায়ী। বৃদ্ধ হেডমাস্টার পড়ে গেলেন। সুদীর্ঘ চিঠি। লিখেছে—মাস্টারমশাই, যে কথা আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিনে শেষ করে বলে আসতে পারি নি, আজ সেই কথা সম্পূর্ণ অকপট চিত্তে জানালাম সুসমাপ্ত করে। কথাটা—মানুষের পুণ্যের, আমার পাপের। মনে আছে, আপনাকে বলেছিলাম উপকারের ঋণ মারাত্মক ঋণ, আর মানুষ বড় ভাল—এ ঋণ শোধ করতে জীবন পর্যন্ত দিতে পারে? এক বিন্দু অতিরঞ্জন করি নি।

মাস্টারমশাই, আমার তখন তরুণ বয়স, অফুরন্ত উদ্যম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দীন দুঃখী অনাথ আতুরের সেবা করে বেড়াতাম।

মানুষের দুঃখে সত্যই বুক ফেটে যেত। চোখে জল আসত। বিশ্বাস করুন, এক বিন্দু কপটতা ছিল না। প্রবলের অত্যাচার, জমিদারের জুলুম, পুলিশের অন্যায় শাসন, মহাজনের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতাম তাদের। ভয় কাউকে করতাম না। তাদের স্নেহ করতাম সর্বান্তঃকরণে। মানুষেরও কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না, অকপট—অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা। দেবতার মত ভক্তি করত, আমার পায়ে কাঁটা ফুটলে তারা দাঁত দিয়ে তুলে দিত। ছেলেরা অসঙ্কোচে পরমাত্মীয়ের মত আমার কাছে এসে দাঁড়াত। যুবকেরা ক্রীতদাসের আনুগত্য নিয়ে আমার মুখের কথার অপেক্ষা করত। বৃদ্ধেরা এসে বসত, —বলত আমার পায়ের ধুলো পেলে তাদের সর্ব পাপ মোচন হবে, পরলোকে সদ্গতি হবে। পথ দিয়ে চলে যেতাম—কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা কন্যা বধূরা শ্রদ্ধা-দীপ্ত অসঙ্কোচ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকত। আমার মনে হত মাস্টার-মশাই, সত্যিই আমি নেমে এসেছি দেবলোক থেকে—তরুণ দেবতা আমি।

তারা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায়—আমার কাছে নৈবেদ্যের মত নিয়ে আসত তাদের দৈনন্দিন জীবনের শ্রেষ্ঠ আহরণগুলি—ফুল ফল, দুধ-মাছ। মাস্টারমশাই, শ্রেষ্ঠ বস্তু এনে তারা আমার দরজায় দাঁড়াত, দেবমন্দিরে যেমন ভাবে তারা দিয়ে আসে তাদের সর্ববস্তুর অগ্রভাগ।

মাস্টারমশাই, হঠাৎ সব বিষিয়ে উঠল। অনিবার্য পরিণতিই বলব একে! জীবন-সমুদ্র মন্থন করতে গেলে বিষ উঠবেই। আমার ছিল না নীলকণ্ঠের শক্তি। মাস্টারমশাই, এ ভাবে অমৃতের লোভে জীবন-সমুদ্র মন্থন করবার অধিকারী আমি ছিলাম না। যাক, যা ঘটেছিল তাই জানাই। সেবার রথযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীদল গিয়েছিল শ্রীক্ষেত্রে। তারা ফিরে এল কলেরা নিয়ে! একটি দরিদ্র পরিবার ছিল দলের মধ্যে। প্রৌঢ় বাপ, প্রৌঢ় মা আর বিধবা যুবতী কন্যা। বাপ পথে মারা গিয়েছিল, কন্যাটির রোগ সবে দেখা দিয়েছে, এমন সময় এসে পৌঁছল তারা গ্রামে। কন্যাটি যায়-যায়, মা আক্রান্ত হল। দুটি রোগীর মাঝখানে বসে রাত কাটালাম আমি। এতটুকু ত্রুটি করলাম না। পরিশ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হল না, মা-টি মারা গেল। মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এল কন্যাটি। অনাথা মেয়েটি রোগমুক্ত হয়ে, নিরুপায় হয়ে

চলে গেল তার মামার বাড়ি। মাস কয়েক পরে একদিন পথে যেতে হঠাৎ দেখা হল মেয়েটির সঙ্গে। স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, বৈধব্যের নিরাভরণতার মধ্যে তার সকরুণ মূর্তিখানি বড় ভাল লাগল আমার। বললাম, এই যে, চমৎকার শরীর সেরেছে তোমার! বাঃ, ভারি আনন্দ হল! ভারি ভাল লাগছে তোমাকে দেখে।

পরদিন সে এল কয়েকটা গাছের ফল নিয়ে।

দু দিন পর সে আবার এল তার নিজের হাতের তৈয়ারী মিষ্টান্ন নিয়ে।

আবার একদিন সে এল কিছু ফুল নিয়ে। কয়েকটি দুর্লভ ফুল—সে ফুলের গাছ ওদের বাড়িতে ছিল। আমি অন্য কোথাও দেখি নি। মাস্টারমশাই, ওই ফুলের রূপ এবং গন্ধের মধ্যেই ছিল বিষ।

মন আমার বিষিয়ে উঠল। তার মনে কি ছিল জানি না। কিন্তু আমার মনে কামনার হলাহল যেন উথলে উঠল। সেই দিন রাত্রেই আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তার জানালার নীচে। মৃদুস্বরে ডাকলাম। জানালা খুলে আমায় দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

মাস্টারমশাই, সে প্রথমটা শিউরে উঠেছিল আমার প্রস্তাবে। কিন্তু আমার মধ্যে তখন প্রবৃত্তির আলোড়ন জেগে উঠেছে—কালবৈশাখীর ঝড়ের মত। আমি বললাম, এই তোমার কৃতজ্ঞতা! সে খাতকের মতই দীনভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দিল আমার বুভুক্ষিত প্রবৃত্তির কাছে। সেই যে জাগল ক্রূর প্রবৃত্তি, তার নিবৃত্তি আর হল না। শুধু তার আহুতি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারলাম না! মানুষের সকৃতজ্ঞ চিত্তের আনুগত্যের সুযোগে বহুভোগের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। আমার কর্মের মর্মর খণ্ড থেকে এই মানুষগুলি তাদের কৃতজ্ঞতার পরিকল্পনায় গড়ে তুলেছিল যে দেবমূর্তি, আমার আত্মপ্রসাদের পূজায় সে দেবতা জাগল ক্ষুধা নিয়ে। মাস্টারমশাই, শয়তান ক্ষুধার্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করলে—মানুষ তার সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পায়, মানুষ বহু ক্ষেত্রে তাকে বধ করেছে, বহু দৃষ্টান্তই তার আছে। দেবতার ক্ষুধার্ত আক্রমণের মুখে মানুষ কিন্তু অসহায়। সেখানে তার কোনক্রমেই নিস্তার নাই। আমার ক্ষুধার্ত দেবরূপ অবাধগতিতে আদায় আরম্ভ করলে তার নৈবেদ্য—তার বলি।

আজ হয়তো আপনি মাস্টারি করেন না ; যদি করেন, তবে অনুরোধ রইল—ছেলেদের দেবতা হবার উপদেশ দেবেন না। মানুষ—শুধু মানুষ হতে উপদেশ দেবেন। দেবতাকে পুজা করতেও উপদেশ দেবেন না। তার সঙ্গে লড়াই করবার মত সাহস দেবেন তাদের। তারা যেন—। যাক এসব কথা।

এর পর নিজেকে সংযত করতে চাইলাম, রাত্রির পর রাত্রি কাঁদলাম, উপবাস করলাম, তবুও—তবুও সংযত হল না প্রবৃত্তি। অনুশোচনারও অন্ত ছিল না। একদা মনকে স্থির করে সেবাব্রত ত্যাগ করে দেশে ফিরে এসে বিবাহ করলাম। আমার স্ত্রী সুন্দরী, গুণবতী, কিন্তু আশ্চর্য মাস্টারমশাই, তাকে ভালবাসতে পারলাম না। আমি জানি, তাকে আমি ভালবাসি নি। তাই তাদের কাছেও থাকতে পারি নি। প্রাকটিসের অজুহাতে একখান থেকে অন্যখানে ঘুরেছি। জীবনে রূঢ় হতে চেয়েছি, মানুষকে দূরে রাখতে চেয়েছি। কটু বলেছি নিষ্ঠুরের মত, কিছু আদায় করে পিশাচ হতে চেয়েছি—মানুষের কৃতজ্ঞতার ভয়ে। ক্রমে বহু পরিবর্তন হয়ে গেল জীবনে, আমার ভাষা ছিল মিষ্ট—হলাম রুক্ষভাষী, কথায় কথায় রাগ হতে আরম্ভ হল, তর্ক করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু আসল পরিবর্তন হল না। সাপের বিষের থলি শূন্য করে দিলেও আবার সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ; দংশনের প্রবৃত্তিও তার যায় না মাস্টারমশাই। বার বার ঠকলাম। একবার কাউকে কৃতজ্ঞ হবার সুযোগ দিলে রক্ষা থাকত না। আমার অন্তরের সরীসৃপ জেগে উঠত। সেই সুযোগে সে প্রবেশ করতে চাইত তার ঘরে। তাই প্রাণপণে সংসারটাকে নিছক দেনা-পাওনার হিসেবের খতিয়ানের খাতায় পরিণত করতে চেয়েছি। কিন্তু পারি নি। হঠাৎ একদা আর আত্মসম্বরণ করতে পারতাম না। সেদিন সত্যই সৎপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই করুণায়—কর্তব্যের প্রেরণাতেই মানুষের দুঃখের ভাগ নিতাম। তারপর আর রক্ষা থাকত না। আরম্ভ হয়ে যেত আমার জীবনের জটিল খেলার নূতন দান।

আপনাদের ওখানে হঠাৎ একদিন কল থেকে ফিরবার পথে দেখলাম একটি দরিদ্র তাঁতীর ঘরে একটি ছোট ছেলের তড়কা হয়েছে। প্রায় শেষ অবস্থা। কান্নাকাটি পড়ে গেছে। আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না।

অযাচিতভাবে গিয়ে শিশুটির আসন্ন বিপদ কাটিয়ে দিলাম। মন ভরে উঠল প্রসন্নতায়। সেদিন আপনি আমায় গান গাইতে শুনেছিলেন। আপনি বলার পূর্ব পর্যন্ত নিজে গান গেয়েও আমার সে সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল না। আমি সেদিন গাইছিলাম—বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে। সেদিন হঠাৎ আপনার কথায় চেতনা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেয়েছিলাম আমার ভবিষ্যৎ। ছেলেটির মাকে মনে পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। মনে পড়ে গিয়েছিল, আসন্ন বিপদ-আশঙ্কায় বিহ্বল মায়ের অসম্বৃত বেশবাসের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিতে পড়া তার দেহের কথা।

মাস্টারমশাই সমস্ত রাত্রি সমস্ত দিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতেছিলাম। অজগরকে ঝাঁপিতে পুরে ওখান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

মৃত্যুর পরপার যদি থাকে, তবে সেখানে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল ভাবে আপনি আমার সম্বন্ধে কি বলেন শোনবার প্রতীক্ষা করব। বলবেন।

মাস্টারমশাই দুটি হাত তুলে আপন মনে বললেন, নমস্কার।

তমসা

ব্রাঞ্চ-লাইনের ছোট একটি স্টেশন।

লাল কাঁকর-বিছানো মাটির সঙ্গে সমতল প্ল্যাটফর্ম, তাও একটা। প্ল্যাটফর্মের কোণে পয়েণ্টিং-করা ছোট একখানি ঘরে স্টেশন রুম, বাকিটা একটা টিনের শেড, সেই শেডের মধ্যেই ইঁট দিয়ে ঘেরা একখানা পার্শেল-রুম, তার পাশে এক টুকরো ঘরের দরজার মাথায় লেখা—জেনানা।

স্টেশনের পিছন দিকে চা ও খাবারের স্টল—রেলের লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডারের স্টল। স্টেশনের দেওয়ালের গায়ে টিনের চালা নামানো হয়েছে। তার পরেই গুডস-শেডের সাইডিং লাইন। ওখান থেকেই চলে গিয়েছে সোজা উত্তর মুখে লাল মাটির গ্রাম্য রাস্তা। ইউনিয়ন-বোর্ডের কল্যাণে দু পাশে নালা কাটা হয়েছে—দড়ি ধরে বেশ সোজা লাইনে নয়, সাপের দাগের মত আঁকাবাঁকা করেই কাটা, তবু তাতেই খানিকটা সম্ভ্রান্ত চেহারা হয়েছে গ্রাম্য বাবুর মত। গ্রামের লোকে বলে—স্টেশন-রোড, ইউনিয়ন-বোর্ডের খাতাতেও তাই লেখা আছে। স্টেশন-সীমানা বা এরিয়া সামান্য। বুকিং-অফিস, রেলওয়ে-লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডারের চায়ের স্টল, মাল-গুদাম, দুটো মাত্র শাণ্টিং লাইন। বাস্, স্টেশন-এরিয়া শেষ। স্টেশন-সীমানার পরেই রাস্তার দু পাশে খানকয়েক ঘর—একখানায় পান-বিড়ি-সিগারেট আর চা-খাবারের দোকান, দুখানায় কয়লার ডিপো গদি, একটায় স্টেশন-ভেণ্ডারের বাসা। এদের পাশে এক বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোকের পাকা বাড়ি। বাড়িটা ফাঁকা। বড় বড় বটগাছের ছায়া-ঢাকা তকতকে জায়গা। এইখানে গ্রামান্তরের গাড়ি এসে আড্ডা নেয়। এখান থেকে খানিকটা গিয়ে গ্রামের বসতি।

সকালে আপ ডাউন দুটো ট্রেন। এইখানেই ক্রসিং হয়। লোকে বলে—মিট হয়। ট্রেন দুটো চলে গিয়েছে। স্টেশন-শেডের মধ্যে অল্প কয়েকটি লোক। অধিকাংশই স্থানীয়। যাত্রীর মধ্যে একটা খেমটা

নাচের দল—দুটি তরুণী, একটি বুড়ি ঝি, পুরুষ তিনজনের একজন হারমোনিয়ম-বাজিয়ে, একজন বেহালাদার, একজন বাজায় ডুগি-তবলা। তাদের ট্রেন বেলা দুটোয়। মেয়ে দুটির একটি কালো, দীর্ঘাঙ্গী, সে সেইখানে বসেই চুল বাঁধছে। অপরটি দেখতে সুন্দরী, সে একখানা বেঞ্চে ঘুমুচ্ছে। হারমোনিয়ম বাজিয়েটি বেশ ফ্যাশান-দুরস্ত ছোকরা। সিগারেট মুখে প্ল্যাটফর্মের এ-ধার থেকে ও-ধার পায়চারি করে ফিরছে।

একটা অন্ধ ছেলে বসে আপন মনেই ঢুলছিল। কুৎসিত চেহারা। চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট অশক্ত। পরনে একখানা মোটা সুতোর খাটো ময়লা কাপড়। মাথার চুলের পিছন দিকটা অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে ছোট করে কাটা। একটা ডুবকি হাতে নিয়ে আপন মনেই দুলছে, মধ্যে মধ্যে হাসছে, মধ্যে মধ্যে ঠোঁট নাড়ছে, আপন মনেই কথা বলছে বুঝা যায়। মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। কখনও জোরে নিশ্বাস নিয়ে কিছু শুঁকতে চাচ্ছে। জনকয়েক কুলি স্টেশনে স্টলের কাছে বসে আছে, গল্প-গুজব করছে, মধ্যে মধ্যে স্টলের উনোন থেকে কাঠি জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে। নিবে যাচ্ছে, আবার ধরাচ্ছে।

* * *

প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে ছোকরা শিস দিচ্ছিল। এখনও ঘণ্টা পাঁচেক এখানে কাটাতে হবে। নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন স্থান। দেখবার কিছু নাই। এমন কি, তার সঙ্গে তরুণী দুটিকে দেখে ঈর্ষান্বিত হবার মত তরুণ ভদ্রগণের পর্যন্ত অভাব এখানে। চৈত্রের শেষ। সামনে খোলা শস্যহীন মাঠে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত পাতলা ধোঁয়ার একটা ছিলকে পড়েছে যেন। মধ্যে মধ্যে তাও যেন কাঁপছে।

স্টেশন-ঘরে কোকিল আছে। কোকিল ডাকছে স্টেশনের মধ্যে।

বিস্মিত হল হারমোনিয়ম-বাজিয়ে। পাপিয়াও আছে না কি? 'চোখ গেল' ডাক ক্রমেই চড়ছে।

কি বিপদ! চিড়িয়াখানা না কি? ভেড়া ডাকছে! আরে, দিনে শেয়াল ডাকে! হারমোনিয়ম বাজিয়ে অদম্য কৌতূহলের আকর্ষণে ফিরল

স্টেশনের দিকে। ও হরি! ও অন্ধ ছোঁড়াটা! ছোঁড়াটা তখন ডুবকি বাজিয়ে গান ধরেছে।

গলাখানি তো চমৎকার মিঠে! ও বাবা! শুধু গলাই মিঠে নয়, ছোকরা রসিকও খুব। গানখানা সত্যিই রসিকের উপযুক্ত।

"চোখে ছটা লাগিল,
তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।
মরি, মরি বলিহারি—চোখে যে আর সইতে নারি
ঝিকিমিকি ঝিলিক নাচে
হাতের ঘুরিফিরিতে।"

বেশ জমে উঠেছে এরই মধ্যে! ছোকরা উপু হয়ে বসে ডুবকি বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে,—দস্তুর মুখে একমুখ হাসি, তালে তালে দুলছে। কুলির দল তার দিকে ফিরে বসেছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ের সঙ্গিনীদের কেশ-প্রসাধনরতা কালো মেয়েটির রচনারত হাত দুখানি থেমে গিয়েছে, যে ঘুমুচ্ছিল সে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে, তার সদ্য ঘুমভাঙা বড় বড় চোখ দুটিতে স্মিত কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি। বুড়ী ঝিটা দোক্তা সহযোগে পান চিবুচ্ছিল বেশ আরাম করে, তার পান চিবুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

"রিনিঠিনি রিনিঠিনি, চুড়ি আবার
তোলে ধ্বনি—
আমার প্রাণের ব্যায়লা
বাজে তোমার চুড়ির ছড়িতে।"

গানের গতি দ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়াটার দোলার মাত্রাও দ্রুততর হচ্ছে। উল্টে পড়ে না যায়! ও-পাশের বেঞ্চের উপর সদ্য ঘুম-ভাঙা মেয়েটি উঠে বসল। চুল বাঁধছিল কালো মেয়েটি, সে মুচকি হেসে বললে, মরণ!

ছোকরার মাতন লেগেছে—

"হায় হায়, আমি যদি হতেম চুড়ি,
কাঞ্চন নয়, কাচ-বেলোয়ারী
থাকতেম তোমার হাতটি বেড়ি—
জেবন সফল করিতে।
হায় হায়—থাকত না খেদ মরিতে।"

তেহাই দিয়ে সে গান শেষ করলে।

শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত কলরবে বাহবা দিয়ে উঠল। প্রশংসায় পরিতৃপ্ত অন্ধ দন্তুরের মুখ হাসিতে ভরে গেল। একজন শ্রোতা একটা জলন্ত বিড়ি ওর হাতে সন্তর্পণে ধরিয়ে বললে, নে, খা।

বিড়ি?

হ্যাঁ। খা।

হেসে অন্ধ বললে, কে সিগারেট খাচ্ছে? একটা দ্যান না কেনে গা!

দোকানী বলে উঠল, বেটা আমার বালকদাসী। "আমার নাম বালকদাসী, ভালমন্দ খেতে ভালবাসি!" সিথারেট খাবে! একটা সিগারেটের দাম কত জানিস?

আমার গানের বুঝি দাম নাই?

নে, নে, খা। এই নে—এবার হারমোনিয়ম-বাজিয়ে একটা সিগারেট বার করে দিল তাকে।

সিগারেটটি নিয়ে সে সবিনয়ে বললে, পেনাম বাবুমশায়। ঘোড়া দিলেন, চাবুক দ্যান। দেশলাই জ্বেলে দ্যান।

দেশলাই জ্বেলে দিলে হারমোনিয়ম-বাজিয়ে। ওর সাদা ছানি-পড়া চোখে আলোকশিখার প্রতিবিম্ব পড়ে না। উত্তাপ অনুভব করে সে।

সিগারেট টানে প্রাণপণে, সে টানের শক্তি-প্রয়োগে ওর মাথা থরথর করে কাঁপে। দম ফুরিয়ে এলে তবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ছোঁড়াটা ধূমরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, আঃ!

সকলে হাসে তার ভঙ্গী দেখে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে বাবুটি বললে, তুই তো বেশ গান গাইতে পারিস রে! অ্যাঁ!

হ্যাঁ, ভাল। বুঝলেন বাবুমশাই—সবাই বলে ভাল। তা—একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে বললে, খুব ভাল করে গাইলে—মানে, পানমন সমপ্পন করে গাইলে মোহিত করে দিতে পারি বুঝলেন?

এবার তরুণী দুটি খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হাসির শব্দে চমকে উঠল অন্ধ। হাতের সিগারেটটা পড়ে গেল মাটিতে। মাটির উপর আঙুলের প্রান্ত দিয়ে অনুভব করে সে সিগারেটটা খুঁজতে খুঁজতে বললে, হাসছে? কে? কারা? তারপর মৃদুস্বরে ডাকলে, মলিন্দ!

মলিন্দ—ওই কুলিদের একজন। সে বললে, কি?

শোন্, বলি। সিগারেটটা হাত দিয়ে ঠিক গোড়ার দিকে ধুরে নিলে।

কি?

সরে আয়, কানে কানে বলব।

কি? বল?

মেয়েছেলেতে হাসছে। ভদ্দনোক, লয়?

হ্যাঁ। বদ্দমানের।

হুঁ। ঠিক বুঝতে পেরেছি আমি।

কি করে বুঝলি?—অবিশ্বাসের হাসি হাসলে মলিন্দ।

বুঝলাম গলার রজ্ থেকে।

কিন্তু ভদ্রলোক জানলি কি ক'রে?—মলিন্দ প্রশ্ন করলে।

হেসে বললে অন্ধ, চুড়ির শব্দেতে আর মিষ্টি সুবাস থেকে। অনেকক্ষণ থেকেই ও ছুটো পাচ্ছিলাম, মনে মনে সন্দ লাগছিল। ছোটনোক হলে গায়ে ঘাম-গন্ধ ওঠে। কাচের চুড়িতে এমন মিঠে শব্দ ওঠে না। সোনার চুড়ি আছে হাতে, লয়?

হ্যাঁ।

নীরবে সিগারেট টানতে টানতে অন্ধ বার বার জোরে নিশ্বাস টানে ওই মিষ্ট গন্ধ নেবার জন্য। হঠাৎ সে বললে, তা, ঠাকরুনরা হাসছেন, আপনাদিগে বলছি—

কালো মেয়েটি মুখরা, চপলা। খোঁপায় কাঁটা আঁটছিল সে। ঘাড়টি ঈষৎ ফিরিয়ে অন্ধের দিকে চেয়ে বললে, আমাদের বলছ?

হাঁ, আপনারা হাসলেন কেনে?

কালো মেয়েটিই এবার মুখ টিপে হেসে বললে, সে আমরা নই, অন্য লোকে।

অন্য লোকে?—অন্ধ ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বলে, উহুঁ।

উহুঁ কেন? অন্য লোকেই তো হাসলে।

ছোকরা এবার একটু বেশি হেসে বললে, শিঙেতে বাঁশি বাজে না ঠাকরুন, ক্যানেস্তারায় তবলার বোল ওঠে না।

ও মা গো!—মেয়েটি বিস্ময়ে কৌতুকে চোখ বিস্ফারিত করে সঙ্গিনীর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করলে।

সুন্দরী তরুণীটির মুখেও মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল—কিন্তু সে হাসির চেহারা যেন ভিন্ন রকমের। সে এবার বললে, আমরা হেসেছি বলে তুমি রাগ করছ নাকি?

রাগ?—অন্ধ হেসে বললে, ওরে বাপ রে, আপনকাদের ওপর কি রাগ করতে পারি মশায়? তবে হাসলেন কেনে, তাই শুধালাম, বলি—অন্যায় কিছু বললাম না কি?

হারামজাদা!—দোকানী বলে উঠল, ওরে শুয়ার, হাসছেন তোমার 'মোহিত' শুনে।

কেনে, মোহিত করে দিতে পারি না আমি?

খুব হয়েছে। থামো।

কেনে?

কাকে কি বলছিস জানিস?

অন্ধ এবার সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

ওঁরা হলেন কলকাতার গাইয়ে—কলের গান শোন নাই হারামজাদা! সেই গাইয়ে—বড় বড় বাইজী। বেটা পঙ্ক্ষীরাজ ওঁদিকে মোহিত করে দেবেন!

অপরাধীর মত সে এবার বললে, তা হলে তো অপরাধ হয়ে যেয়েছে। হ্যাঁ, তা হয়েছে।

কালো মেয়েটি চুল বাঁধা শেষ করে গামছা কাঁধে ফেলে, সুটকেস খুলে সাবান বার করে নিয়ে বললে, কাছেই পুকুর-ঘাট, নেয়ে আসি আমি।

অন্ধ হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলে ছুঁড়ে। উপরের দিকে মুখ করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিঃশব্দে হাঁ করে হাসতে লাগল—নাকের ডগাটা তার ফুলে ফুলে উঠছিল। অত্যন্ত হাস্যকর এবং কুৎসিত সে মুখভঙ্গি।

দোকানী বললে, দেখ দেখ, হারামজাদার মুখ দেখ। এই হারামজাদা পঙ্ক্ষে।

অন্ধের নাম 'পঙ্ক্ষী'। পঙ্ক্ষে আকর্ণ-বিস্তার নিঃশব্দ হাসি হেসে

বললে, ভারি সোন্দর বাস উঠছে সিংজী। পরান একেবারে মোহিত করে দিল।

সুন্দরী মেয়েটি বললে, তোমার সেই মোহিত-করা গান যদি গাও, তবে তোমাকে এই সাবানখানা দিয়ে যাব।

মাথা চুলকে পঙ্কী বললে, দিয়ে যাবেন? গান গাইলে?

হ্যাঁ।

কিন্তু—। একটু চুপ করে থেকে পঙ্কী বললে, আমার আস্পদ্ধা হয়ে যেয়েছে আজ্ঞে; গান কি আপনকাদের ছামনে গাইতে পারি আমি?

কেন? তুমি তো খুব ভাল গান গাইতে পার। ভারি সুন্দর গলা তোমার!

ভাল লেগেছে আপনার?—পঙ্কীর অভ্যন্ত নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরে গেল।

কালো মেয়েটি বললে হারমোনিয়ম-বাজিয়েকে, এস আমার সঙ্গে। ঘাটে একটু দাঁড়াবে।

পঙ্কী বললে, একটা কথা বলব ঠাকরুন?

স্নিগ্ধ হাসি হেসে সুন্দরী মেয়েটি বললে, বল।

রাগ করবেন না তো? অপরাধ লেবেন আমার?

না না। বল।

পঙ্কী কিন্তু চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বললে, নেতাই, মলিন্দ! চলে গেলি না কি? নেতাই?

কেনে, নেতাইকে কেনে?—দোকানের দরজা বন্ধ করতে করতে দোকানী বললে, জল খাবে না সব? বাড়ি যাবে না?

হেসে পঙ্কী বললে, আপনিও দোকানে তালা দিছেন লাগছে!

হুঁ দিলাম। জল খাবি তো আয়, আমি যাচ্ছি বাড়ি।

উঁহু। ক্ষিদে নাই আজ।

সাড়ে দশটা পার হয়ে গিয়েছে। চৈত্র মাসে এবার এরই মধ্যে চারিদিক ধুলিধূসর এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্টেশনে টিনের শেডে উত্তাপের প্রাখর্যে মধ্যে মধ্যে কটাং কটাং শব্দ উঠছে। লাইনের জোড়ের মুখেও শব্দ উঠছে।

সুন্দরী তরুণীটি এক দৃষ্টিতে অন্ধ পঙ্কীর দিকে চেয়ে রয়েছে। পঙ্কী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কখনও কখনও মুখ তুলছে, কিন্তু পর মুহূর্তেই ঘাড় নামাচ্ছে।

মেয়েটি বললে, কই, বললে না তো?

আজ্ঞে—

কি বলবে বলছিলে?

বলছিলাম। পঙ্কী লজ্জিত অপরাধীর মত হেসে ঘাড় নামালে।

বল।—বলে মেয়েটি প্রতীক্ষা করে থাকে। প্রতীক্ষার মধ্যেই সে অন্যমনস্ক হয়ে ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। পঙ্কী ঘাড় তোলে মধ্যে মধ্যে, আবার ঘাড় নামায় এই অবসরের মধ্যে। হঠাৎ এবার সে বলে ফেললে, বলছিলাম কি—

ঠিক এই সময়েই মাথার উপরে টিনের শেডের উপর শব্দ উঠল অত্যন্ত জোরে। মেয়েটি চমকে উঠল, কি রে বাবা?

উ আজ্ঞে—। বিজ্ঞের মত হেসে পঙ্কী বললে, রোদের তাতে টিনে শব্দ উঠছে।

তাই না কি? রোদের তাপে টিনে শব্দ ওঠে।

হ্যাঁ। এ এখন সেই সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত উঠবে। এই দেখুন, এ শব্দ কিন্তু তাতের নয়। কাক বসল চালে।

মেয়েটি বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল প্লাটফর্মের উপর। কৌতূহল হল তার। সত্যিই কাক বসেছে! সে বিস্মিত হয়ে ফিরে এসে দাঁড়াল পঙ্কীর কাছে। পঙ্কী চঞ্চল হয়ে উঠল। কয়েকবার স্ফীত হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র, মৃদুস্বরে সবিনয়ে বললে, বলছিলাম কি আজ্ঞে—

মেয়েটি দুটি আঙুল ওর চোখের সামনে নাড়ছিল।

পঙ্কী বললে, বলব মশায় নির্ভয়ে?

মেয়েটি আঙুল সরিয়ে নিলে পঙ্কীর নিষ্পলক চোখের সামনে থেকে। বললে, বল। বার বারই তো বলতে বলছি।

আপুনি একটি গান যদি গাইতেন? কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে, নিঃশব্দ হাসিতে বিস্ফারিত মুখে সে মাথা চুলকাতে লাগল।

মেয়েটি হাসলে।—গান শুনবে?

মাটিতে হাত বুলিয়ে অনুভব করে পঙ্কী মেয়েটির পায়ের আঙুলের প্রান্ত স্পর্শ করে বললে, আপনাদের চরণ কোথা পাব বলেন। গানই বা শুনব কি ক'রে? তবে—। একটু নীরব থেকে উপরের দিকে তার দৃষ্টিহীন মুখ তুলে বললে, সাধ তো হয়। মনিষ্যি তো বটে। আর গান শুনতে ভালবাসি আমি।

কি মনে হল মেয়েটির—করুণা হয়তো, হয়তো বা খেয়াল—বললে, আচ্ছা। বলেই আবার চিন্তিত মুখে বললে, হারমোনিয়মটা যে দেখি অনেক জিনিসে চাপা পড়েছে।

হারমনি?

হ্যাঁ।

হারমনি থাক। আপনি এমনি গান। আস্তে আস্তে গান। রোদ বেজায় চড়েছে। শুধু গলায় আস্তে গান, ভারি ভাল লাগবে।

কল্পনাটি বড় ভাল লাগল মেয়েটির। ঠিক বলেছে অন্ধ। সে গান ধরলে মৃদুস্বরে—

"কালা, তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পথের 'পরে, কভু নদী পারে
চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার
কাজল-পরা জোড়া-আঁখি।"

পঙ্কীর সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের মধ্যে শিরায় উপশিরায় ওই গানের ধ্বনি-ঝঙ্কার বীণের বহুতন্ত্রী ঝঙ্কারের মত ধ্বনি তুলে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার।

গান শেষ হয়ে গেল। অন্ধকে গান শুনিয়ে মেয়েটির ভারি তৃপ্তি হল। ঈষৎ হেসে সে প্রশ্ন করলে, কেমন? ভাল লাগল?

আজ্ঞে।—চকিত হয়ে উঠল পঙ্কী। তার অসাড় নিস্পন্দ শরীরে মুহূর্তে চেতনার প্রবাহ বয়ে গেল।

ভাল লাগল?

পঙ্কী বললে, জেবন ধন্য হল আমার ঠাকরুন।

মেয়েটি এবার হেসে ফেললে।

হাসছেন? তা একটু চুপ করে থেকে পঙ্কী বললে, তা, এমন গান জেবনে কোথা শুনতাম বলেন? পঙ্কী কথাগুলির মধ্যে একটি

বেদনার সুর ছিল, তার স্পর্শে মেয়েটি আর হাসতে পারলে না। চুপ করে গেল। কোন কথাও খুঁজে পেলে না।

পঙ্কী বললে, একটি পেনাম করব আপনাকে?

প্রণাম? কেন?

ভারি সাধ হচ্ছে।

লোভ হল মেয়েটির। মুগ্ধ দৃষ্টি, অজস্র প্রশংসা, প্রেম-গুঞ্জন—অনেক পেয়েছে সে এবং পায়। কিন্তু প্রণাম? মনে পড়ল না তার। নিজেদের সমাজের ছোটরা অবশ্য প্রণাম করে। কিন্তু এ প্রণামের দাম অনেক বেশি বলে মনে হয় তার। সে প্রতিবাদ করলে না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

পঙ্কী হাত বুলালে তার পায়ের উপর, তারপর মেয়েটির দুখানি পায়ের উপর নিজের মুখখানি রাখলে।

মেয়েটির ভারি ভাল লাগল।

মেয়েটি পায়ে উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে, পঙ্কীর বিকৃত চোখ থেকে জল ঝরে তার পায়ে লাগছে। তবু সে পা সরিয়ে নিলে না। ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে অর্থহীন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তোমার কে কে আছে বাড়িতে? মা—মা আছে? বাপ আছে? শুনছ? ওঠ। ওঠ। অনেক প্রণাম করা হয়েছে। ওঠ। ওঠ।

আরে, এই বেটা! এই! ও হচ্ছে কি? এই!—হারমোনিয়ম-বাজিয়ে এবং সেই কালো মেয়েটি স্নান সেরে ফিরে এসেছে। হারমোনিয়ম বাজিয়ে ধমক দিলে পঙ্কীকে।

কালো মেয়েটি বললে, মরণ!

সুন্দরী তরুণীটি মৃদুস্বরে আবার বললে, ওঠ। ওঠ।

এবার পঙ্কী উঠল। তার দিকে চেয়ে কালো মেয়েটি এবং হারমোনিয়ম-বাজিয়ে এক সঙ্গে হেসে উঠল। পঙ্কীর চোখের জলে ভিজে মেয়েটির পায়ের আলতা অন্ধের মুখময় লেগেছে—গালে নাকে কপালে ঠোঁটে—মুখময় লাল রঙ।

মেয়েটি বললে, মুখটা মোছ। গোটা মুখে তোমার লাল রঙ লেগেছে।

লাল রঙ ?

হ্যাঁ, আলতা লেগেছে।

আলতা ?

হ্যাঁ, ঠোঁটে মুখে গালে নাকে। মুছে ফেল।

থাকুক আজ্ঞে।

কালো মেয়েটি বললে সঙ্গিনীকে, নে নে, ওর সঙ্গে আর ন্যাকামি করতে হবে না। ওদিকে দেখে এলাম ইঞ্জিনে জল ভর্তি হয়েছে। নেয়ে নিবি তো নেয়ে আয়। সুন্দর জল পুকুরে।

কত দূর ?

পঞ্ক্ষী উঠে দাঁড়াল।—এই কাছে আজ্ঞে, কাছেই। চলেন, আমি নিয়ে যাচ্ছি আসুন।

তুমি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কানাদের পথঘাট মুখস্থ। ঠিক নিয়ে যাবে। যা না।—

কালো মেয়েটি একটু হেসে বললে, নিশ্চিন্দি চান করবি, ও বসে থাকবে ঘাটে।

সত্য কথা। দিব্য পথে পথে চলে পঞ্ক্ষী। মধ্যে মধ্যে পা ঝুলিয়ে অনুভব করে নেয়। স্টেশন-রাস্তার ধারে প্রথম বটগাছটার তলার ছায়ায় এসে বসে বলে, এই বটতলা এসেছে। আসেন এই বাঁ ধারে।

একটু অগ্রসর হতেই পুকুর দেখা যায়। কালো কাজলের মত জল।

মেয়েটি বললে, তোমার নাম কি ?

আমার নাম ? আমার নাম 'পঞ্জে'। 'পঞ্ক্ষী' আর কি।

পঞ্ক্ষী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ! ছেলেবেলায় পাখির মতন চিঁ-চিঁ করে চেঁচাতাম কিনা! কানা বলে মা হেনস্তা করত। ভুঁয়ে পড়ে চেঁচাতাম।

মা বাবা আছে তোমার ?

হ্যাঁ। যাই আমি বাড়ি মাঝে মাঝে। বাবা আমার নোক ভাল। বাবার নাম এখানে—। হঠাৎ কথার ছেদ ফেলে দেয় নিজেই, উপরের দিকে মুখ তুলে বলে, হ—হ। মরালের বড় ঝাঁকটা এসে লাগছে।

একটা প্রকাণ্ড ঝাঁক—মেটে রঙের বুনো হাঁস সত্যই মাথার উপর পাক দিচ্ছিল, তাদের পাখার ডাক ধরেছে আকাশে।

মেয়েটিও আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে।

পঙ্খী বললে—তার অর্ধসমাপ্ত কথা শেষ করলে সে, বাবার নাম এখানে সবাই জানে। কৃত্তিবাস বাগ্দীর নাম—

*   *   *

বাবার নাম কৃত্তিবাস। অন্ধ অপরিণত অপুষ্টাঙ্গ ছেলের চীৎকার শুনেই তার নামকরণ করেছিল—পঙ্খী। ভাল মিষ্ট গৌরবজনক নাম রাখার প্রয়োজন অনুভব করে নি কোন দিন।

পঙ্খী বলছিল। ঘাটের ধারে বসেছিল সে, মেয়েটি ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে তার কথা শুনছিল। পঙ্খী বললে, আমার দিদি আছে। দিদি আমাকে ভালবাসত, কোলে নিত। তা, এই আপনার মতন বয়েস্ তার।

আমার মত ?—ঈষৎ হেসে মেয়েটি বললে, আমার বয়েস কি করে বুঝলে তুমি ?

সলজ্জ হাসি হেসে মাথা চুলকে পঙ্খী বললে, তা, আপুনি আমার চেয়ে এই খানিক বড় হবেন। তার বেশি নন। একটু চুপ করে থেকে বললে, গলার রজ্‌ শুনে বুঝতে পারি কিনা খানিক-আধেক। আপনার গলা এখনও বাঁশির মত। খাদ মেশে নাই। তা ছাড়া—

পঙ্খী থেমে গেল। সে বলতে পারলে না কথাটা। পায়ের উপর মুখ রেখেছিল সে, কোমল মসৃণ স্পর্শ এখনও সে যেন অনুভব করছে।

কথাটা পালটে বললে, এখান থেকে বাড়ি আমার ক্রোশ চারেক হবে। বছর খানেক আগে মা একদিন খুব মেরেছিল। তা, দিদি বললে, পকে, তুই তো গান গাইতে পারিস, তা ভাল বাজারে জায়গায় যা না কেনে। গান গাইবি, ভিখ করবি। কথাটা মনে লাগল আমার। দিদিই একদিন আমার হাত ধরে এখানে রেখে গেল। সেই অবধি—। নিঃশব্দে হেসে সে চুপ করে করে গেল।

হঠাৎ এক সময় বলে উঠল, আপনকার গানের ওইটুকুন ভারি সোন্দর! সেই কি—কালা তোমার যখন বাজে বাঁশি। বলতে বলতে সে সুরেই গাইতে আরম্ভ করলে—

ঘর-কন্না সব ভুলে যাই ছুটে যে আসি।
আমার গা-ঘষা হয় না, আমার কেশ-বাঁধা হয় না,
আরও হয় না কত কি!

মেয়েটি সাবান মাখছিল, বিস্ময়ে তার হাত থেমে গেল। অবিকল সুরে নির্ভুল গানখানি গাইছে পঙ্কী।

আঃ, নাইতে আর লাগে কতক্ষণ? ওদিকে যে ট্রেনের সময় হয়ে এল।—হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ডাকলে ঠিক এই সময়ে। ঘাট থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকতে এসেছে।

সত্যই স্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা বেজে উঠল।

* * *

ট্রেন চলে গেল। খেমটার দলটিও চলে গেল। দোকানী সিং ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের চা শরবত জলখাবার বিক্রি শেষ করে ডাকলে, পঙ্কে! পঙ্কে!

পঙ্কের সাড়া পাওয়া গেল না। গেল কোথায়?

দোকানী ওকে সত্যই ভালবাসে। দোকানীর স্ত্রীও ভালবাসে। যেদিন পঙ্কীর কোথাও অন্ন না জোটে, সেদিন দোকানী ডেকে খেতে দেয়। তুটোর ট্রেন গেলেই দোকানী একবার পঙ্কীর খোঁজ করে। পঙ্কীর সাড়া পাওয়া গেল না। বোধ হয় গ্রামের মধ্যে গোবিন্দ-বাড়িতে গিয়েছে প্রসাদের জন্য কিংবা গিয়েছে চণ্ডীতলায়। চণ্ডীতলার পঞ্চপর্বে বলি হয়—পঙ্কে হিসেব রাখে কবে অমাবস্যা, কবে চতুর্দশী, কবে অষ্টমী, কবে সংক্রান্তি, সেদিন সে চণ্ডীতলায় যাবেই। নিশ্চয় তু জায়গার এক জায়গায় গিয়েছে সে। দোকানী আপনার দোকানের কাজে মন দিল! তুটোর ট্রেনের পর আবার চারটেয় আসবে আর একখানা ট্রেন।

চারটের ট্রেন এল, গেল। দোকানী এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল—পঙ্কে এখনও ফিরল না কেন? সে গেল কোথায়? ট্রেনে খেমটার দলের সঙ্গে চলে গেল না কি?

সত্যই তাই। পঙ্কী চুপিচুপি ট্রেনে চেপে পড়েছিল। বেঞ্চের তলায় ঢুকে শুয়ে ছিল। জংশন স্টেশনে নেমে কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাদের হারিয়ে ফেললে।

ব্রাঞ্চ-লাইনে গার্ড ড্রাইভার পঙ্কীকে চেনে। তারা বললে, তুই এখানে?

আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে সে বললে, হ্যাঁ। এখানেই এলাম। বলি, একবার ঘুরে ফিরে আসি। একটু চুপ করে থেকে হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত করে বললে, নতুন জায়গা, দেখতে শুনতে তো সাধ হয়!

হেসে দত্তবাবু গার্ড বললে, বেশ, দেখা তো হল, এইবার চল্।

ফিরে যেতে কিন্তু পঙ্কীর কেমন লজ্জা হল। সে বললে, না। থাকব এইখানে দুদিন দশদিন।

থাকবি?

হ্যাঁ। এখানকার বাজারটা কি রকম দেখি একবার।

উত্তর শুনে হেসে দত্ত গার্ড চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই পঙ্কীর একটা কথা মনে হল!—গার্ডবাবু! গার্ডবাবু! গার্ডবাবুকে সে বলতে চাইছিল, এখানকার স্টেশন-মাস্টার জমাদার স্টলওয়ালা—এদের কাছে তার জন্যে একটু বলে দেবার জন্য।

গার্ডবাবুর সাড়া পাওয়া গেল না। গার্ড তখন স্টেশনের ভিতরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পঙ্কী চলতে আরম্ভ করলে। ঠিক এসে উঠল স্টলের সামনে।

কি ভাজছেন গো দোকানী মশায়? সিঙ্গারা কচুরি।

দোকানী তার দিকে চেয়ে বললে, সরে বস।

সরেই একটু বসল পঙ্কী। তারপর সে তার ডুবকিতে আঙুলের ঘা দিয়ে আরম্ভ করলে, ও কালা—

দত্ত গার্ডকে প্রয়োজন হল না। নিজেকে নিজেই চিনিয়ে নিলে পঙ্কী। দোকানী, স্টেশন-মাস্টার, জমাদার, স্টেশন, জমির উপর পাতা লাইন, সিগন্যালের তার, বাজার, পথ, ঘাট, সব তার পরিচিত হয়ে গেল। কালীমায়ের স্থান, গৌরাঙ্গের আখড়ার পথও তার মুখস্থ। জংশনের সারি-সারি রেল লাইন প্রায় অনায়াসেই পার হয়ে যায় সে। প্রথম এসে একটুখানি দাঁড়ায়, লোকের সাড়া পেলে জিজ্ঞাসা করে, কে বটেন গো? লাইনে গাড়ি রয়েছে না কি?

লোক না থাকলে কান পেতে শোনে, ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যায় কি না। তারপর এগিয়ে এসে লাইনের উপর পা দেয়। স্পর্শ করে

বুঝে নেই—চলন্ত ট্রেনের গতিবেগ তার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে কি না। পঙ্ক্ষী বলে, ভয় লাগলে শিরদাঁড়া যেমন শিরশির করে, তেমনই শিরশিরিনি বয় লাইনে। সন্দেহ হলে লাইন ছেড়ে ওভারব্রিজের দিকে যায়—এক পাশের রেলিং স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায় সে। সিঁড়ির সংখ্যা তার মুখস্থ।

ডুবকির সঙ্গে এখন একটা হাঁড়ি সুদ্ধ রেখেছে। আঙুল দিয়ে বাজিয়ে অনেক পরীক্ষা করে কিনেছে। হাড়ি বাজিয়ে গান করলে লোক জমে বেশি।

মধ্যে মধ্যে স্টেশন-ঘরের দরজায় গিয়ে বসে। বসবার সময়টি তার দুপুর বেলায়, একটা থেকে আড়াইটার মধ্যে। এ সময়টায় মাস্টার-বাবুরা বসে গল্প-গুজব করে। সে শোনে। গল্পের মধ্যে ছেদ পড়লেই বলে, মাস্টারবাবু!

কি রে ব্যাটা? এসেছ তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা কি বলছ?

আজ্ঞে!—মাথা চুলকায় পঙ্ক্ষী।

কি জিজ্ঞাস্য? বর্ধমান কত দূর? কত ভাড়া?

আজ্ঞে না বলছিলাম, বলি—। হাসির ভঙ্গীতে দন্তুর পঙ্ক্ষী আরও দন্ত বিস্তার করে বাবুদের কাছ থেকে উৎসাহ-বাক্য প্রত্যাশা করে। পায় সে উৎসাহ-বাক্য।

কি বলছিলে? বর্ধমান শহরটা কেমন? কত বড়?

হ্যাঁ—আরও একটু বেশি দন্তবিস্তার করে সবিনয়ে।

বর্ধমান যাবি? দেব একদিন চড়িয়ে গাড়িতে?

পঙ্ক্ষী চুপ করে থাকে। সম্মতি জানাতে শঙ্কিত হয়। গাড়ি-ঘোড়া লোকজন গলি-ঘুঁজি—প্রকাণ্ড বড় শহর, তার মধ্যে কোথায়—

টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা শব্দ করে ওঠে। ওদিকে টেলিগ্রাফের ঘণ্টা বাজে ঠিন ঠিন, বাবুরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পঙ্ক্ষী উঠে আসে। ভাবতে ভাবতে প্লাটফর্মের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। কাছেই টেলিগ্রাফের পোস্টে বাতাসের প্রবাহে শব্দ ওঠে, গায়ে লাগানো মাইল-লেখা লোহার প্লেটটা অত্যন্ত দ্রুত শব্দ করে কাঁপে। পঙ্ক্ষী ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ-পোস্টে

কান লাগিয়ে দাঁড়ায়। পোস্টের গায়ে আঙুল বাজিয়ে বলে, টরে-টক্কা, টরে-টক্কা, টক-টক্কা টরে। তারপর বলে, হ্যালো! হ্যালো! ঠাকরুন, বর্ধমানের ঠাকরুন? আমি পঙ্কী। গান গাইছি আমি। "ও তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি!"

* * * *

দিন যায়। এক বৎসর হয়ে গেল। পঙ্কী জংশনেই রয়েছে। টাকা-পয়সা কিছু জমেছে তার। দোকানীর কাছে রাখে তার কিছু অংশ। দোকানী জানে ওই তার সব। কিন্তু পঙ্কী তার উপার্জন ভাগ করে। কিছু নিজের কাছে রাখে। বাকিটা রাখে জেনানা ওয়েটিংরুম—কাঠে-ঘেরা ছোট্ট চোর-কুঠুরির মত ঘরটার এক কোণে মাটিতে পুঁতে। জংশন হলেও ব্রাঞ্চ-লাইনের প্লাটফর্মটা পাকা নয়। জেনানা ওয়েটিংরুমটার মেঝেও কাঁকরমাটির মেঝে। তার উপর রাখে তার বিছানাটা। বিছানা একখানা বস্তা। রাত্রে ওইখানে বস্তা বিছিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে।

বর্ধমানের বাতিকটা কমে গিয়েছে। "কালা তোর তরে" গানখানা সে গায়, লোকে তারিফ করে। পঙ্কী সবিনয়ে হাসে কিন্তু আর সেই চৈত্র-দুপুরে গেঁয়ো স্টেশন-প্লাটফর্মে নরম দুখানি পায়ের উপর মুখ রেখে প্রণাম করার কথা মনে পড়ে না। সেই মিষ্টি প্রাণ-মাতানো গন্ধের কথাও মনে পড়ে না;—মনে পড়ে না ঠিক নয়, মনে পড়ে, কিন্তু বুকের ভেতরটা তেমন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে না।

কত দিন পর। অনেক দিন। হঠাৎ সেদিন সমস্ত শরীরে তার শিরশির করে কি বয়ে গেল। লাইনের উপর ট্রেন গেলে যেমন শব্দে স্পর্শে শিহরণ জাগে।

সেই গান। সেই গলা। আজ আর গান শুধু নয়, গানের সঙ্গে যন্ত্র বাজছে। স্টেশনের ঘরের সামনে ঠাকরুন গান করছে, "কালা তোর তরে—"

পঙ্কী ছুটে এসে দাঁড়াল। বেশ বুঝতে পারলে ঠাকরুনের সঙ্গে অনেক লোক রয়েছে। ছোট ছেলেও রয়েছে।

গান শেষ হতেই সে হাত জোড় করে বললে, ঠাকরুন!

কে রে তুই ?

আজ্ঞে, যে ঠাকরুন গান গাইলেন তাঁকেই বলছি আমি।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। একজন বললে, মরণ।

আবার গান আরম্ভ হল। "চোখে ছটা লাগিল—!" পঙ্ক্ষীর বুক একেবারে দুলে উঠল। তার সেই গান। নিতাই কবিয়ালের কাছে সে শিখেছিল। ঠাকরুন শিখেছিল তার কাছে।

গান শেষ হল।

আমাকে চিনতে পারলেন না ঠাকরুন। আমি পঙ্ক্ষী।

এই ব্যাটা, এই ! ভাগ্।

ভাগিয়ে দিলেও সে এবার সঙ্গ ছাড়বে না। সে সজাগ হয়ে বসে থাকে। ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল। যাত্রীর দলটি আসর গুটিয়ে নিলে। একজন বললে, গ্রামোফোনটা ভাল করে বন্ধ করিস। রেকর্ডগুলো বাক্সের মধ্যে পুরে নে।

গাড়ি এল। চলে গেল। স্টেশন-স্টাফ স্টলওয়ালা বিস্মিত হল। পঙ্ক্ষী নাই।

* * *

আরও অনেক কাল পর। অনেক বৎসর চলে গিয়েছে। পঙ্ক্ষীর চুলে সাদা ছোপ পড়েছে। দন্তুর মুখে দাঁত পড়েছে কয়েকটা। কানে শোনার শক্তি কমে এসেছে। লাইনে পা দিয়ে দুরে ট্রেন আসছে কি না আর ধরতে পারে না।

পঙ্ক্ষী এক তীর্থক্ষেত্রে পথের ধারে বসে ভিক্ষে করে। গানও আর তেমন গায় না। বলে, অন্ধজনে দয়া কর বাবা। অন্ধকে পয়সা দাও মা। মা লক্ষ্মী—জননী !

মা-জননীরা যখন যায়, তখন পঙ্ক্ষী বেশি আকুলতা প্রকাশ করে। জুতোর শব্দ থাকে না—অথচ খসখস শব্দ ওঠে গরদের কাপড়ের, পূজার ফুলের গন্ধ ওঠে, পঙ্ক্ষী বুঝতে পারে মা-লক্ষ্মীরা আসছেন।

যেদিন ভিক্ষে কম হয়, সেদিন গান করে।

সেদিন সে গান গাইছিল। "চোখে ছটা লাগিল" গাইতে আজকাল ভাল লাগে না। ভক্তিরসের গানই বেশি গায়। "কালা তোর তরে—" গানখানা মাঝে মাঝে গায়। সেদিন গাইছিল সে ওই গানখানাই।

গান শেষ হতেই একজন হেসে বললে, খুব গেয়েছিলে গানখানা রেকর্ডে। ঘাটে মাঠে হাটে ছড়িয়ে গেল।

নারীকণ্ঠের অতি মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলে পঙ্কী। মেয়েটি বললে, গাইলাম, কিন্তু কালা শুনলে কই ?

ওই তোমার এক ঢঙ ! আর তীর্থে কাজ নেই। চল, ফিরে চল।

নাঃ। বয়স অনেক হল। অন্ধকার হয়ে আসছে দুনিয়া। আর—

অসহিষ্ণু পঙ্কী বলে উঠল, কিছু দয়া হবে মা ? অন্ধ—

তার হাতে এসে পড়ল কি একটা।

পুরুষটি বললে, আধুলি ; পয়সা নয় রে বেটা।

আধুলি ?

হ্যাঁ।

আধুলি ? মেকী নয় তো ? হাত বুলিয়ে, মাটিতে ফেলে শব্দ পরখ করে নিলে পঙ্কী। তারপর পরম কৃতজ্ঞতাভরে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির পায়ে হাত বাড়িয়ে প্রণাম করলে।

তারা চলে গেল। পায়ের শব্দ উঠল।

পাখিরা ডাকছে। দিন বোধ হয় শেষ হল। পঙ্কীও উঠল।

ইমারত

শিবপ্রতিষ্ঠা করেছেন শ্যামাদাসবাবু। লোকের কাছে পরম বিস্ময়ের কথা। কৃপণ লোক; কার্পণ্যের তপস্যায় তাঁর পিতাও নাকি মুদ্রাত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। লোকে বলে, এক এক পয়সা মা-বাপ শ্যামাদাসবাবুর। তাঁর টাকাও গল্পের টাকা। গল্পের বস্তু অল্প হয় না, কেউ বলে—লাখ, কেউ বলে—দু লাখ, কেউ বলে—লোকটা যত বড় টাকার স্তূপটিও তত বড়। তাঁর সিন্দুকের সর্বশেষ স্তরের যে টাকাগুলি, সেগুলি ওজনে ঠিক থাকলেও আকারে ঠিক নাই, উপরের টাকার রাশির ভারের চাপে চেপ্টে বড় হয়ে গিয়েছে এবং চেহারাতেও কালো হয়ে গিয়েছে, ছাতা ধরেছে। অনেকে বলে—সেগুলি অচল; কেন না সরকার নোটিশ দিয়ে ঘোষণা করেছেন, মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রথম আমলের টাকা, যেগুলিতে মুকুটহীন রানীর মূর্তি মুদ্রিত, সেগুলি অচলিত হয়ে গেল। একটি সময়ও তাঁরা দিয়েছিলেন, এই টাকা স্থানীয় রাজকোষে দিয়ে তার পরিবর্তে নতুন টাকা বদল নেবার জন্য। কিন্তু শ্যামাদাসবাবুর স্বভাবই অন্য রকমের, সিন্দুকে যা তিনি রাখেন তা আর বার করেন না। লোকে বলে—শ্যামাদাসবাবুর ধারণা, বার করলেই বাইরের বাতাসে সে উড়ে যাবে। শ্যামাদাসের তৃপ্তি—সঞ্চয়ের তৃপ্তি, সেখানে অচল হলেও ক্ষতি নাই; যেহেতু না চলবার প্রশ্ন নাই সেখানে। সেই লোক শিবপ্রতিষ্ঠা করবেন, এতে লোকের বিস্মিত হবারই কথা।

বিস্ময়ের প্রধান কারণ এবং মূল রসটা আকস্মিকতার মধ্যেই নিহিত থাকে, এবং তার বৈচিত্র্য ও মহার্ঘতা অল্পক্ষণ স্থায়িত্বের মধ্যেই আবদ্ধ—ফ্রেমে-ঘেরা ছবির মত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারও ব্যতিক্রম হল।

মন্দিরের উপকরণ যখন এল, তখন পাকা ইট দেখে লোকের মনে হল—তাদের কল্পনাকে এটা ছাড়িয়ে গেল। বললে, ইট পাকা হলেও কাদা দিয়ে গাঁথবে।

কয়েক দিন পর দেখা গেল—চুন এসেছে, মজুরে সুরকি ভাঙছে। লোকে থমকে দাঁড়াল। গাঁথনি পাকাই হবে তা হলে! ছোটখাটো পাকা মন্দির একটি।

বিস্ময় আবার একদফা উৎপাদিত হল—জনাব শেখ রাজমিস্ত্রীকে দেখে, এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ পাকা কারিগর এবং তার হাতে কাজ কম খরচে হয় না।

মাঝখানে চেরা সিঁথিটি তার ওলংয়ের সুতোয় পাকানো সরু দড়িটির মত সাদা এবং সোজা, বাবরী-কাটা সাদা চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, কর্ণিক দিয়ে মাজা পঙ্কের পলেস্তারার মত চকচক করছে। ঘাড়ে চুলগুলির প্রান্তভাগ সযত্নে কেটে নিচে থেকে ঘাড়টা কামিয়ে ফেলেছে, গোল থামের মাথায় বেড় দেওয়া কার্নিশের বিটের মত সব চেয়ে পাতলা কর্নিক দিয়ে দড়ি ধরে কাটা হয়েছে যেন। গোঁফ এবং গাল কামিয়ে চিবুকের নিচে ক্ষুর-দাড়িটিও ঠিক এমনই সযত্নে কাটা। ধপধপে পরিচ্ছন্ন দাঁতগুলির ফাঁকে কালো মিশির দাগ—পয়েন্টিং করা আলসের মত। চকচকে ছোট একটি হুঁকোতে ইঞ্চি-চারেক লম্বা একটি বাঁশের নল লাগিয়ে, ভাল তামাকের মিষ্টি গন্ধে চারিদিকে বেশ একটা নেশার আমেজ ছড়িয়ে জনাব তামাক টানছে আর দীর্ঘ হাতখানির সরু আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ দিয়ে কাজ করাচ্ছে। গলায় দুহালি কালো করে বেড় দিয়ে বাঁধা একটি পাকা সোনার চৌকো তক্তি। গায়ে চেক-কাটা পরিচ্ছন্ন ফতুয়া, কাঁধে বাহারে রঙের ডোরাকাটা সযত্নে পাট করা একখানি গামছা। পরনে ময়ূরকণ্ঠী রঙের লুঙ্গি। পায়ের চটি জোড়াটা এককালে শৌখিন ছিল; কিন্তু এখন পুরানো হয়েছে।

ইটের থাক দেওয়া হচ্ছে। মজুরেরা ইটের উপর ইট সাজিয়ে থাক্‌বন্দী করে রাখছে; যাতে ইট তুলতে সুবিধে হয়, বরবাদ না যায়, এমন কি দুখানা ইট সরালেই ধরা যায়।

জনাব বলছিল, ই করে রাখ বাপ্‌, হুঁশ করে—হুঁশ করে রাখ্‌। জুঁ-জু—সমা-ন করে একটির উপর একটি রেখে যা বাপ। গাঁথনি করা ইমারতের নতুন বাহার দিবে। বেটাল হলে টলে পড়ে যাবে না। এই দেখ্‌। সর্‌। দেখে লে।

সে তাকে সরিয়ে নিজেই ইটের উপর ইট সাজিয়ে রাখতে লাগল—নিপুণ হাতে অবলীলাক্রমে।—হাঁ। হুঁশ আর হিসাব। আর কাম

করবার সময় মনে মনে বলিস না—বাবা রে ! মন যখুন বলবে—বাবা রে, তখুন একবার তামুক খেয়ে লিবি। লে, টেনে লে একটান। খুসবই-ওয়ালা তামাক। কাঁধের গামছাখানি দিয়ে হাত দুখানি থেকে ইটের ধুলো ঝেড়ে নিয়ে কল্কেটি সে মজুরটির হাতে দিলে।

বিস্মিত রামপ্রসাদ জনাবের পিছনের দিকে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার জনাব এদিক ফিরতেই প্রশ্ন করলে, তুমি এখানে জনাব? ব্যাপার কি বল তো?

কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন করলে জনাব—সেলাম গো বাবু। শ্যামাদাসবাবুজীর মন্দির হবে। আমি গাঁথছি।

তা তো দেখছি। কিন্তু শ্যামাদাসবাবুকে তুমি মেরে ফেলবে নাকি?

জনাব একটু হাসলে। বললে, আজ্ঞে না, অল্প খরচে সেরে দিব—সে বুলেছি আমি বাবুকে।

তোমার হাতে অল্প খরচে হবে তো?

জনাব হা-হা করে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে উঠল, আঃ, হায়—হায়—হায় গো! বলি, উ কি ইটা ভাঙচিস গো তু? অ্যাঁ! নোড়ার মতুন—মোটো—মোটো! অ্যাঁ!

সে এগিয়ে গেল লম্বা পা ফেলে।

এদিকে এক জায়গায় জমায়েত হয়ে বসে বেশ যেন মজলিস করার ভঙ্গিতে মজুরনীর দল ছোট হাতুড়ি দিয়ে ইট ভেঙে খোয়া তৈরি করছিল।

বাছাই করা মজুরনী সব জনাবের। জনাবের নিজের মজুরিও বেশি, ওর মজুরনীদের মজুরিও চড়া। পরিচ্ছন্ন কাপড় আঁট করে বেড় দিয়ে সর্বশেষ উদ্বৃত্ত অংশটুকু কোমরে ফেরতা দিয়ে জড়িয়ে পরেছে, হাতে এক হাত করে কাচের চুড়ি, স্বাস্থ্যবতী তরুণী নিয়ে জনাবের মজুরনীর দল। আরও একটা বিশেষত্ব আছে, সাধারণে না জানলেও মজুরনীরা জানে, তরুণী হলেও যদি কেউ বেঁটে আর মোটা হয় তবে তাকে তারাই বারণ করে দেয়, তু বুন যাস না। লেবে না। বুড়ো বলে—ঢ্যাপসা মেয়ে কাম করতে পারে না। লড়ে বসতেই উদের ছ মাস। তরুণী মেয়েদের মধ্যে আবার যাদের চোখ ডাগর, চুল বেশি, তারাই থাকে জনাবের পাশে; জনাবের হাতে ইট যুগিয়ে দেয়, মশলা ঢেলে দেয়

গাঁথনির উপর, ওলং এগিয়ে দেয়, জলের মগ-পাটা দেয় হাতে হাতে, রাজমিস্ত্রীর হুঁকো কল্কে তামাক টিকে রাখে সযত্নে, বরাতমত সেজে দেয়। মধ্যে মধ্যে জনাব ভরা-দুপুরের রোদের সময় বলে, লতাবউ, একটা গায়েন কর্ না ভাই! বেশ মিহি গলায়। তু গাইবি, আমি আর লাতিন শুনব। হ্যাঁ।

মিহি কাজের সময় মধ্যে মধ্যে কাজ বন্ধ করে ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে দেখতে দেখতে বলে, দেখ্‌ তো ভাই লাতনী লাতবউ, তুদের ডাগর চোখে, দেখ্‌ তো এক লজর। বল্ দিখিনি কুথা কি খারাপ লাগছে?

অন্য মজুরনীরা সব দিদি। বড়দিদি, মেজদিদি থেকে ছোটদিদি পর্যন্ত।

আগেকার কালে যারা পাশে থাকত, তাদের কেউ ছিল ঠাকুরঝি কেউ ছিল ভাবী। দু-চারজনকে বউ বলে ডাকত। তাদের দুজন প্রৌঢ় এখনও আছে জনাবের দলে। তারা সর্দারনী। দেখাশুনা করে মজুরনীদের কাজ। নিজেরাও করে টুকিটাকি এটা-ওটা। এরাই আড়কাটির মত সংগ্রহ করে আনে নতুন মজুরনী। আনলে জনাব খুশী হয়, সংগ্রহকারিণী প্রৌঢ়া দিন কয়েকের জন্য জনাবের কাছে পুরানো কালের সমাদরের খানিকটা যেন ফিরে পায়।

জনাব এগিয়ে গেল মজুরনীদের খোয়া ভাঙার জায়গায়। নতুন একটি মজুরনী খোয়া ভাঙছে—খোয়াগুলি ঠিক ভাঙা হচ্ছে না, অনভ্যস্ত হাতের হাতুড়ির আঘাতে কতক হচ্ছে বড় বড়, বাকি খানিকটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, কতক হচ্ছে নেহাত ছোট যা নিয়ে কোনও কাজ হবে না।

জনাব তার হাত থেকে হাতুড়ি নিয়ে ভাঙার কৌশলটা দেখিয়ে দিলে—এই দেখ্‌—এই দেখ্‌, চোখ দুটি তো বড় বড়, নজর করে দেখ। বেশি মোটাও হবে না—বিচি-বিচি ছুটুও হবে না; বেশি জোরে হাতুড়ি মারবি না, আবার আস্তে ঠুকুস ঠুকুস করে মারলেও হবে না। এক তালে ঘা; হ্যাঁ, এই দেখ্‌—এই দেখ্‌।

শ্যামাদাসবাবু এসে দাঁড়ালেন। খাটো মানুষটি, গৌরবর্ণ রঙ, পাকা চুল, চঞ্চলপ্রকৃতি ছেলের মত অস্থির লোক। বার কয়েক এদিক থেকে

ওদিকে ঘুরে বেড়ালেন, তারপর এসে দাঁড়ালেন মজুরনীদের খোয়া ভাঙার জায়গায়—জনাবের কাছে। দাঁড়িয়ে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, অনবরত দোলেন। হাতের আঙুলগুলি অহরহ সক্রিয়, অঙ্গুষ্ঠের নখ দিয়ে মধ্যমার নখটা অবিরাম খুঁটে চলেছেন! লোকে বলে—টাকা বাজিয়ে ওই অভ্যাসটা হয়েছে তাঁর। শ্যামাদাসবাবু বললেন, জনাব। একে বলে—এই ছুঁড়ীগুলোকে লাগালে কেন হে?

জনাব হাসলে, বললে, জোয়ানী বয়েস না হলে কাজ হবে কেন হুজুর? খাটবে কে? তা ছাড়া পাতলা হাত ওদের এখুন—হাল্কা পা, হাল্কা শরীল, হাঁটবে বনবন করে, ভারায় উঠবে থরথর করে।

শ্যামাদাস বললেন, না—না—না, হারামজাদীরা ভারি পাজী। ক্রমাগত ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসবে। মজুরগুলো কাজ করবে না, ফষ্টি করবে। ভাগাও—ওগুলোকে তাড়িয়ে দাও।

জনাব বললে, আপুনি যান এখান থেকে হুজুর। আমি রইলাম, আপনার কাম রইল। বরবাদ হয় আমাকে ফজিয়ৎ করবেন। আমি জবাবদিহি করব।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামাদাস বললেন, এই মাঝারী একটি মন্দির হবে। বেশি ছোটও না হয়, বেশি বড়ও না হয়। বুঝেছ তো? আবার চুপ করে থেকে তিনি বললেন, লোকে বলছে—তুমি লাগলে আর থাম না।

জনাব হাসলে, বললে, ইমারত আপনার, আমার লয়—আমার বাবার লয়। আপনি যেমন হুকুম করবেন তেমনিই হবে। পাঁচ হাত বলেন—পাঁচ হাত; দশ হাত বলেন—দশ হাত। আবার বুলেন—একশো হাত দেড়শো ফুট তাই হবে। তবে একটা হিসাব তো আছে! যেমন ভিত করবেন, তেমনিই মন্দির হবে। আবার মাঝখানে বুলেন—থেমে যাও জনাব, তাই হবে। কর্নি-পাটা নিয়ে চলে যাব বাড়ি।

শ্যামাদাস উত্তর খুঁজে পেলেন না এর। নিরুত্তর হয়ে চঞ্চলভাবেই চলে গেলেন সেখান থেকে।

মন্দির উঠছে।

লোকে যেতে যেতে দেখে, পথে দাঁড়ায় সবিস্ময়ে। মন্দির তো ছোট হবে না!

ভারা বাঁধা হয়েছে। একখানা বাঁশের দৈর্ঘ্য ছাড়িয়েছে—বাঁশের মাথায় আবার নতুন বাঁশ বাঁধা হয়েছে, তারও দুটো থাক ছাড়িয়ে তৃতীয় থাকে তক্তা পেতে জনাব কাজ করে যাচ্ছে। পাশে দুটি তরুণী,—কাহারদের বউ মতিবালা, আর হাড়ীদের মেয়ে দাসী। জনাবের বিপরীত দিকে আর একটা ভারায় দুজন রাজ কাজ করছে—আবদুল আর রসিদ।

শ্যামাদাসবাবু নিচে এসে কখন দাঁড়িয়েছেন। লোকের কথাই সত্য। জনাব সহজে থামবে না। এখনও চারখানা দেওয়াল সোজা উঠে যাচ্ছে। কাটান দিয়ে এখনও একটানা ইটও গাঁথা হয় নাই। সুতরাং কত উঁচুতে যে মন্দিরের চূড়া গিয়ে ঠেকবে সে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার উপর কাজ অগ্রসর হচ্ছে যেন শামুক চলছে। জনাবকে দোষ দেওয়া যায় না, সে কাজ করে যায় ঠিক। কিন্তু ওই যে দুটো রাজমিস্ত্রী, ওরা ক্রমাগত বিড়ি খাচ্ছে। বিশেষ করে সবচেয়ে অল্পবয়সীটা। শুধু বিড়ি খাওয়াই নয়—অল্পবয়সী মজুরনীগুলোর সঙ্গে হাসাহাসির আর বিরাম নাই। তিনি ডাকলেন, জনাব!

জনাব নিচে তাকিয়ে বললে, আজ কাটান দিব হুজুর।

তা বেশ। কিন্তু—একে বলে—ঐ ছোকরা রাজমিস্ত্রীটাকে কাজ করতে বল।

জনাব ছোকরার দিকে দৃষ্টি ফেরালে। জনাবের মনে আছে; আজও কোন্‌খান থেকে ইট গাঁথতে শুরু করেছে। কত ফুট গেঁথেছে সেও সে মাপ না করে একবার নজর দিলেই বুঝতে পারে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। সত্যই ছোকরার কাজ মোটেই এগোয় নাই।

সে বললে, কি বে? তু কি ভেবেছিস বুল্ তো? মতলব কি রে তুর?

ছোকরা ব্যস্তভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলে, কোনও উত্তর দিলে না।

জনাব বললে, দেখ্, একটি বাত তুকে বলি, শুনে রাখ। এই টাকা বড় খারাপ চিজ। চাঁদি লয়, পারা। পারাকে পুড়ায়ে ভসম লিয়ে খা, সি তখুন ওষুদ। কাঁচা খা, গায়ে ফুটে নিকলে যাবে।

একখানা ইট হাতে নিয়ে তার উপর কর্ণিকের ঘা দিতে দিতে আবার বলে, পরের ষোল-আনি টাকা, যখুন ষোল-আনি কাম করে লিবি, তখুন সে হল পারা-ভসম। তাতে যা খাবি, সে দিবে তুকে তাগদ।

আর ফাঁকি দিয়ে লিবি তো সি টাকা লয়, সি পারা। তাতে যা খাবি, সে হবে বদহজমী।

রাগ হলে জনাবের হাতের কাজের গতি বেড়ে যায়। বাঁ হাত বাড়িয়ে সে বললে, ইট লাতবউ! হাঁ মসলা—জল লাতিন। আচ্ছা, বাস করো।

খং—খং—খং—খং, ইটের উপর কর্ণিকের আঘাত কামারশালায় লোহার উপর হাতুড়ির আঘাতের শব্দের মত বাজতে লাগল।

জনাব বললে শ্যামাদাসবাবুকে, আপনি যান বাবু। আজ থেকে আমি ফিতা মেপে হিসাব করে কাম লিব। এই—এই রসিদ। এই হারামজাদী শুষনি! এই!

জনাবের হাঁকে-ডাকে চারিদিকে মুখরিত হয়ে উঠল, সচকিত হয়ে উঠল সকলে। চালাও চালাও। কাম চালাও। হাঁ।

খসখস শব্দে কর্ণিক চলতে লাগল জল-সপসপে চুন-সুরকি-মেশানো মসলার উপর। গাঁথনির ইটের গায়ে পাটা বসিয়ে তার গায়ে হাতুড়ির আঘাত পড়তে লাগল—ঠক—ঠক—ঠক—ঠক।

জনাব আবার কিছুক্ষণের মধ্যে খুশী হয়ে উঠল! হ্যাঁ। এই তো! তারপর সে কাহারদের বউ মতিবালাকে বললে, লে তো ভাই লাতবউ, দুপুরের আমেজে ধর্ তো একখানা মিহি গলায়। ধর্ তো! লাতিন তু ভাই একবার তামুক সাজবি।

মতির বড় বড় চোখ, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুলে মস্ত বড় খোঁপা। জনাবের ভারি প্রিয় সে। এরই মধ্যে জনাব তার লজ্জার সঙ্কোচকে অনেকখানি সহজ করে এনেছে। গান গাইতে বললে, সে আর সলজ্জভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু হেসে নিরুত্তরভাবে ঘাড় নেড়ে অস্বীকৃতি জানায় না, দিব্য গান গেয়ে যায়। এদের লজ্জা-সঙ্কোচকে জয় করবার শক্তি এবং দক্ষতা জনাবের অদ্ভুত।

দাসী তামাক সাজতে বসল। মতি মৃদুস্বরে গান ধরলে—

"বাবুদের চিলে কো-ঠার ছাদে
চিল কাঁদিছে গো ভরা-দুপুরে—
চিলি পালায় কোথা বাসা
বেঁধেছে কোন্ তালপুকুরে।"

জনাব বললে, উঃ, কতকালকার গান! ছেরকাল রেজেরা গায়।

দাসী হুঁকো-কল্কে এগিয়ে দিলে। জনাব কল্কে খসিয়ে মতির হাতে দিয়ে বললে, লে, পেসাদ করে দে ভাই। তু খেয়েছিস তো ভাই লাতিন? তারপর আবার বললে, দে, উয়াদিকে এক ছিলাম ভাল তামাক দে। লে রে ভাই, খা, খুসবয়ওয়ালা তামুক এক টান খেয়ে—লে, জমিয়ে কাম কর্।

আবার বললে সান্ত্বনার সুরে, দেখ্ তুদের ভালর তরেই বুলি। ষোল বছর বয়সে বাবা কর্ণি হাতে দিয়েছিল, আর ওই কথাটি বুলেছিল আমাকে। বুলেছিল—বাপ, এই কথাটি মনে রাখিয়ো; আগে ষোল আনি কাম দিবে, তার বাদে ষোল আনি টাকাটি লিবে।

কর্ণিকের আঘাতে একখানা ইট ভেঙে আধখানা নিচে পড়ে গেল। জনাব একবার দেখে নিলে নিচেটা। তারপর বললে, জোয়ানী কাল হল খাটবার আর কাম শিখবার কাল। যে শিখবে আখের ভাল হবে। লইলে আখের তার ঝরঝরে। ওই তিনকড়ে আর আমি এক সাথে কাম শুরু করেছিলাম। তা দেখ্ কেনে, তিনকড়েকে কেউ ডাকে? গারার (কাদার) গাঁথুনি গেঁথেই তার দুনিয়ার বিস্তি কাবার হয়ে গেল।

মতি হেসে বললে, তিনকড়ি মিস্ত্রীর ওপর তোমার ভারি রাগ, লয়?

হা-হা করে হেসে উঠল জনাব।—তুকে কে বুললে গো লাতবউ?

মতি সলজ্জ কৌতুকে বললে, রঙ্গুকে নিয়ে ঝগড়া আমরা জানি না বুঝি?—হাড়ীদের মেয়ে রঙ্গু!

উত্তরে জনাব মতির ডাগর চোখের সলজ্জ দৃষ্টি নিয়ে রসিকতা করে বসল। মতি মুখে কাপড় দিয়ে বলল, মরণ!

জনাব বললে, ঠিক তুর মত চোখ আর চুল রঙ্গুর। তবে তুর চেয়ে অনেক কালো। তেমন কালোই আর চোখে পড়ল না।

জনাব হঠাৎ ভারার উপর উঠে দাঁড়াল।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম। তবে পাকা গাঁথুনির ঘরের সংখ্যা কম। দক্ষিণে হরিশবাবুর দোতলা দু-মহলা দালান, মধ্যে শ্যামাদাসবাবুর এবং শ্যামাদাসের ভাইয়ের পাকা বাড়ি। তারই ওধারে রামবাবুদের একতলা দালান। মধ্যে মন্দির। রামবাবুদের পাঁচটা শিবমন্দির পাশাপাশি।

ও-পাড়ায় দুটো খুব প্রাচীনকালের মন্দির। ওই উত্তর দিকে একটা মন্দির। উত্তর-পশ্চিম কোণে জনাবের পাড়ার মসজিদ। মিনার দুটো সোজা উঠে গিয়েছে।

জনাব বললে, ওই দেখ লাতবউ। ওই রামবাবুর একতলা দালান। ওই দালানে আমার হাতে-খড়ি। তিনকড়িরও হাতে-খড়ি ওই হোথাকেই। রঙ্গু এল খাটতে। আমাদের থেকে রঙ্গু বয়সে বড়। এই তুর মতুন চোখ, দাসীর মত চুল, আর সে কি কালো রঙ! দেখে আমি মাতাল হয়ে গেলাম। ইটা দিতে এল রঙ্গু। লিতে গিয়ে ঝুড়ির কিনারাটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল। রঙ্গু মুচকী হেসে বললে—ফেললে তো। দেখো, নিজে পড়ে যেয়ো না।

দাসী হেসে বললে, তা বাদে তুমি তো রঙ্গুকে নিয়ে ভাগলে তিনকড়ির ভয়ে।

ভাগলাম?—জনাবের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। সে বললে, তিনকড়ির ভয়ে ভাগি নাই।

* * *

জনাবের বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। আঠারো বৎসর বয়সে হাড়ীদের মেয়ে রঙ্গুকে নিয়ে সে একদিন এখান থেকে পালিয়েছিল। লোকে বলে—তিনকড়ি রাজমিস্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রঙ্গুকে ছিনিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্যই জনাব পালিয়েছিল। জনাবের আত্মসম্মান এতে যেন আহত হয়। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনকড়ি? আরে, শরমকি বাত, লজ্জার কথা! মর্কটের মত চেহারা, উল্লুকের মত তরিবৎ, তার সঙ্গে পিয়ারীর দল নিয়ে লড়াইয়ে নাকি জনাবকে পালিয়ে যেতে হয়! সেকালের জনাবের চেহারা এরা দেখে নাই। তাই এমন কথা বলে।

পালিয়েছিল সে অন্য কারণে। রঙ্গু যদি যেতে রাজী না হত, তবু সে পালাত। বাপের সঙ্গে গিয়েছিল সে পাথরচাপড়ির মেলা। বড় জাগ্রত পীরসাহেব সেখানে। দশ-বিশ হাজার লোক জমায়েত হয় পীরের অর্চনার জন্য। তার অসুখের জন্যই তার বাপ পীর সাহেবের কাছে মানত করেছিল। মানতের টাকা ধান মোমবাতি তেল নিয়ে সপরিবারে তার বাপ পাথরচাপড়ি গিয়েছিল। পথে কিছু দূরে পড়ে রাজনগর।

এককালে নবাব ছিলেন এখানে। সেখানের অনেক ইমারত আছে। পাথরচাপড়ির ফেরত রাজনগর দেখতে গিয়েছিল তারা।

জনাব অবাক হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড এক তিন-খিলানী ফটক। আশপাশ সব ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু তিন-খিলান দাঁড়িয়ে আছে জমাটবন্দী পাথরের মত। কি তার বাহার, কি সব নক্সা। রাজমিস্ত্রীর ছেলে সে—নিজে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখছে, কিন্তু এ জিনিস সে কল্পনাও করতে পারে নাই কখনও। মনে মনে হাজারো বার, লাখো বার সেলাম জানালে এই ইমারতের ওস্তাদ কারিগরকে। সবিস্ময়ে সে বার বার উচ্চারণ করলে—শোভান আল্লাহ!

ছেলের বিস্ময় দেখে বাপের কৌতুক হল। সে ফিরবার পথে জেলার সদরের ইমারতগুলো দেখিয়ে নিয়ে এল। হিন্দুদের এক পুরানো মন্দির আছে। সে দেখেও তার তাজ্জব মনে হল।

জনাব চোখে যেন জাদুর সুরমা পরে ঘরে ফিরল। হাজার সেজের ঝাড়-লণ্ঠনের হাজার বাতির আলোর জলসা থেকে ফিরে কাঠের পিলসুজের উপর মাটির প্রদীপ দেখে যেমন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, তেমনই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একমাত্র সান্ত্বনা-স্থল ছিল রঙ্গু। গ্রামের বাইরে বিশ-পঁচিশটা ঝুরিওয়ালা বটতলায় রাত্রে কেউ যায় না। বলে—ভূত আছে ওখানে। জনাবের ওই জায়গাটা খুব ভাল লাগে। বুড়া গাছটার ঘন ছায়ার তলায় কোন গাছ, এমন কি ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না,—পাকা মেঝের মত তকতক করে, মাথার উপরে ডালে পাতায় ছাউনিটি সুডৌল গোল, যেন ছাদের মত—গম্বুজের মত মনে হয়। মূল কাণ্ডটাকে চারদিকে ঘিরে বিশ-বাইশটা মোটা ঝুরি নেমে মাটির বুক ফুড়ে চলে গিয়েছে—বিশ-বাইশটা থামের মত। ছেলেবেলা থেকেই জনাবের এই গাছতলাটিকে বড় ভাল লাগত। এখন শুধু ভালই লাগে না, এখন তার মনে হয়, খোদাতায়লার এ এক বাহারের ইমারত। ছেলেবেলায় এসে গাছটার কাছে বসে থাকত দিনের বেলা। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সাহস বাড়ল, তখন বিকেলের দিকে এসে গাছটার তলায় গিয়ে বসত, ঘুরে-ফিরে দেখত। রঙ্গুর সঙ্গে পরিচয় যখন প্রেমে পরিণত হল, তখন সেই প্রেমে তার সাহস হয়ে উঠল দুঃসাহস। সন্ধ্যার পর সে এসে গাছতলায় দাঁড়িয়ে

থাকত একটা মোটা ঝুরিতে ঠেস দিয়ে। ঝুরিটিতে এবং জনাবে যেন এক হয়ে যেত। গাছটার ঝুলে-পড়া ডালে ঝুলিয়ে দিত তার সাদা গামছাখানা। দূর থেকে অন্য লোক ভয় পেত, ভাবত, সাদা কাপড় পরে কেউ গাছের ডালে বসে দোল খাচ্ছে! রঙ্গু দূর থেকে বুঝতে পারত জনাবের নিশানা। সে নির্ভয়ে চলে আসত। রঙ্গুর সঙ্গে যতক্ষণ থাকত, ততক্ষণ ছিল তার আনন্দ।

রঙ্গুর কাছে সে গল্প করত রাজনগরের তিন-খিলানি ফটকের সদরের চূড়ার, মন্দিরের, সদরের বড় বড় ইমারতের, এর ওর কাছ থেকে শোনা শহর মুরশিদাবাদের নবাবী আমলের ইমারতের। শহর-কলকাতায় এক মিনার আছে—নাম বলে মনুমেণ্ট, তলাতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে মাথার পাগড়ি টুপি খসে মাটিতে পড়ে যায়।

রঙ্গুর শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু অবসর হয় না। তারও ঘর-দুয়ার আছে—মা-বাপ-ভাই আছে, স্বামী আছে। রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে যারা মজুরনী খাটে তাদের সঙ্গে রাজমিস্ত্রীদের অপবাদ রটে, অভিভাবকেরা জানে—অপবাদের মূলে সত্যও আছে; তবু নিয়ম হল সব দিক মানিয়ে চলার। সেইটাই ভাল। রাজমিস্ত্রীদেরও এ বিষয়ে একটা নিয়ম আছে, সেটা তারা মেনে চলে; গোপনে প্রেম যতই প্রবল হোক, তারা প্রণয়িনীদের ঘরছাড়া করে নিজের ঘরে আনে না। এতে বদনাম হয় তাদের। ব্যবসার ক্ষতি হয়। লোকে কাজ দিতে চায় না, মজুরনীদের কাজ করতে পাঠাতে চায় না তার কাছে।

অকস্মাৎ একদিন জনাব তাকে বললে, আমার সঙ্গে যাবি?

কোথা? কোলকাতা, না, মুরশিদাবাদ, না, ডিল্লী, না, লাহোর? তুমি তো নিয়ে গেছ আমাকে কত জায়গা। হাসলে রঙ্গু।

রঙ্গুর হাত চেপে ধরলে জনাব, বললে, না। ইবার আমি পালাব, খোদার কসম। একটু চুপ করে থেকে জনাব বললে, বাপজীকে এত করে বুললাম, তা সি যেতে দিবে না। বুলে—মা-মরা ছেলে আমার তু, তুকে ছেড়ে থাকতে লারব আমি। আর গাঁয়ে মায়ে সমান কথা রে বাবা, ইখানেই কাল কেটে যাবে খেয়ে-পরে কোন রকমে। উ সব খেপামি করিস না।

তা তো হল। কিন্তু যাবে কোথা? জায়গাটা শুনি?

সাহেবডাঙ্গার কুঠি জানিস ?

হ্যাঁ। রেশম-কুঠি আছে সাহেবদের।

সেথাকে।

রেশম-কুঠিতে কি করবা ?

সিথানে লতুন করে সব ইমারত হবে। পুরানো সব ভেঙে নয়া-নয়া কারখানা করছে সাহেবানেরা। মোটা মজুরি। যাবি ?

রঙ্গু এই অল্পবয়সের মধ্যে বহুজনের প্রলোভনে পড়েছে, অর্থসামগ্রীও সে অনেক পেয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ জনাবের মত নিজেকে দেয় নাই এমনভাবে। ফলে, সব দিক মানিয়ে, ঘর-সংসার এবং জনাব—এই দুইকেই বজায় রেখে মানিয়ে চলা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সে প্রকাশ্যভাবে জনাবকে তার নিজের বলে এবং নিজেকে একান্তই জনাবের বল ঘোষণা করে দাঁড়াতে চায়। সে বললে, চল, তাই চল।

পরদিন সন্ধ্যায় আর তারা মিলিত হল না। রাত্রি একটু গভীর হলে জনাব এসে দাঁড়াল গাছতলায় একটি পুঁটলি নিয়ে। ছোট বড় পাটা দুখানা হাতে নিয়েছিল। রঙ্গুও এল একটি পুঁটলী নিয়ে। দুজনে তারা বেরিয়ে পড়ল।

নদীর ধারে সাহেবডাঙায় রেশম-কুঠি। একেবারে নদীর কিনারার উপর। সাহেবানদের কীর্তি দেখে জনাব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। শোভান আল্লা! ক্রোশ ভর কিনারা একদম নিচে থেকে উপর পর্যন্ত বাঁধিয়ে ফেলেছে। বাঘিনীর মুখের মধ্যে লোহার দস্তানা পরা হাত পুরে দিলে যেমন হয়, দরিয়ার হাল হয়েছে ঠিক তেমনই। কষের দাঁত দিয়ে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চিবুতে চেষ্টা করছে সে। বাঁধানো সীমানা বরাবর নদী এখানে ধনুকের মত বাঁক ঘুরতে বাধ্য হয়েছে।

বাঁধানো কিনারার উপর উঠেছে কুঠি। পাঁচিল চলে গিয়েছে তীরের মত সোজা। তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে গোল থামওয়ালা দোতলা বাড়ি; সবচেয়ে বিস্ময়কর, চৌপলা মিনারের মত উঠে গিয়েছে ইটের তৈরী চিমনী।

ঘাটে উঠবার সময় জনাব পোস্তার গাঁথনিটা বেশ করে হাত দিয়ে নেড়ে দেখলে। অ্যায় বাপ রে বাপ! জমে একদম পাথর বনে গিয়েছে।

ইটের উপরে ইট, তার উপরে ইট, মাঝখানের মসলা কোথায় কতটুকু, ধরতে পারা দূরে থাক্‌, আন্দাজও করা যায় না।

সাহেবের সামনে গিয়ে সেলাম করে সে দাঁড়াল। কুঠির তখন অনেক কাজ, নতুন বয়লার বসবে, চিমনি তৈরি হবে; নতুন করে পাঁচ শো খাই তৈরি হবে, তার শেড চাই। নতুন গুদাম হবে, কোয়ার্টার হবে, আণ্টাঘর হবে। অনেক কাজ, অনেক মিস্ত্রী চাই, অনেক লোক চাই। কাজ পেয়ে গেল জনাব। কুঠির দারোয়ান তাকে সঙ্গে করে জিম্মা করে দিলে বড় মিস্ত্রীর—শেখ খুরসেদ আলি।

ঘাড়-কামানো বাবরী চুল—চেরা সিঁথি, মাথায় মখমলের টুপি, গায়ে পাঞ্জাবি আস্তিন, পরনে চেকদার লুঙ্গি, পায়ে ফুলদার চকচকে জুতা—নাম পাম-শু। দোষে গুণে বেশ মানুষ ছিল খুরসেদ। বয়স তখন তার চল্লিশ-পয়তাল্লিশ। জনাবকে একনজর দেখলে। জনাবকে দেখতে গিয়ে রঙ্গুকে দেখে সে বললে, ও? ও কে?

জনাব বললে, আমার লোক। তারপরই নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বললে, আমার বিবি।

খুরসেদ হেসে বললে, ঝুট।

তারপর আবার হেসে বললে, তাতেও কোন হরজা নেই। তুম রাজমিস্ত্রী হ্যায়—উ তুমার রেজা হ্যায়। লেগে যাও কাজে। পিঠের দিকে জামার গলায় ঝুলানো ছিল ভাঁজ-করা ইঞ্চি মাপের স্কেলটা—সেটা সে টেনে নিয়ে মাপতে বসল গাঁথনিটা। অবাক হয়ে গেল জনাব। সেও লাগল পরের দিন থেকে।

নদীর ধারের পলিমাটির তৈরী ইট—পগমিলে মাটি তৈরি হয়েছে, বাক্স-ফর্মায় ছখানি পিঠ একেবারে যেন র‍্যাঁদা করা কাঠের মত সমান; একখানির উপর আর একখানি রাখলে বেমালুম বসে যাবে—কেতাবের ভিতরে সমান মাপে কাটা কাগজের উপর কাগজের মত। পাতলা গঁদের আঠার মত আস্তরণ মসলা কর্ণিক চালিয়ে টেনে দিয়ে একখানার পর একখানা ইট বসিয়ে যাচ্ছে সোহাগার পান দিয়ে জোড়া সোনার দানা দানার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। থিলান হচ্ছে—সাহেব লোকের আণ্টাঘর—গান হবে, বাজনা হবে, সাহেব মেম লোক নাচবে—জোড়া বেঁধে; গোটা ঘর জোড়া এক থিলান, দুই ধারে দুই থাম।

বিশ ফুট চওড়া খিলান। মোটা শালের রোলা দিয়ে মাচা বেঁধে খিলানের ঠেকা বাঁধা হয়েছে, তার উপর ইট গাঁথা হচ্ছে। খিলানের ইট সোজা বসছে না, বসছে আড়াআড়ি। মসলা নিয়ে দাঁড়িয়ে তৈরী করিয়েছে বড় মিস্ত্রী। বিলাইতী মাটি আর কাশীর চিনির মত মিহি বালি মিশিয়ে শুকনা অবস্থায় বার বার তাকে কেটে ঘেঁটে মিশিয়ে জল ঢেলে ক্ষীরের মত পাতলা করে তৈরী সে মসলা। সেই মসলা ঢেলে দিচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে, কর্ণিক দিয়ে মেজে ঘষে জোড় মিলিয়ে দিচ্ছে। বিলাইতী মাটি ওই এক তাজ্জবের মসলা! বালিতে আর বিলাইতী মাটিতে মিশিয়ে তাল পাকিয়ে রেখে দাও ঠাণ্ডায়, একটু শুকালে ফেলে রাখ পানিতে; একদিন পর তুলে নাও—বাস্, পাথরের গুলি হয়ে যাবে!

আণ্টাঘরের গাঁথনি শেষ হল। আরম্ভ হল পলেস্তারা। সাহেব বলেছিল—বিলাতী মাটিতে বালি মিশিয়ে পলেস্তারা কর। খুরসেদ বললে, হুজুর, পঙ্কের কাম হোক—মার্বেলকে মাফিক জিল্লা দেগা। উসকে 'পর আঁখ রাখনেসে দরদ নেহি লাগে গা।

তিনকড়ি রাজ পঙ্কের কাম হয়তো চোখে দেখেছে। এখানে জনাব কিছু করেছে। কিন্তু সে কাজের হদিস সে জানে না। বিলাইতী মাটি এখানেও আমদানি হয়েছে অনেকদিন। তিনকড়ি বুদ্ধি খাটিয়ে বেশি মজবুত করবার জন্য বিলাইতী মাটির সঙ্গে মেশাবার বালির ভাগ কমিয়ে চুন মিশিয়েছিল তার বদলে। উল্লুক—বুরবক—গিধ্বড় কাঁহাকা! মনে পড়লে জনাবের হা-হা করে হাসতে ইচ্ছে করে। মদের সঙ্গে দুধ! আরে উল্লুক! হায় নসীব জনাবের। বিলাইতী মাটির সঙ্গে চুনা! তোবা! তোবা! ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল গাঁথনি।

হায় খোদা! হে ভগবান! এ কাজ কি এত সোজা? এ কি এমনি হয়। খোদাতায়লা দুনিয়া তৈরি করলেন—কোথাও গড়লেন পাহাড়, কোথাও গড়লেন নদী, কোথাও গড়লেন বন, সমান মেঝের মত দুনিয়ার ক্ষেত গড়লেন, কিনারায় কিনারায় সমুদ্দুর। তাঁর কাছ থেকেই না বড় বড় মানুষ দামী মগজে ভরে নিয়ে এল সেই বিদ্যা। সে কি সোজা! কত বড় বড় কেতাব লিখেছে সব বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, কত নকশা, কত মসলা, কত মাপ, কত হিসাব! সে দেখেছে। চোখে দেখেছে সে সব কেতাব সাহেবানদের টেবিলের উপর। খুরসেদ কতক শিখেছিল

তাদের কাছে, কতক শিখেছিল তার পুরানো দেশী ওস্তাদের কাছে—মুরশিদাবাদের বুড়া ওস্তাদ কারিগর, মগজের খোপে খোপে ছিল তার নবাবী আমলের ইমারতী এলেম। খুরসেদের কাছে জনাব অনেক কষ্টে আদায় করেছে এইসব বিদ্যা, এইসব এলেম। বহুৎ দাম তাকে দিতে হয়েছে এর জন্য। রঙ্গুকে দিতে হয়েছে খুরসেদকে।

রঙ্গুকে দেখে নেশা জাগল খুরসেদের। জনাবের উপর সে সদয় হয়ে উঠল। জনাবের কাছে সে পান চাইত রোজ। বলত, রঙ্গিলা বিবির হাতের সাজা পান খাওয়াও মিয়া। এই সূত্রপাত। তারপর একদিন বললে, রঙ্গিলা বিবির হাতের রান্না খাওয়াও জনাব ভাই। তখন জনাবকে রাখত সে ঠিক নিজের পাশে। জনাবও তখন কাজের নেশায় বিভোর। তখন খুরসেদের এ নেকনজরের কারণ ঠিক ধরতে পারে নাই। ভাবত তার কাজে খুশী হয়ে বড়মিস্ত্রী তাকে ভালবাসছে, তাকে ঠিক ভাইয়ের মত দেখছে, তাই তার বাড়িতে নিজে থেকে যেচে নিমন্ত্রণ নিলে। রঙ্গুর হাতের রান্না খেতে চাওয়ায় খুরসেদের কিছু মতলব ঠাওর করবার মতও ছিল না। সে নিজেই পঞ্চমুখে রঙ্গুর রান্নার প্রশংসা করত। রঙ্গু হাসত কাজের যোগান দিতে দিতে।

রঙ্গু সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, তাই নেমন্তন্ন কর বড়মিস্ত্রীকে। খুব আচ্ছা করে কলিজার কালিয়া রেঁধে খাওয়াব।

জনাব সেদিনও বুঝতে পারে নাই কথাটা।

বুঝতে পারলে, হঠাৎ একদিন খুরসেদ তাকে বললে, রঙ্গিলা বিবিকে তুমি ছেড়ে দাও জনাব ভাই।

চমকে উঠল জনাব।

আমি ওকে কলমা পরিয়ে নেকা করব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল জনাব।

বড়মিস্ত্রী হেসে বললে, রঙ্গি চলেও গিয়েছে আমার বাসায়। সেও রাজী আছে। আর বেশি গোলমাল করলে কোন ফায়দাও হবে না এতে। সেটা তুমি সহজেই সমঝাতে পার।

সমঝাতে হল বইকি। সারারাত নদীর বালিতে বুক চাপড়ে কেঁদে সে বুঝলে। মনকে বুঝালে। তার পরের দিনটাও সে বুঝলে। তার

পরদিন সে হাসিমুখে এসেই খুরসেদকে বললে, তাই হোক বড়ভাই। হাজার হলেও তুমি ওস্তাদ।

বড়মিস্ত্রী বললে, তুই বেছে নে, এত কামিন রয়েছে—যাকে পছন্দ হবে তোর বল্।

পছন্দ সে করলে একজনকে, কিন্তু সে কথা বললে না বড়মিস্ত্রীকে। খুরসেদের বাসায় ছিল কিছুদিন আগে নেকা করা স্ত্রী। তাকেই নিয়ে একদা সে সাহেবডাঙা থেকে গভীর রাত্রে বেরিয়ে পড়ল। তখন আণ্টাঘরের মেঝে হয়ে গিয়েছে—ছাদ হয়েছে, পলেস্তারা হয়েছে, থামে পঙ্কের কাজের পালিশ হয়েছে। গাঁথা হচ্ছিল তখন চিমনি। মাঝের জায়গায় গাঁথুনি চলছিল, ভারার উপর থেকে নীচের দিকে চাইলে শরীর শিরশির করে—মাথা ঝিমঝিম করে। খুরসেদ তখন কিছু কিছু সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তার ভয় হল হঠাৎ খুরসেদ তাকে ভারা থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। শয়তান, ও সব পারে। পুরো চিমনিটা গাঁথতে সে পারলে না—এই আফসোস নিয়েই সে হামিদনকে নিয়ে পালাতে বাধ্য হল।

ঘণ্টা বাজছে। ঢং ঢং করে পাঁচটা ঘণ্টার আওয়াজ হল। ইস্কুলের ঘণ্টা, পাঁচের ঘণ্টা শেষ হল, বাজল তিনটে। জনাবের চমক ভাঙল—কতকালের কথা! কাজ করতে করতেই সে ভাবছিল। হাতের শেষ ইটখানি বসিয়ে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

মতিবালা প্রশ্ন করলে, কি ভাবছিলে গো ওস্তাদ? রঙ্গুকে?

হেসে জনাব বললে, উঁহু।

তবে?

তুর ডাগর চোখ তুটি ভাবছিলাম।—সে তার গালে একটা টোকা মেরে দিলে।

রাগের ভঙ্গিতে মুখ গম্ভীর করে মতি বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, উ কি? না। হ্যাঁ।

নিচে থেকে ডাকলেন শ্যামাদাসবাবু, জনাব!

এই যাই আজ্ঞা। আজ দেখেন কাজ। মেপে দেখেন।

কাটান দিলে?

কাল দিব। ভেবে দেখলাম—আজ দিলে জেরাসে খুঁত থাকত।

শ্যামাদাস চঞ্চল হয়ে নথ খুঁটতে আরম্ভ করলেন।—শোন তো তুমি, শোন তো। একে বলে—তোমার মতলবটা কি একবার খুলে বল তো শুনি?

জনাব বললে, পেটে এখুনও দানা-পানি পড়ে নাই বাবু। এখুন লয়। আসব সন্‌জের সময়। এখুন হয়তো খারাপ বাত বেরিয়ে যাবে। সন্‌জেতে আসব।

* * *

সন্ধ্যার সময় সে এল। এখন তার গায়ে ফতুয়ার বদলে জামা। পরনে কাপড়—বহরে বড়। কোঁচাটি উলটে গুঁজে প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে মানানসই করে নিয়েছে।

শ্যামাদাসবাবু বললেন, লোকে যা বলে, মিছে নয়। লাগলে, একে বলে—থামতে চাও না।

জনাব হেসে বললে, এ আপুনি কি বুলছেন হুজুর? কাম শেষ না হলে থামব কি করে গো? সবেরই একটা সময় আছে, থামাবারও একটা সময় আছে। এ কি বাজিকরের হুঁকার জল—হই বসায়ে দিলে, দিয়ে বুললে—পড়্, জল পড়তে লাগল। বুললে—থাম্! ব্যস,থেমেগেল।

শ্যামাদাসবাবু বললেন, আজ কাটান মারবার কথা তুমি নিজে—

হাঁ বলেছিলাম তা দেখলাম আজ যদি এইখানে কাটান মারি, তবে জেরাসে খুঁত হয়, খারাপ হয়ে যায় মন্দিল। ধরেন, সবেরই একটা হিসাব আছে। ফিতা ধরে মাপ—ফুট-ইঞ্চির হিসাব।

কিন্তু এরই মধ্যে কত উঁচু হয়েছে দেখেছ?

জনাব ভুরু কুঁচকে হাসলে।—উঁচু হয়েছে! উই কি উঁচু? উঁচাই যদি না হবে, তবে মন্দিল করছেন কেনে হুজুর? একখানা সাত ফুট বাই আট ফুট গারার গাঁথনি ঘর করলেই তো হত। মাথার উপর একটা তেকোনো পেরাপেট গেঁথে একটা ত্রিশূল বসায়ে দিলেই হয়ে যেত। তা বলেন না কেনে—এখনও হবে। তাই করে দিছি আপনার। গাঁথুনি বন্ধ থাক্, কড়ির অডার পাঠায়ে দিন, টালি আনিয়ে নিই—

বাধা দিয়ে শ্যামাদাসবাবু বললেন, আঃ, তুমি বড়, একে বলে—বাজে বক জনাব। তা কে বলছে হে বাপু? চঞ্চল হয়ে, তিনি চেয়ার থেকে

উঠে পড়লেন, ঘুরতে লাগলেন ঘরময়, আঙুল দিয়ে নখ খোঁটার মাত্রা বেড়ে গেল।

জনাব বললে, তবে আপনি বুলছেন কি? মন্দিল হবে আপনার। আমার লয়। আমি লিয়ে যাব না ঘরে। লোকে বলবে না—জনাব শেখের মন্দিল, বুলবে – অমুক বাবুর মন্দির। হুজুর, মন্দিল লোকে করে কেনে? ঘর করলেই তো হয়। হুই মাথা লম্বা করে আকাশের গায়ে মার দিয়ে মন্দিল করে কেনে? তার উপরে দেয় আপনার কলস, তার উপর ত্রিশূল—কেউ দেয় চক্র। কেউ বা দেয় পিতলের, কেউ বা দেয় সোনার। কেনে দেয় হুজুর? উঁচার জন্যেই মন্দিল। আপনার দেবতা—আপনার ঠাকুর যে ইমারতে থাকবেন, সে নিচু হবে মানুষের 'থনি' (চেয়ে)? আপুনি থাকেন দোতলা ঘর, তার চিলকোঠা হুই উঁচা। আর ঠাকুরের মন্দিল এই নিচু হবে? মন্দিল হবে, দেবতার মন্দিল আকাশের গায়ে মার দিয়ে মাথা উঁচা করে খাড়া থাকবে, সুরুযের আলো পড়ে সোনার কলস ঝলবে। গাঁয়ের লোকের ঘুম ভাঙবে সকালে, আল্লাকে—ভগবানকে প্রণাম করতে মুখ তুলবে, আপনার মন্দিলের চূড়া চোখে পড়বে। তারা প্রণাম করবে আপনার ঠাকুরকে। বলবে—হ্যাঁ, অমুক বাবু একটা আদমীর মতন আদমী ছিল, ভক্ত ছিল বটে, মন্দিল করে গিয়েছে বটে। বেহেস্তে থেকেও শুনবেন সে কথা আপনি। মন্দিলের চূড়া ক্রোশ বরাবর দূর থেকে দেখা যাবে। তবে সে মন্দিল। গাঁয়ের চার পাশে গাছপালা, জঙ্গল মনে হয় দূর থেকে। সেই জঙ্গলের মাঝখানে গাছপাপালার মাথা ছাড়িয়ে আশ্বিনের টুকরাভর মেঘের মত মন্দিলের মাথা দেখা যাবে। লোকের প্রথমে মনে হবে, মেঘই বটে। তা'পর মনে হবে—না, মেঘ তো লয়; মন্দিল—এ মন্দিল। তারিফ করবে লোকে। বলবে—হ্যাঁ, ইমানদার লোকের কীর্তি বটে। দেশদেশান্তরের লোক কেউ আসছে ই-গায়ে। পথে রাহীকে শুধালে—অমুক কত দূর ভাই? লোকে বুলবে—আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই নজরে আসবে, পহেলেই দেখতে পাবে—এক মন্দিলের চূড়া। ওই চূড়াতে চোখ রেখে চলে যাও।—কার মন্দিল ভাই?—অমুক বাবুর মন্দিল। হ্যাঁ!

শ্যামাদাসবাবু কথার মাঝখানেই পায়চারি ছেড়ে এসে চেয়ারে বসে ছিলেন। স্তব্ধ হয়ে তিনি বসে ছিলেন। নখ খুঁটছিলেন অত্যন্ত

মৃদুভাবে। জনাব তার কল্কের স্তিমিত আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বাইরে গিয়ে বসল। সেখানে আড়ালে বসে তামাক খেতে লাগল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, বাবু!

উঁ।

বুলেন, কথাটা আমি ঠিক বুলেছি কি না?

শ্যামাদাসবাবু বললেন, হুঁ; কথা তো ভালই বটে। একে বলে—শুনতেও ভাল লাগছে। কিন্তু—

উয়াতে আর কিন্তু নেই হুজুর। সাহেবডাঙ্গার কুটি 'থনে' গেলাম বর্ধমান। শুনলাম রাজবাড়িতে ইমারত হবে নতুন। বুঝলেন। পথে পেরথম চোখে পড়ল সারি সারি মন্দিল—একশো আট শিবমন্দিল। দুধের মত সাদা মন্দিলের সারি; আঃ, মাঠের মধ্যেখান—দু কোশ দূর থেকে নজরে পড়ছে, আর মাঝে মাঝে গাছের আড়াল পড়ছে। তা'পর কাছে এলাম। হুজুর, সেখান থেকেই একশো আট সেলাম দিলাম রাজাকে—আর একশো আট সেলাম দিলাম কারিগরকে। তা বাদে আপনার রাজবাড়ির ইমারত, সে কথা বাদই দেন। রাজা বাদশা নবাবদের কীর্তিই আলাদা। কিন্তু আপনিও তো আমীর লোক—আমীরের মত কীর্তি তো আপনাকে করতে হবে। রাজার বাড়ির থাম নিচে তলা থেকে উঠে গিয়েছে তিন তলার ছাদ পর্যন্ত। পঙ্কের কাজ করা গোল থাম। সে সব কথা না হয় বাদই দিলাম। রাজবাড়ির কাম হয়ে গেল, শুনলাম কাম হবে কাছেই এক জমিদার বাড়ির—মন্দিল হবে। নটা চূড়া হবে মন্দিলের, দাওয়া হবে মানুষের গলা ভোর উঁচা। কলকাতার ইঞ্জিনীয়ার নক্সা করেছেন।

শ্যামাদাসবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন।

জনাব অপেক্ষা করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর সেও উঠল। কি করবে সে বসে থেকে? ঝকমারির কাম করেছে সে এই বাবুটির কাজ হাতে নিয়ে। দিলদার লোকের কাম করেও সুখ আছে। তাতে মজুরি কম হয় সেও আচ্ছা। দিলদার লোক ছিল বর্ধমানের সেই জমিদার। ঘুরঘুর করে বাবুসাহেব মন্দিরের চারি পাশে ঘুরছেই।

হাঁ, ওখানটা কেমন যেন বেঁকে গেল মিস্ত্রী?

না হুজুর, ঠিক আছে। নিচে থনে উঁচাতে এমন দেখায়।

মিস্ত্রী দেখ, আমার ভারি ইচ্ছে—

বলুন হুজুর, বলুন কি ইচ্ছে।

ইঞ্জিনীয়ার করেছেন বটে মাঝখানের চূড়াটি এই রকম, কিন্তু আমার ইচ্ছে—বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দির তুমি দেখেছ তো—সেই রকম হয়।

হবে, সেই রকমই হবে।

আর দেখ, ভেবেছিলাম মন্দিরের সামনে সে খিলানের বারান্দা, ওইখানেই শুধু মার্বেল দেব। তা না, সামনের সে খোলা বারান্দা ভিজে রোয়াক, ওটাতেও মার্বেল দেব। কি বল?

হাঁ হুজুর! খুব ভাল হবে।

বর্ধমানের ওই গাঁয়েই হামিদন মরেছিল। বিশ্রী ঘা হয়ে মরেছিল হামিদন। হামিদনের দোষ নাই। সে ঘা তাকে ধরিয়েছিল জনাব। জনাবকে ধরিয়েছিল বর্ধমানের কামিন সৈরভী। ছিপছিপে পাতলা চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, ঢুলঢুলে চোখ; ঠোঁট দুটো একটু উঁচু ছিল সৈরভীর; হাসলে দাঁতের সঙ্গে মাড়ি বেড়িয়ে পড়ত। নেশা লাগত তাকে দেখে। কিন্তু বিষ ছিল তার মধ্যে। সে-ই জনাবের জীবনে প্রথম বিষ। জনাব নিজের চিকিৎসা করেছিল। হামিদন লুকিয়েছিল প্রথমটা। তারপর যখন প্রকাশ করতে বাধ্য হল, তখন সে বর্ধমান ছেড়েছে। দূর-পাড়াগাঁ থেকে চিকিৎসা ভাল হয় না। মরে গেল হামিদন।

নসীব—নসীব জনাবের। হামিদন মরে গেল—মন খারাপ হয়ে গেল জনাবের। জমিদার-বাড়ির কাজ শেষ হতেই সে ফিরে এল এ গাঁয়ে। বাপজান সেই সময় অসুখে পড়েছিল। বাপজান বললে, আর বিদেশে যাস না বাপ। যে কটা দিন আমি বাঁচি, ইথানেই থাক। কাজকাম কর্। সাদী নিকা কর্।

জনাব থেকে গেল। নসীব জনাবের।

জনাব বেরিয়ে আসছিল শ্যামাদাসবাবুর ওখান থেকে। থমকে সে দাঁড়াল শ্যামাদাসবাবুর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই পতিত জায়গাটায়—মন্দিরের সামনে।

মন্দিরের পিছনে পুকুর। পুকুরের ওপারে বোধ হয় চাঁদ উঠেছে।

ওঃ, মন্দির যখন শেষ হবে, তখন এমন বাহার দেবে!

কে? কে উখানে? মন্দিরের সামনে উপরের দিকে মুখ করে কে দাঁড়িয়ে আছে? জনাব এগিয়ে গেল। সে বিস্মিত হয়ে গেল। শ্যামাদাসবাবু উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জনাবের বুঝতে দেরি হল না, বাবু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে মনে মন্দিরটাকে ছকে দেখে নিচ্ছেন।

হুজুর!

শ্যামাদাস চমকে উঠলেন।

আজ্ঞে, আমি জনাব। সেলাম। তা হলে যাই আমি।

একে বলে—কাল থেকে জোর দিয়ে কাজ আরম্ভ কর। একে বলে—বড় হোক ছোট হোক তাড়াতাড়ি শেষ কর।

যো হুকুম।

জনাবও একবার আকাশের দিকে তাকালে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গোটা মন্দিরটা।

মন্দিরের কাজ জোর চলছে। খাঁজে খাঁজে অল্প অল্প ভেঙে চারখানি দেওয়াল পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে উঠে চলেছে। মন্দিরের চূড়ার মাঝখান ছাড়িয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। জনাব ভারার উপর দাঁড়িয়ে দেখে। দুই দেখা যাচ্ছে তাদের পাড়ার মসজিদের মিনার। ও মিনারের আধখানা জনাবের হাতের গড়া। যে বৎসর সে ফিরল, সে সালটা পুরানো লোকের সবার মনে আছে, বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। দু-তিন বাঁশের উপরে বাঁধা ভারা যখন ঝড়ে দোলে তখনই জনাবের সে দিনকার কথা মনে পড়ে। দুনিয়াটা দুলে গেল ঝড়-বাজা ভারীর মত। বড় বড় দালান ভেঙে পড়ল। ছাদে ফাট ধরল। সে ভূমিকম্পে ভেঙে গেল মসজিদের দক্ষিণ তরফের মিনার। এ গাঁয়ে তখন দালান কোথা? হরিশবাবুর দালান, এই শ্যামাদাসবাবুর দালান হয়েছে সবে। রামবাবুদের একতলা দালানটাকে সে ইমারতই বলে না। ইটের পাঁজা। পলেস্তারা নাই, পয়েন্টিং পর্যন্ত না। আরে, আসল মানুষের গাঁথনিটা তো হাড়ের; গাছের ভিতরটা তো কাঠ; হাড়ের

কাঠামোর উপর মাংস লাগিয়ে পঙ্কের কামের পলেস্তারার মত চামড়া দিলে তবে না সে মানুষ, গাছের গায়ে বাকল না হলে কি সে গাছ ? নোনা ধরেছে এর মধ্যে।

মিনারটার মাপ তার মনে আছে। তার ইচ্ছা ছিল মিনারটাকে আরও খানিকটা উঁচু করে সে তৈরি করে, কিন্তু তা হলে উত্তর তরফের মিনারটার সঙ্গে বেমানান হত। অনেক ভেবে তার মনে হয়েছিল, তাতেই বা ক্ষতি কি ? এ দিকেরটা হোক না বড়। পাশাপাশি ছোট বড় তালগাছ দাঁড়িয়ে থাকে—সে কি খারাপ লাগে দেখতে! গড়তে পারলে বেমানানের মধ্যে এমন বাহার আনা যায়, সে একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারা যায়। ট্যারা কামিন টুনীর দিকে সব মাতালের মত চেয়ে থাকে, অথচ ওটা কেউ ধরতে পারে না। মুশকিল তো ওই, সমঝদার লোক মেলে না। বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার হলে বুঝতে পারে। এখানকার লোকে বুঝতে পারে নাই তার কথা। সেই পুরানো মাপে উত্তরের মিনারের সঙ্গে জুড়ি মিলিয়েই গড়তে হয়েছিল তাকে। হায় আল্লা, নিজের বাড়ির দিকে কেউ খেয়াল করে চেয়ে দেখে না। আপনার বাচ্চাদের বড় থেকে ছোট তক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখ দেখি!

আঃ! একটা ছোট্ট ইটের টুকরো লেগেছে জনাবের হাঁটুতে। কে? হুঁ! রসিদটা ছুঁড়েছে মতির গায়ে। দুটোতে চুলবুল করছে। গম্ভীরভাবে জনাব বললে, কাম কর্ রসিদ। কাম করে যা।

মসজিদের মিনারের চেয়ে মন্দির উঁচু হবে অনেক।

মাধববাবুর তিনতলা নয়া দালানটাই এখানকার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। তিনতলার ছাদের সিঁড়ির মাথাটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ওইটাই এখানকার সবচেয়ে ভাল বাড়ি। কলকাত্তার মিস্ত্রী এসে ওর চারিপাশে নক্শা কেটে গিয়েছে, থামের মাথায় কার্নিসে কারিগরি করে গিয়েছে। হাঁ, সে লোকটা মিস্ত্রী একটা। বিলাইতী মাটি আর বালিতে কার্নিসের মাথা জমিয়ে কেটে কেটে বার করত নকশা। দুই হাতে সাদা ফুল। ঠোঁটে গালে সাদা ফুল। খাটো মানুষটা পাজামা পরত, মাথায় দিত মখমলের কালো টুপি, গায়ে রঙিন কামিজ। নক্শার মিস্ত্রী ভাল। ছাদ খিলানের কিছু জানে না কিন্তু। সে ছাদ খিলানে এই জনাব আলী শেখ

এখানকার ওই পুরানো কয়টা মন্দির-মসজিদের গম্বুজে খিলান ছাড়া তামাম ছাদে জনাবের কর্ণিকের দাগ আছে। ভূমিকম্পে সব ছাদে ফাট ধরেছিল, জনাব কতক তার তুলে ফেলে নতুন তৈরি করেছে। কতক—যে সব ফাট অল্প অল্প, সে সব বহুত হুঁশিয়ারির সঙ্গে মেরামত করে জোড় মিলিয়ে দিয়েছে। বেমালুম জমে ফের এক হয়ে গিয়েছে। বড় বড় সার্জন ডাক্তার ভাঙা হাড় কাটা অঙ্গ জুড়ে দেয়—এমন জুড়ে দেয় যে একটু দাগ ছাড়া কিচ্ছু বুঝতে পারা যায় না, তাও কাটা চামড়া সেলাই করলে তবে দাগটা থাকে, নইলে বেমালুম জুড়ে যায়। শুধু জুড়েই যায় না, ঠিক সহজ শরীরের মত জোরালো হয়। জনাবের ছাদ জোড়ার কেরামতিও ঠিক তেমনই। এক ফোঁটা জল পড়ে না আজও।

শ্যামাদাসবাবু ডাকলেন নীচে থেকে, জনাব।

বাবু।

ঝিনুক তা হলে কিনতে আরম্ভ করি? এনেছে আজ কজন।

হাঁ, হুজুর। উয়াতে আর কথা কি!

পঙ্ক-চুন তৈরি হবে। মন্দিরের একদম মাথার অংশটা পঙ্ক-চুনে পলেস্তারা হবে—মাজাই হবে। নেশা ধরেছে শ্যামাদাসবাবুর।

চার দেওয়ালের উপর 'পারা লেবেল' বসিয়ে দেখলে জনাব, মাঝখানে চার কোণায় বসিয়ে দেখে নিলে—ঠিক আছে, ঠিক মাঝখানটিতে মুক্তার দানার মত টলটল করছে পারা।

ঠিক হ্যায়, চালাও, হাত চালাও, হুঁশ করে রসিদ, হুঁশিয়ারি করে কাম করবি।

ইটের উপর কর্ণিকের ঘা পড়েছে খন-খন—খন-খন। চূড়ার কাটান যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে লোহার কড়ি বেরিয়ে নিচের দাওয়ার কিনারায় গোল থামের মাথায় বসেছে। বরগা পড়েছে, তার উপর হচ্ছে ছাদ। কামিনের দল তালে তালে কোপা পিটছে, বাজনা বাজছে যেন। জনাব ভারা বেয়ে নেমে গেল ছাদে। মাটির বড় জালায় মসলা-ভিজানো জল রয়েছে, জনাব নিজ হাতে মগে ভরে সেই জল ঢেলে দেয়। চালা দিদিরা—হাঁ। এক ঘা বেশি জোরে এক ঘা কম জোরে যেন না হয়। আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা!

যে দিকে বারান্দার ছাদ পিটছিল কামিনরা, তার বিপরীত দিকে গিয়ে জনাব দাঁড়াল। ডাকলে, ঠাকুরঝি, ইদিকে ভাই শুনতো একবার।

ঠাকুরঝি এখন প্রৌঢ়া—এককালে সে জনাবের পাশে থাকত, মতির এবং দাসীর মত। প্রৌঢ়া এসে দাঁড়াল।

নিম্নস্বরে জনাব বললে, মতিটার সঙ্গে রসিদটার কাণ্ডটা কি রকম বল দেখি?

ঠাকুরঝি একটু বিরক্তিভরেই বললে, মরণ, ওই আবার শুধাতে হয় না কি?

হুঁ। জনাব উঠে চলে গেল।

ঠাকুরঝি আপন মনে বললে, মরণ, বুড়ো বয়সে উ দিকে চোখ কেনে?

জনাব কাজে লাগল। হঠাৎ বললে, উঁহু, ই হচ্ছে না। মতি, তু নিচে ছাদের কাজে যা গো। এত উপরে ভারায় তু লারবি। হেই, রানী, তু উপরে উঠে আয় গো।

রানী মধ্যবয়সী মেয়ে। সে সন্ত এ পদ থেকে খারিজ হয়েছিল।

মন্দিরের গাঁথনি শেষ করে জনাব দাঁড়াল মাথায় কলস বসাবার শিকটা ধরে।

শ্যামাদাসবাবু নিচে দাঁড়িয়ে দেখলেন, জনাবকে দেখাচ্ছে ঠিক তাঁর মত খাটো মাথার মানুষ। খুশী হয়ে উঠল তাঁর মন। তবু মনটা খুঁত-খুঁত করে। অনেক টাকা বেশী খরচ হয়ে গেল—অনেক টাকা।

জনাব দেখছিল গ্রামের ঘরবাড়ি গাছপালার মাথার উপর দিয়ে তার নজর চলেছে—ওই নয়াগাঁ, ওই বামুনপাড়া, ওই দেবীপুর, ওই মাঠে চৌধুরীদীঘি, ওই নয়ানজুলির মাঠ, ওই নদী-কিনারের আঁকা-বাঁকা জঙ্গল, ওই সরকারী পাকা সড়ক লাল ফিতার মত চলে গিয়েছে—পুতুলের মত লোক চলেছে, গাড়ি চলেছে—বাহবা, বাহবা! বুড়ো বয়সের ছাতিও তার ফুলে উঠল।

এইবার পলেস্তারা, নক্‌শা, কার্নিশ, বিট, পাতলা ছুরির মত ধারালো মিহি কর্ণিকের কাজ। কাগজে পেন্সিল দিয়ে ছকে নিতে হবে নক্‌শা। সাদীর কনেকে যেমন টিপ দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজায়, তেমনই করে সাজাবার পালা।

ভারা থেকে সে নেমে এল। শ্যামাদাসবাবুকে সেলাম করে বললে, সেলাম হুজুর, দেখে লেন কাম! ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে এসে কাম দেখে লেন।

ঠাকুরঝিকে ডেকে বললে, শুন ইদিকে।

পকেট থেকে নীল কাগজে মোড়া দুটি সোনার কানের টাব তার হাতে দিয়ে বললে, মতিকে দিস। আর এই লে ভাই, তুর। একটি টাকাও তার হাতে দিলে।

মতিকে?

হঁ্যা। মন্দির শেষ হল। বকশিশ দিলাম লাতবউকে।

কি বলব?

আমি কিছু বুলব না। সি তার যা খুশি হয় করবে।

ঠাকুরবুঝি যেতে যেতে বললে, মরণ!

আজ মাসখানেক পরে জনাব সন্ধ্যায় হুঁকায় তামাক খেতে খেতে ভূতুড়ে বটগাছতলায় গিয়ে বসে। এখান থেকে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছে, বাবুদের চিলে-কোঠা দেখা যাচ্ছে, মাধববাবুর তেতালার ঘরের সারি দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল। ইমারতগুলো আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সাদা কিছু যেন নড়ছে জমিনের উপর। এগিয়ে আসছে।

*　　　*　　　*

পলেস্তারা চলছে। হঠাৎ সেদিন জনাব এল না। শ্যামাদাসবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কি হল?

রসিদ হেসে বললে, ভীমরথি হয়েছে বুড়ার হুজুর। খারাপ ব্যামো হয়েছে।

খারাপ ব্যামো? কি বিপদ! কি ব্যামো?

ওই কামিনগুলাকে নিয়ে মাতামাতি করে হুজুর এই বুড়া বয়সে।—হাসলে রসিদ।

রাম রাম রাম।

কিছু ভাববেন না বাবু, আমরা কাম ঠিক বাজিয়ে দোব আপনার।

এই ব্যাধি জনাবের ছিল—প্রথম হয়েছিল বর্ধমানে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ দেখা দেয়। আবার নতুন করেও হয়। জনাব যায় ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বলেন, কি জনাব? একটু হাসেন সঙ্গে সঙ্গে।

জনাব সকলের সামনেই বলে রোগের নাম। বলে কাজকাম হাতে রয়েছে, জলদি সারিয়ে দিতে হবে। টাকা ধরে দেয় ডাক্তারের টেবিলের উপর।

আগে ইন্‌জেক্‌শন ছিল না। এখন ইন্‌জেক্‌শন উঠেছে। জনাব সব হালহদিস জানে। সকাল থেকে কোন কিছু না খেয়ে খালি পেটেই এসেছে। সে তার মোটা মোটা শিরাওয়ালা হাত একখানা বাড়িয়ে দেয়, কনুয়ের ভাঁজের জায়গাটায় তাকিয়ে দেখে। ওইখানটার শিরাতেই ডাক্তার সূচ ফুটিয়ে দেবে। বহুৎ তারিফের হাত ডাক্তারবাবুর। পুট করে সূচটি ফুটিয়ে চালিয়ে দেবে শিরার মধ্যে। বহুৎ পাতলা হাত।

ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে একটু বসে সে চলে যায় বাড়ি।

অদ্ভুত বাড়ি জনাবের। মাটির দেওয়ালের ভাঙা ঘর। সামনে এক পাকা বারান্দা। গোল থাম, পাকা ছাদ, পাকা মেঝে। সেই বারান্দার উপর বিছানা পেতে সে শুয়ে পড়ে। ইন্‌জেক্‌শনের পর জ্বর আসবে। বাড়িতে কেউ নাই। হামিদনের মৃত্যুর পর সে আর নিকা করে নাই। ইচ্ছাই হয় নাই। কি করবে সে নিকা করে? রঙ্গু, সৈরভী, হায়তন, রোশনী, টগরী বউ, সত্য ঠাকুরঝি, জুবেদা, রানী সই, মতি নাতবউ, দাসী নাতনী—এদের নিয়ে দিন কাটছে তার, কি করবে সে নিকা করে? এক হামিদন এসেছিল তার জীবনে, সেও জানটাকে দিয়ে গেল গোনাহ্‌গারির মাশুল। আবার নিকা? নিকা করে সে মানুষকে কষ্ট দিয়ে কাজ কি? ওদের তো সে ছাড়তে পারবে না। সে জানে। অহরহ কাজকামের সময় যারা পাশে থাকে, হাতে হাত লাগে, চোখে চোখ রাখতে হয়, পায়ে ইট পড়লে 'আহা' বলে, যাদের চুল মুখে এসে পড়ে ঝুঁকে ইট-মসলা দেবার সময়, ভারার উপর কড়া রোদে মাথা ঘুরে গেলে যারা বাতাস দেয় আঁচল দিয়ে, তাদের উপর দিল্ না পড়ে উপায় কি। এমন কোন রাজমিস্ত্রী সে তো দেখলে না, যে এদের দিল্ না দিয়ে পারলে। তবু তারা বিয়ে করে। করুক, জনাব করে নাই।

সে জানে খোদাতালার দরবারে এটা তার গোনাহ্‌। তার এই পাপ—'জেনার' জন্য গোনাহের গোনাগারি তাকে দিতে হবে। দুনিয়ার

মানুষকে সে দেখছে। ভাল মানুষ আছে বইকি। এই দুনিয়ায় পয়গম্বর আছেন, ইমানদার মানুষ আছেন, তাই তো দুনিয়া আজও আছে। নইলে দুনিয়া ফেটে চৌচির হয়ে যেত মানুষের পাপে। ওরা বাদে বিলকুল মানুষ সুদ খাচ্ছে, ঘুষ নিচ্ছে, চুরি করছে, জেনা ব্যভিচার করছে। সে সুদ খায় না, ঘুষ নেয় না, চুরি করে না। দস্তুরী অবশ্য নিয়ে থাকে, সে মালিকে জানে—ঘুষ আর চুরি জানিয়ে করা হয় না। দস্তুরী দস্তুরী—সে তার পাওনা। সেও তার গোনাহ্ নয়। এক গোনাহ্ এই। সেই পাপের ভার আর বিয়ে করে সে বাড়াতে চায় না। স্ত্রী বর্তমানে এই অন্যায় আরও গোনাহ্।

সে বলে, আল্লাহ্ তায়লা—খোদাতায়লা—মহম্মদ রসুল আল্লাহ্! আমার এই গোনাহ্ টুকু মাপ কিয়া যায় হজরত।

অনেকক্ষণ পর সে আবার বলে, যদি গোনাহ্ গারি দিতে হয়, মাফ যদি নাই কর, সাজা দিয়ো তুমি।

জ্বরের ঘোর কমে আসে; জনাব উঠে বসে। দুটো ইন্‌জেক্‌শনেই জনাব তাজা হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে রোগের লক্ষণ আর কিছু নাই। বাবরী চুল আঁচড়ে গামছায় মুখ মুছে গায়ে ফতুয়া দিয়ে চটি পায়ে সে এসে দাঁড়াল মন্দিরের কাছে।

বুড়ো হয়েছে জনাব। রাগ যেন চট করে হয়ে যায়। রসিদকে সে সজোরে এক চড় মেরে বসল। বেইমান কোথাকার! শয়তান কোথাকার!

রসিদ হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর রুখে উঠল।

জনাব গর্জে উঠল, চিল্লাস না। ইখানে চিল্লাস না। গর্দানা ধরে নিকাল দিব। ইখানে চিল্লাস না। তুর বাপ সুদি কারবার করে, আমি টাকা ধারি না; তুর বাপের অনেক জমিন আছে—আমি কৃষাণ নই। তু ওই মতির সর্বনাশ করেছিস, নিজের বেমার উকে দিছিস। তুর নিজের জোয়ানি বয়েস, বেমার ধরিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিস না। তোবা, তোবা! হারামী—হারামী তুই! নিকাল হামরা হিঁয়াসে!

রসিদ তার যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে গেল।

জনাব মতির কাছে এসে দাঁড়াল। মতি ভয়ে কাঁপছিল। জনাব একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে, যা, তুকে আর কিছু বলব না। তুদের জাতটাই এমনি।

ছুটির সময় বললে, ডাক্তারকে আমি বুলে রেখেছি। ষাস। ডাক্তার ফুঁড়ে ওষুধ দিয়ে দেবে! জ্বর আসবে, ইথানে শুয়ে থাকবি। ছুটি হলে বাড়ি যাবি। এই কাঁচা বয়সে এখন থেকে ঘুন ধরাস না শরীলে।

আবদুল বললে যাবার সময়, রসিদকে মেরে ভাল কর নাই ওস্তাদ। ওর বাপ—

জনাব হা-হা-করে হাসলে।—কি করবে আমার?

রসিদ এবং রসিদের বাপ কিছু করতে পারত কি না ঠিক পরখ হল না। মাস দুয়েকের মধ্যে মন্দির শেষ হতেই জনাব চলে গেল এখান থেকে।

এ জেলার পাশেই জেলা সাঁওতাল পরগণা, সেখানে সাহেবান পাদরী বাবালোক বড় আড্ডা করেছে। সাঁওতালদের কেরেস্তান ধর্ম দিয়েছে। লেংটির বদলে পাতলুন পরেছে, মেয়েরা ঘাঘরা পরে, বাবুলোকের মেয়েদের মত ভাল ভাল শাড়ি পরে, জুতা পরে, জামা পরে, খোপা বাঁধে, লেখাপড়া শেখে। সেখানে এক বড় ভারী গির্জা হবে। বড় বড় খিলান, বহুৎ উঁচু চূড়া হবে, চাঁপার কলির মত গড়নের গোল চূড়া ক্রমশ সরু হয়ে উঠে মিলে যাবে স্থচালো হয়ে! খিলান—গোল খিলান নয়—ঠিক ইস্কাপনের মাথার মত না হলেও ঐ ধরনের মাথাটা হবে—একটি বাহারের কোণ তৈরি করে মিলবে।

জনাবকে খবর দিয়েছে তারই এক জানা ঠিকাদার! জনাবের খিলানের পাকা হাত সে জানে।

মতিবালা খবরটা শুনে কাঁদলে।

জনাব বললে, যাবি আমার সঙ্গে?

মতি চুপ করে রইল। সে পারবে না।

জনাব নিজেই বললে, নাঃ। যেয়ে কাজ নেই তোর। ঘর থেকে পা বার করলে তোরা আর থামবি না। ভাগবি আমাকে ফেলে কারুর সঙ্গে। তা ছাড়া মরেই যদি যাই আমি তো তোর কি হবে?

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, আমি রসিদকে বলে যাব। ওই তোকে দেখবে, বুঝলি। হেসে আবারও বললে, আমি জানি তুর মনের আসল টানটা রসিদের উপর।

রসিদকে ডেকে বললে, গোসা রাখিস না ভাই। আমি চললাম। দেখিস, তু মতিকে দেখিস, মেয়েটা ভাল।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে একবার সে দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখলে। ওই মন্দির—মন্দিরের উপরে পঙ্কের পালিশ বকের পালকের মত ঝলমল করছে, মাথার উপর পিতলের কলস ঝকমক করছে। ওই মসজিদের দক্ষিণ দিকের মিনার।

আবার সে ফিরল। সাঁওতাল পরগনায় লালমাটির টিলা, সেই টিলার উপর সাহেবানদের গির্জা হবে। চাঁপার কলির মত ডোল ক্রমশ সরু স্থচালো হয়ে উঠবে গির্জার চূড়া।

*　　　　*　　　　*

শ্যামাদাসবাবুর মন্দির এবং জনাব নিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। কিন্তু জনাবের কথা শেষ হয় নাই। সামান্য কয়েকটা কথা।

তিন বৎসর পর। জনাবের শেষ দশা। হয়তো আট-দশটা দিন কি দু-একটা মাস কিংবা মাত্র কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে। সাঁওতাল পরগনা থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে সে ফিরে এসেছে। অনেক ব্যাধি তার মধ্যে পেটের অসুখটাই প্রধান। জীর্ণ শরীর, দেখলে চেনা যায় না, বাবরী চুল আছে, কিন্তু তার অধিকাংশই উঠে গিয়েছে। নাকের হাড়টা খাঁড়ার মত উঁচু হয়ে উঠেছে; মোটা হাড়গুলি সার হয়েছে, হাতের আঙুল ঠকঠক করে কাঁপে। জনাব তবু সেই জনাব। ফিরে এল, সঙ্গে এক ওখানকার সাঁওতাল মেয়ে। বোধ হয় কেরেস্তান। ঘাঘরা না পরলেও বেশ কায়দা করে কাপড় পরে, চুল বাঁধে চমৎকার ছাঁদে। সাধারণ সাঁওতাল-মেয়ের মত নয়। পুরানো লোকে বললে, তাজ্জব! একেবারে সেই রঙ্গুর মত দেখতে।

মাসখানেক পর সে দিন জনাব বসে ছিল সেই বুড়ো বটতলায়।

তার বাড়ি তিন বৎসর না ছাওয়ানোতে ভেঙে পড়ারই কথা। কিন্তু একেবারে ভেঙে সেখানে নতুন ঘর হয়েছে। জমিদারের বাকি খাজনার নালিশের নীলামে রসিদ আলির বাপ সেটা কিনে পুরানো ঘর ভেঙে নতুন ঘর তুলেছে। রসিদ এখন ঠিকাদারি শুরু করেছে; তার চুন, সিমেণ্ট আরও মালপত্র সেখানে থাকে। মতিবালা সেখানে বাঁধা কামিন এখন।

জনাব প্রথম দুটো দিন আবদুলের বাড়ির দাওয়াতে ছিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রে দাওয়ার আশেপাশে লোক ঘুরতে দেখলে জনাব। সাঁওতাল-মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। জনাব তাকে আগলে জেগে বসে রইল। সকালে উঠে বাজারের ভিতরে গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করলে। হাজার হলেও বাজার, এখান থেকে একটা মানুষকে জোর করে তুলে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। জোরের কিন্তু দরকার হল না; দিন বিশেক পরে মেয়েটাই চলে গেল—রসিদের আড়তে নয়, তার বাড়িতে—রসিদ তাকে কলমা পরিয়ে নিকা করবে।

জনাব আবদুলকে বললে, দুটো করে রান্না-ভাত আমাকে দিবি? পয়সা আমি দোব।

আবদুল বললে, তুমি ওস্তাদ। তুমার কাছে কাম শিখেছি। এ আমার ভাগ্যি। তুমি এইখানেই থাক। তবে পয়সা আমি লিব না।

খুশী হল জনাব। আল্লাহ্‌তায়লার দুনিয়া রসুলে আল্লা হজরত মহম্মদ এসে দিয়ে গেলেন; কোরান সরিফ, এসব কি বরবাদ হতে পারে? ইমানদার মানুষ আছে বইকি। সে বললে, বেশ, তবে আমি মরে গেলে নিবি। আমাকে ওই বটতলায় একটা ছোট ঘর—চালাঘর বানিয়ে দে। ওখানেই আমি থাকব।

সে কি?

হাঁ। চোখের উপর আমি দেখতে পারব না আবদুল। তার চেয়ে নিরালায় বেশ থাকব আমি।

সে কিছুতেই তার গোঁ ছাড়লে না।

একটা চালাঘর।

সামনে কতকগুলা ইট। জনাব বলে, মেঝেটা বাঁধিয়ে নেব। তারই কতকগুলা সে বিছিয়ে নিয়েছে বটতলায়, সেইখানেই বসে থাকে।

আষাঢ় মাস। ঘনঘটায় মেঘ করে এসেছে, আকাশ যেন ভেঙে পড়বে। বৃষ্টি আসবে। জনাব উঠতে চেষ্টা করলে, পারলে না। আবার সে বসল। ওই চালাঘরে গিয়েই বা কি হবে, এ জল আটকাবে না। জোর হাওয়া দিলে হয়তো ভেঙে চাপাই দেবে। আবদুলের দাওয়াতে গেলেই বা কি হত? ঝাপটায় ভিজতে হত। নিজের ঘর থাকলেও

ভাঙা চাল—দেওয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়ে জল আসত। এ নয় তার চেয়ে কিছু বেশি।

ঘন কালো মেঘ। কালো রঙ মিশানো সিমেণ্ট করা মেঝের মত বাহার খুলেছে। বাহবা! বাহবা! ও কি, মন্দিরটা নয়? কালো আকাশের গায়ে সোনার বরন কলস—কয়েকটা দানাবাঁধা বিজলীর মত ঝকমক করছে, তার নিচে পঙ্কের পলেস্তারা করা দুধ-বরন মন্দিরের মাথা। আহা-হা! চোখ ফেরালে সে। আকাশ-জোড়া কালো মেঘের পালিশের গায়ে হলুদ-বরন ঘরে মাধববাবুর তেতালার ঘরের সারি। সোনার বরন বহুড়ীরা জানলা ধরে দাঁড়িয়ে মেঘ দেখছে। নিচের তলায় বৈঠকখানা ঘরে বাবুরা মজলিশ করে বসে গরম চা খাচ্ছে। বাচ্চারা সব বারান্দায় ছুটাছুটি করছে। তার হাতে গড়া—তার হাতে গড়া ছাদ। কোন ভয় নাই, যত জোর আসুক বৃষ্টি, এক ফোঁটা গলে পড়বে না। আনন্দ রহো, আরাম করো। আরও একটু দৃষ্টি ফিরিয়েই—ওই আর এক টুকরো দালান! কার চিলে-কোঠা—কালো মেঘের গায়ে ভাসা বাড়ির মত মনে হচ্ছে? কবুতরেরা, কাকেরা, পেঁচারা আলসের নিচের খোপে খোপে গিয়ে ঢুকেছে; গলা ফুলিয়ে চুপ করে সব বসে আছে। এ খোপ রাজমিস্ত্রীরাই রাখে। থাকুন সুখে আরামে মৌজ করে মালিকরা ঘরের অন্দরে, পাখিরা থাকবে খোপরে খোপরে। থাক্, তোরা আরামসে থাক্। খোদাতায়লার কাছে কলকল করে বলিস—জনাব আলির জেনার গোনাহ্ যেন মাফ করেন। আর গোনাহ্ তার নাই। আবার দৃষ্টি ফেরালে সে, এদিকে কোন কিছু দেখা যায় না। শুধু মেঘ—শুধু মেঘ। বাহা রে! চমৎকার মেঘ তো এ দিকটার! সাদায় কালোয় যেন ভাঙা-গড়া চলছে লহমায় লহমায়। ওই দিকটা দিয়েই সে সাঁওতাল পরগনা গিয়েছিল। বাঃ, সাদা মেঘ ঠিক যেন গির্জার চূড়া হয়ে উঠেছে। চাঁপার কলির মত গোল মিনার ক্রমশ সরু সুচালো হয়ে মিশে গিয়েছে। দুনিয়ার সব দুঃখ সে ভুলে গেল। দৃষ্টি ফেরালে সে আবার।

আঃ, ওই যে মসজিদ—ওই যে তার হাতে গড়া মিনার!

ঝপছপ করে বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকালে মাথার উপরে—বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদাতালার নিজের হাতে গড়া ইমারত।

সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এইটুকু ছাড়া।

কামধেনু

ওহি যে আঁতঠো, উঠো গোরুকা হ্যায়, না ?—ফাঁসির আসামী নাথু প্রশ্ন করলে ওয়ার্ডারকে। বাঙালী পটুয়ার ছেলে নাথুর হিন্দী এর চেয়ে আর কত ভাল হবে ?

কেয়া ?—বিস্ময়ে এবং তীব্র বিরক্তিতে দোবেজী ওয়ার্ডারের মুখের ভাব অদ্ভুত হয়ে উঠল। 'গোরুকা আঁত' অর্থাৎ গোরুর অন্ত্র কথাটা শোনবা মাত্র তার অন্তর থেকে দেহের সর্বাঙ্গ যেন অস্পৃশ্য বস্তুর ছোঁয়াচ অনুভব করলে।

নাথু কিন্তু গ্রাহ্য করলে না। ফাঁসির আসামী ওয়ার্ডারের বিরক্তিকে গ্রাহ্য করবে কেন ? ওয়ার্ডার তাকে সেলে পুরে লোহার গরাদে দেওয়া দরজাটা বন্ধ করছিল। ভিতরের দিকে গরাদে ধরে নাথু ওয়ার্ডারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে, ওহি যো—যেঠো হামারা গলায় পরায়কে ঝুলায় দেগা, উঠো তো আঁত হ্যায়, তা উঠো গোরুকে আঁত হ্যায়, না, আর কিছুকা হ্যায় ?

অর্থাৎ ফাঁসির আসামীর গলায় যে দড়িটা পরিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়—নাথুর ধারণা, সেটা কোন জানোয়ারের অন্ত্র থেকে তৈরী। তার প্রশ্ন হল—সে অন্ত্রটা গোরুর অথবা অন্য কোন জানোয়ারের ? দোবে দীর্ঘ দিন বাংলার জেলখানার ওয়ার্ডারের কাজ করছে, এ ধরনের উদ্ভট হিন্দী বুঝতে সে অনায়াসেই পারে।

দোবেজী মুখ ঘুরিয়ে বার কয়েক থুথু ফেলে বললে, আরে না না, আঁত-টাঁত না আছে রে। ডুরি—ডুরি আছে। বহুত ফাইন ডুরি—মোম—

বাধা দিয়ে নাথু বললে, ডুরি ? দড়ি ? এই দড়ি ?

হাঁ, হাঁ, দড়ি—দড়ি। নাথুর মুখের দিকে চেয়ে সে থেমে গেল।

দুটো গরাদে শীর্ণ হাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে নাথু আকাশের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে

উঠেছে, মুখের দু পাশের চোয়ালের হাড় দুটো অসম্ভব রকমের উঁচু হয়ে উঠেছে, স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, জীর্ণ শরীরের সকল শক্তি প্রয়োগ করে সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে।

দোবে প্রবীণ লোক। ফাঁসির আসামীদের সম্পর্কে বহু বিচিত্র গল্প সে শুনেছে; নিজেও চোখে দেখেছে—এগারোটা ফাঁসির আসামী, নাথুকে নিয়ে হবে বারোটা। এগারোটার অভিজ্ঞতাই তার যথেষ্ট, অর্থাৎ নাথু সম্বন্ধে আর তার কোনও কৌতূহল নাই।

দরজায় তালা লাগিয়ে বার কয়েক ঝাঁকি দিয়ে টেনে দেখে নাল-মারা জুতোর শব্দ তুলে সে চলে গেল।

* * *

ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পাটাতনের নীচে অন্ধকার গর্তের মধ্যে শরীরের সকল স্নায়বিক আক্ষেপ শেষ হয়ে গেলে নাথুর দেহ স্থির হয়ে যাবে, চোখে দৃষ্টি থাকবে না, আরও বিকৃতি হবে অনেক। সে দৃশ্য চোখে না দেখাই ভাল। কিন্তু এই মুহূর্তে মন-হীন অথচ জীবন্ত নাথুর চেহারা দেখে শিল্পীর লোভ হবে ছবি আঁকতে। যোগপন্থী সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে ভাববে, খুনী লোকটা পেলে কোন্ পুণ্যে এই বস্তু! নাথুর দেহ থেকে মন বেরিয়ে চলে গিয়েছে। বাইরের প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে মনোলোকের গভীরে অন্ধকার অবচেতনে প্রবেশ করেছে—এ কথা বললে তর্ক তুলব না; কিন্তু সবিনয়ে বলব, আমার বিশ্বাস সেলের মধ্যে আবদ্ধ নাথুর মন ইঠ কাঠ লোহার স্থূল কঠিন নিশ্ছিদ্র অবস্থানকে অতিক্রম করে লাল মাটির পাকা সড়ক ধরে চলে যাচ্ছে—এ আমি দেখতে পাচ্ছি।

লাল মাটির সড়কের দু পাশে ঘন সারিবদ্ধ গাছ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় গ্রাম, বাজার, পাকাবাড়ি—দালান কোঠা, গ্রাম শেষে আছে মাঠ; মাঠের বুক চিরে মেটে রাস্তা, তেমনই একটি মেটে রাস্তা ধরে চলেছে তার মন। মেটে রাস্তার আশেপাশে ছোট ছোট গ্রাম, খড়ো বাড়ি, বাঁশবন ডোবা, আম-কাঁঠাল-শিরীষগাছের বাগান ঘেরা মরা দীঘি, মধ্যে মধ্যে আকাশ-ছোঁয়া অশ্বত্থগাছ, বিরাট ছাতার মত বটগাছ, সারিবন্দী তালগাছ, পোড়ো ভিটাতে খেজুরগাছ, বড় বড় গাছের তলায় চাপ বেঁধে বাবুরি, মানে—বনতুলসীর জঙ্গল, নয়নতারা ফুলের গাছ, কালুকাঁটার বন,

ম্যালেরিয়া-গাছের জঙ্গল চলে গিয়েছে গ্রামের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত। মধ্যে বড় বড় গাছগুলোর এক-একটার মাথায় আলোক-লতা, তলায় ছোট গাছের জঙ্গলের মধ্যে লতিয়ে বেড়ায় বিছিতিলতা। এ সব হল চাষী-সদ্‌গোপের গ্রাম। সে গ্রাম পার হয়ে ওই মেটে পথ থেকে মন তার পথ ধরে—আঁকা-বাঁকা আলপথে-পথে। মাঠের মধ্যে, ছোট একটা 'কাঁদর' অর্থাৎ ছোট গেঁয়ো নদী বা বড় নালা; সে নালার দু-ধারে ঘন অর্জুনগাছের জঙ্গল; নালার উপরে বাঁশের সাঁকো। সে সাঁকো পেরিয়ে ছোট একখানি গ্রাম, কুড়ি-পঁচিশ ঘর পটুয়ার বাস। লোকে সকালে 'দুর্গা দুর্গা' 'হরি হরি' বলে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে মুখে হাতে জল দিয়ে আল্লাতায়লাকে ডাকে, রসুল আল্লাকে স্মরণ করে। কেউ গৌরাঙ্গের নাম নিয়ে খঞ্জনি-পট নিয়ে গ্রামান্তরে বার হয়, কেউ শুধু খঞ্জনি নিয়ে শিবদুর্গার নাম নিয়ে বার হয়, কেউ গো-মাতা সুরভির নাম নিয়ে বার হয়।

"সুরভিমঙ্গল গান গোধন-মহিমা
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে দিতে নারে সীমা।
লোমকূপে কূপে মায়ের দেবতারই বাস
যে সেবে গো-মাতা তার পুরে সর্ব আশ।"

তালে তালে হাতের মন্দিরা বাজে ঠুন-ঠুন ঠুনু-নুন; ঠুন-ঠুন ঠুনু-নুন; ঠুন-ঠুন ঠুনু-নুন; ঠুনু-ঠুনু ঠুনু-নুন।

নবলক্ষ গাভীর পাল ছিল এক গৃহস্থের। ঘরের কত্তাবুড়ো সকালে গোয়ালের দরজায় প্রণাম করে দরজা খুলত। বড় বউ করত গোয়াল পরিষ্কার। বড় ছেলে দিত খেতে। মেজ ছেলে দুইত দুধ। ছোট ছেলে নিয়ে যেত মাঠে। নবলক্ষ গাভী খুঁটে খুঁটে কচি ঘাস খেত, সে চারিদিকে পাহারা দিয়ে ফিরত; কোথায় আসছে সাপ, কোথায় উঁকি মারছে হুড়ার। তার হাতে থাকত লাঠি, কোমরে গোঁজা থাকত বাঁশি। সন্ধ্যায় নবলক্ষ গাভী এসে দাঁড়াত গোয়ালের সামনে। এবার সেবার পালা পড়ত বাড়ির বুড়ী-গিন্নীর—ছেলেদের মায়ের; প্রতিটি গাইয়ের ক্ষুরে জল দিত, শিঙে তেল দিত, কপালে দিত হলুদ আর সিঁদুর। তাদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে মা-সুরভি পাঠিয়ে দিলেন নিজের মেয়ে নন্দিনীর এক মেয়েকে। 'কামধেনু'।

দেখলেই মনে হয়, আশ্বিন মাসের আকাশের সাদা মেঘের মত নরম আর সাদা ওই বকনা বাছুরটি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়; গায়ে হাত দিলে মনে হয়, কোন কচি দেবকন্যার অঙ্গে বা হাত পড়ল। হাতের নীচে কামধেনুর অঙ্গখানি শিউরে শিউরে ওঠে; পায়ের ক্ষুর পরিষ্কার করতে বসলে মাথার চুল টেনে আশীর্বাদ করে, ঘামে-ভরা পিঠ চেটে আদর করে। সাধারণ গোরু পিঠ চাটে ঘামের নোনতা আস্বাদের জন্য; কামধেনুর সম্পর্কে ও কথা বলা চলে না। নইলে সে যখন যুবতী হয়ে ওঠে, সর্বাঙ্গ ভরে ওঠে পুষ্টিতে, চিকনতর লোমে, গলার গলকম্বল প্রশস্ত হয়ে ঝুলে পড়ে, মন মোহিত করে দুলতে থাকে, পিছন দিকটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠে থমকে থমকে চলে অথচ সন্তান প্রসবের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। গৃহস্থ যখন বন্ধ্যা গাই বলে বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন একদিন বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে কামধেনুর মহিমা প্রকাশ পায়। সন্তান প্রসব করে না, অথচ প্রবালের মত রক্তিম আভায় এবং এক রাশি পদ্মফুলের মত পেলবতায় অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে তার স্তনভাণ্ড স্ফীত হয়ে ওঠে, পাকা বিল্বফলের মত পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে স্তনবৃন্তগুলি; প্রথমে বিন্দু বিন্দু দুধ দেখা দেয় স্তনবৃন্তের মুখে; তারপর ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে মাটিতে, কামধেনু সাড়া দেয়, ডাকতে থাকে; যেমন সন্তানবতী গাভীর স্তনে দুধ জমে উঠলে সে সন্তানকে ডাকে তেমনই ভাবে ডাকে কামধেনু, ডাকে গৃহস্থকে, বলে—আমার সুধায় তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটুক, তোর সন্তান দুধে-ভাতে থাকুক, নে, পাত্র এনে আমার সুধা সংগ্রহ করে নে। এতেও যদি গৃহস্থ বুঝতে না পারে, তবে কামধেনু তখন বসে পড়ে; স্তনের উপর দেহের চাপ দিয়ে অনর্গল সুধা ক্ষরিত করে দেখিয়ে দেয়।

বহু পুরুষের পুণ্যফল, বহু জন্মের সৎকর্মের সৌভাগ্য। পটুয়ার ঘরে কামধেনু একদিন ঠিক এই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন। পুরুষানুক্রমে তারা 'সুরভিমঙ্গল' গান গেয়ে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে গো-মাতার মহিমা প্রচার করে আসছে; কত পুরুষ তার সঠিক হিসেব নাই, তবে বাপের বাপ কর্তাবাপকে বুড়ো অবস্থাতেও দেখেছিল নাথু, তারই কাছে তার গানশিক্ষার হাতেখড়ি; বাপের সঙ্গে একসঙ্গে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, তার গলার সঙ্গে মিলিয়ে গান করেছে; নিজেও এই

গান গাইছে। বহু পুরুষের সেবার পুণ্যফলের হিসেব, জমা-খরচের মত ওর প্রমাণ-প্রয়োগ লাগে না, কিন্তু জন্মের বহু সৎকর্মের ভাগ্যের কোন লিখিত-পঠিত দলিল নাই। আর গাছের চারা দেখে যেমন মাটির তলার অদেখা বীজটির আকার প্রকার গুণাগুণ অনুমান করতে কষ্ট হয় না, তেমনই ধারায় কামধেনুর আবির্ভাবে পূর্বজন্মের সুকৃতিকে সহজেই মেনে নিয়েছিল নাথু। এ জন্মের পুণ্যও আছে! নইলে এই বৃদ্ধ বয়সে এ ভাগ্য হল কি করে?

নিজেদের ঘরের গাইয়ের বাছুর। সাদা ধবধবে রঙ; অত্যন্ত শান্ত, বাড়ির লোকের গা চেটে চেটে পাশে পাশে ফিরত। সে যখন বড় হয়ে সন্তান প্রসব করলে না, তখন সকলে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সেই সময় ঘটল এই ঘটনা। পটুয়া-পাড়ার সকলে ভিড় করে দেখতে এল। শুধু পটুয়াপাড়া নয়, গ্রাম-গ্রামান্তরের চাষী-সদগোপেরা এল, গোয়ালপাড়ার ঘোষেরা এল, বিপ্রচক্র গ্রামের ভটচাজ এলেন। সকলে একবাক্যে স্বীকার করে গেল, হ্যাঁ, নাথুর পূর্বপুরুষের সেবা আর নাথুর জন্ম-জন্মান্তরের সৎকর্মে তিলার্ধ সন্দেহের অবকাশ নাই। এবং এতেও কোন সংশয় নাই যে, এইবার নাথুর সংসার ধনে-ধান্যে সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

নাথুও তাতে সন্দেহ করলে না—সে আশা করেই বসে রইল। তার লক্ষণও যেন দেখা দিল। কামধেনুর দুধের জন্য লোক আসতে আরম্ভ করলে। আগে দেশে ছিল এক আনা সের দুধ – টাকায় ষোল সের; এখন আক্রাগণ্ডার বছরে টাকায় আট সের—এক সের দুধের দু আনা দাম। নাথু কামধেনুর দাম স্থির করলে চার আনা সের। লোকে আপত্তি করলে না। এই আপত্তি না করাটাই তার কাছে সৌভাগ্য সমাগমের প্রথম লক্ষণ বলে মনে হল। কিন্তু কামধেনু সমস্ত দিনে দুধ দেয় এক সের, প্রচুর সেবা করেও পাঁচ পোয়ার বেশি দুধ উঠল না। তখন চার আনাকে সে তুললে আট আনায়। লোকে তাতেও আপত্তি করলে না। দৈনিক দশ আনা পয়সা কামধেনুর আশীর্বাদ। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে আরও উপার্জন হয় আকস্মিকভাবে। নাথু যায় ভিক্ষায়। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, এক হাতে মন্দিরা, এক হাতে সরু বাঁশের তেলে-পাকানো লাল রঙের দেড় হাত লম্বা লাঠি, মাথায়

গামছার পাগড়ি, গায়ে ঢিলেঢোলা বেমানান রকমের একটা ভিক্ষেয়-পাওয়া জামা।

সুরভিমঙ্গল গান করে ভিক্ষে পায় চাল। গো-চিকিৎসা করে পায় দুআনা-চার আনা বকশিশ। কোথাও কারও বাড়িতে গোরুর অসুখের কথা শুনলে নিজেই গিয়ে উপস্থিত হয়। এই নিয়ম, এই ওস্তাদের আজ্ঞা, পিতৃপুরুষের এই আচার। অবোলা জীব, তার জন্যে ডাকবে কে? সাক্ষাৎ ভগবতী, তার সেবার জন্যে আহ্বানের প্রয়োজন আছে নাকি?

প্রথমেই গোরুর গায়ে হাত দেয়। স্পর্শ মাত্র শরীরে তার শিহরণ খেলে যায় কি না পরীক্ষা করে। তারপর জিভ দেখে, মাড়ি দেখে, ঘা দেখা দিয়েছে কি না পরীক্ষা করে। কানের ডগা মুঠোয় চেপে ধরে পরীক্ষা করে। পায়ের ক্ষুর দেখে।

তারপর ভিক্ষার ঝুলির ভিতর থেকে বার করে ছোট একটি ঝুলি। হরেক রকম শিকড় জড়িবুটির মধ্য থেকে বেছে ওষুধ দেয়!

বাদ্‌লার অর্থাৎ জ্বরের ওষুধ, ঘুঁটকের ওষুধ, ঘুঁড়িয়ার ওষুধ। 'গুটি' অর্থাৎ বসন্ত হলে মুগ স্নান করে বলে, মা-শীতলার পূজা করান মা, পুষ্প বেঁধে দিন গোয়ালের চালের বাতায়, চরণামেত্ত খাইয়ে দেন সব মা-ভগবতীকে। মায়ের রোষ, এর আর ওষুধ কোথা বলুন?

ওষুধের দাম জিজ্ঞাসা করলে জিভ কেটে বলে, ও কথা বলবেন না, ওষুধের দাম নিতে নাই। তারপর হেসে বলে, দামই বা কি বলেন? নদীর ধারে খোদাতায়ালা শ্রীহরি করেছে গাছের 'সির্‌জন', তারই শিকড় আর পাতা। কতক তো আবার ঘরের পাঁদাড়ে, তুলে নিয়ে আসি। বড়িগুলান বানাতে এক পয়সার গোলমরিচ, কি আনা-টাকের সিদ্ধি, কি দুপয়সার অন্য কিছু লাগে; তা গেরস্তর দুয়ারে গোধনমঙ্গল গান করে তো ভিক্ষে পাই। পেট ভরেও তো দু-চার আনা বাঁচে মাসে। তবে—

হাত দুটি জোর করে বলে, তবে যদি বকশিশ করেন, দু হাত পেতে নোব, নাম করতে করতে বাড়ি যাব।

কি বকশিশ নেবে বল? কি হলে খুশী হও?

গেরস্তের হাত ঝাড়লে তাই আমাদের কাছে পর্বত। যা দেবেন তাতেই খুশী। না-দেবেন তাতেও খুশী। গোমাতার সেবা করলাম,

সেই পুণ্যিতে পারে যাব, আমার ছেলেপুলে ভাল থাকবে—মা-সুরভির আশীর্বাদে।

ছেলেপুলে নাই নাথুর, তবু ওই কথাগুলি গড়গড় করে বলে যায়, পিতৃপুরুষের কথা, নিজের ছেলেপুলে নাই বলে কি সে কথার খানিকটা বাদ দিয়ে অঙ্গহীন করতে পারে?

এক এক গৃহস্থ-বাড়িতে—বিশেষ করে ভদ্র গ্রামের গৃহস্থ-বাড়িতে—গোরুর ব্যাধি লেগেই থাকে। তাদের বলে, আপনারা বাবুলোক—সদ্‌জাতি, গোরুর সেবা আপনাদের রাখালের হাতে। মা-ভগবতী অবহেলা সইতে লারেন বাবু। ভাল করে যত্ন লিবেন। নিজে হাতে সেবা না করেন, নিজে দাঁড়িয়ে চোখে দেখবেন হুজুর।

দেখি তো বাপু। নিজে দু-বেলাই দাঁড়িয়ে দেখি।

তবে?—চিন্তিত হয় নাথু। চিন্তা করে বলে, তবে গোয়ালের দোষ হয়ে থাকবে?

বাড়ির প্রৌঢ়া গৃহিণী—গৃহস্বামীর মা এবার এগিয়ে আসেন। বলেন, দোষ হয়েছে কিনা তুমি বলতে পার?

জানি বইকি মা। এ যে আমার পিত্তি-পুরুষের কুলকরম। গুনে বলতে পারি।

আমার চল্লিশটা গোরু। বড় বড় বলদ। দেড়শো-দুশো এক-একটার দাম।

আহা, মা, তুমি ভাগ্যবতী!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রৌঢ়া বলেন, সে সব তো পুরনো কথা বাবা। আজ পাঁচটিতে ঠেকেছে।

নাথুর মাথা ঘন ঘন নড়তে থাকে সমবেদনায়, আক্ষেপে,—আহা-হা, আহা-হা! আহা-হা মা! সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের পিছনে জিভ টেনে টেনে আক্ষেপব্যঞ্জক শব্দ তোলে—চুক্ চুক্ চুক্ চুক্।

একটা একটা রোগ হচ্ছে—মরছে। রোগ হলে ভালও তো হয়; কিন্তু আমার ঘরে রোগ হলে গোরু বাঁচে না।

আহা মা!—প্রৌঢ় নাথু হলুদ চোখ তুলে তাকায় প্রৌঢ়ার দিকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

দুধোল গাই একটা সেদিন আমার ধড়ফড় করে মরে গেল। দেখ তো গুনে—গোয়ালের কি দোষ হল ?

গোয়ালের আঙিনায় চলেন মা।

গোয়ালের আঙিনায় বসে ভিক্ষার ঝুলি থেকে বার করে লাল খেরুয়ার তৈরী ছোট থলিটা। থলিটি খুলে বার করে এক টুকরো খড়ি। হাত দিয়ে সামনের খানিকটা জায়গার ধুলো পরিষ্কার করে নেয়, তারপর বার বার ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে সরিয়ে দেয়, তারপর নিজের মাথার গামছা নিয়ে খুঁট দিয়ে পরিষ্কার করে। পরিষ্কার জায়গাটার উপর খড়ি দিয়ে তিনটি সমান্তরাল রেখা টানে। তার সামনে নিজের বাঁ হাত পেতে বিড়বিড় করে কত কিছু বলে যায়। বিড়বিড়-মন্ত্র শেষ করে বেশ চীৎকার করে বলে, দোহাই মা কাউরের কামিক্ষে! দোহাই তেত্রিশ কোটি দেবতার! দোহাই রসুলে আল্লার! দোহাই মুনি ঋষির! দোহাই পীর গাজীর!—

"যদি কিছু থাকে বলিস।
না যদি হয় তো ডাইনে বাঁয়ে চলিস।"

হাত তার চলতে থাকে মাটির উপরে। ডাইনে যায় না, বাঁয়ে যায় না—সমান্তরালরেখা তিনটির মাঝখানে গিয়ে থেমে যেন চেপে বসে যায়।

নাথু মুখ তুলে প্রৌঢ়ার দিকে চেয়ে বলে, আছে মা, দোষ আছে।

কি দোষ ?

চুপ করে থাকে নাথু।

কি দোষ, বল ?

চোখ বুজে নাথু বলে, বহুকালের পুরনো গোয়াল মা আপনার, অনেক গোরুর রোগের বিষ জমে আছে মা, অনেক কালের গোবর-চোনা জমে আছে। তা ছাড়া, মানুষেও দোষ করে—মদ এনে লুকিয়ে রাখে ; মাংস এনে খায়। অভয় দেন তো বলি মা—ব্যভিচার হয় বলেও সন্দ হয় মা।

অভিযোগের কোনটাই অসম্ভব নয়। গোবর-চোনা সত্যিই জমে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। আগে কৃষাণেরা চাষের আগে গোয়ালের মাটি কেটে তুলে নিত, সার হিসেবে ব্যবহার করত জমিতে, আজকাল

সে কষ্ট তারা করে না। বাউরী ডোম রাখাল মাহিন্দারে বাবুদের গোয়ালের মধ্যে বে-আইনি চোলাই মদ লুকিয়ে রাখে—পুলিসের ভয়ে সেখানে বসে মাছ-মাংসের সঙ্গে মদও খায়। আর ব্যভিচারও হয়। বাড়ির কর্মচারী থেকে মাহিন্দার পর্যন্ত তাতে লিপ্ত। স্বৈরিণী হরিজন-কন্যার অভাব নাই ; গোয়ালের মত নির্জন অন্তরালও নাই। অভিযোগ-গুলি অবহেলিত গোপন সত্য। অথচ পাপ, তাতে সন্দেহ নাই। মায়ের মুখ থমথমে হয়ে উঠে। তিনি ছেলেকে বলেন, শুনলে তো ? প্রতিবিধান কর এ সবের। নইলে শেষ পর্যন্ত বাড়ির লক্ষ্মীও বিদায় নেবেন।

আহা মা, তুমি পুণ্যাত্মা। দিব্য বুদ্ধি তোমার !—নাথু মুগ্ধ হয়ে যায় প্রৌঢ়ার কথা শুনে।

প্রৌঢ়া এবার নাথুকে বলেন, এর উপায় বলতে পার ?

পারি মা। সাতটি তুলসীপাতা, সাতটি বেলপাতা, জগন্নাথের মহা-প্রসাদ ; গোরক্ষনাথ শিবের আশীর্বাদী, আর সর্বজয়া—বেনের দোকানে পাবেন মা সর্বজয়া, এই এক সঙ্গে করে পুঁতে দেবেন গোয়ালে। আর গোয়ালের মাটি তুলে দেন ; দেয়ালগুলি নিকিয়ে দেন। আবার মা-সুরভির দয়া হবে। নবলক্ষ পালে গোয়াল আপনার ভরে যাবে।

কিন্তু গোরক্ষনাথের আশীর্বাদ কোথায় পাব ? সে তো অনেক দূর।

আমি দিব মা। আমার কত্তাবাপ গিয়েছিল। সেই আশীর্বাদী তিন পুরুষ ধরে আমাদের আছে মা। বাবা গোরক্ষনাথের নাম নিয়ে নতুন বেলপাতা তাতে দিয়ে রাখি। এক ফোঁটা গঙ্গাজল পরশ করলে পাপ যায়। এক কলসী জল দিলে, সেও গঙ্গাজল হয়ে উঠে।—বলতে বলতেই সে ঝুলি খুলে একটি শুকনো বেলপাতা বার করে আলগোছে মায়ের হাতে ফেলে দেয়।

মা খুশী হয়ে নাথুকে দেন একখানা পুরানো কাপড়, একটা জামা, আট আনা পয়সা এবং আঁচল ভরে চাল, তার সঙ্গে মুড়ি, আর নাড়ু।

নাথুর কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকে না। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, মঙ্গল হবে মা, কল্যাণ হবে মা, ধর্মের সংসার তোমার, তোমার পুণ্যে—যে পাপ বাইরে থেকে আসুক, আগুনের মুখে তুলোর মত, খড়ের মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মা।

মা হাসেন—পরিতৃপ্তিতে স্নিগ্ধ মিষ্ট হাসি।

নাথু বলে, আপনি গোয়ালের মাটি কাটান, দেওয়াল নিকান, তারপর একদিন আমার মা সুরভিকে এনে আপনার গোয়ালে নিশ্বাস ফেলিয়ে পবিত্র করিয়ে দিব, সুরভির গোবরে চোনায় সব দোষ কেটে যাবে মা। আমার বাড়িতে কামধেনু আছেন মা।

কামধেনু!—প্রৌঢ়ার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

হ্যাঁ মা, কামধেনু।

নাথু সগৌরবে কামধেনুর বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, আশিন মাসের সাদা নরম মেঘের মত বরন, তেমনই কোমল আমার মায়ের অঙ্গ। পলা জানেন মা? জানবেন বইকি—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—হীরা মণি মুক্তা প্রবাল, এ সবই তো মায়ের ভাণ্ডারে আছে। তেমনই বরন আমার কামধেনুর 'পালানে'র, মাখনের মত নরম—মোলাম।

বলেই যায় নাথু, বলেই যায়। থামতে চায় না, মনে হয়, বলা হল না।

মা বলেন, তুমি ভাগ্যবান বাবা। এনো একদিন, নিয়ে এসো। মায়ের পুজো করব আমি।

তারপর হঠাৎ বলেন, 'বসোয়া' নিয়ে হিন্দুস্থানীরা বেড়ায়। তুমি তোমার কামধেনু নিয়ে বেড়াও না কেন বাবা? গেরস্তের মঙ্গল হয়। তোমারও মায়ের কৃপায় রোজগার হয়।

রাজার ঘরের মেয়ে—রাজার ঘরের রানী—রাজার মা—রাজবুদ্ধি। মায়ের বুদ্ধি আর মা-সুরভির মাহাত্ম্য। নাথুর সংসার পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কামধেনুর শিঙ দুটিতে সে পিতলের খাপ পরিয়ে দিলে। গলায় ঝুলিয়ে দিলে চার-পাঁচ সারি লাল সবুজ হলুদ কালো পাথরের মালা, তার সঙ্গে ঘুঙুর ঘণ্টা, পিঠে চাপিয়ে দিলে ছাপানো কাপড়ে কড়ি গেঁথে সুন্দর দোলাই। মাকে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরত। পরীক্ষা দেখাত কামধেনুর বাঁট টিপে দুধ বার করে। বেলা দুপুর পর্যন্ত গেরস্তের দোরে দোরে ঘুরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের কোন দীঘির ঘাটে এসে বসে নিজে মুড়ি চিবুত; কামধেনুর সামনে বিছিয়ে দিত একখানি গামছা, তাতে ঢেলে দিত ভিক্ষার চালের কিছু চাল, কামধেনু চালগুলি

খেয়ে ঘাটে জল খেত, তারপর উঠে এসে নাথুর পিঠ চাটত, মাথার চুল চাটত।

*　　　*　　　*

হঠাৎ কি যে হল! জানেন খোদাতায়লা, জানেন ভগবান গোলক-পতি হরি, জানেন পয়গম্বর, জানেন মুনি-ঋষিরা, সাধু মহাত্মারা। তাই বা কেন? নাথুও জানে। জানবে না কেন? পাপ। পাপে ভরে গেল দুনিয়া। পাপের ভার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটতে লাগল। মহামারণ চলতে লাগল, তার আর বিরাম নাই। সে বছর বানে দেশ গেল ডুবে-হেজে। ফিরে বছরে শীতকালে মাঘ মাসের পয়লা পৃথিবী উঠল কেঁপে—ভূমিকম্প। নাথু গিয়েছিল মা-সুরভিকে নিয়ে গ্রামান্তরে। দুপুরবেলা দুনিয়া টলতে লাগল—বাড়ি দুলছে, বড় বড় গাছ দুলছে, দীঘির জল এ-পার থেকে ঢেউ তুলে ও-পারে ছুটছে, ও-পার থেকে হুড়হুড় করে এ-পারে আসছে, আছাড় খেয়ে পড়ছে। মাটির ভেতর থেকে শব্দ উঠছে—যেন দশ-বিশটা রেল-ইঞ্জিন ছুটে আসছে, সে ইঞ্জিনে 'ডেরাইবর' নাই। মা-সুরভি বসে পড়ল মাটির উপর, নাথু উলটে পড়ে গেল। বসুমতী স্থির হলেন, নাথু বাড়ি এল। বাড়িঘরের চিহ্ন নাই, পড়ে আছে শুধু ভাঙা দেওয়াল, আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়া চাল। কোথায় স্ত্রী, কোথায় ছেলেরা, কোনও সন্ধান মিলল না। তিন দিন লাগল মাটি সরাতে; তখন মিলল সন্ধান; পচা গন্ধ বেরিয়েছে তখন।

তার পর বছর এল আরও ভয়ঙ্কর বছর। পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে হল কাঠ, তেতে হল আগুন, আকাশ গেল ঘন-কুয়াশায় ভরে—মেঘ গেল উড়ে, বাতাস হয়ে উঠল আবিল, নদী গেল শুকিয়ে, পুকুরে দীঘিতে জেগে উঠল পাঁক—শুকিয়ে শুকিয়ে তাও ফেটে হল চৌচির। মাটি জল বাতাস দূরের কথা, নাথুর কামধেনুর দুধ গেল শুকিয়ে। একটা গ্রামে ঘুরেও চাল-কাপড়ের বোঝা নাথুর পক্ষে ভারী হয়ে উঠত। তিনটে গ্রামে ঘুরেও নাথুর ঝুলির অর্ধেকের উপর খালি থাকতে আরম্ভ করল!

সেই বছর।

নাথুর পরীক্ষা। নাথুর সামনে এসে দাঁড়াল জগদীশ পটুয়ার বিশ বছরের যুবতী মেয়ে ফুলমণি। ভূমিকম্পে স্ত্রী-পুত্র-ভরা সংসার

মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে জীয়ন্তে, যখন খোদাতালার মর্জিতে ভগবানের কোপে কবরে গেল, তখন আর সংসার সে করবে না বলেই সংকল্প করেছিল। কিন্তু ফুলমণি এল—মুনি-ঋষিদের সামনে স্বর্গের অপ্সরা ঘাড় বেঁকিয়ে, গালে একটি আঙুল রেখে, একটু হেসে যেমন ভাবে এসে দাঁড়াত, তেমনই ভাবে এসে দাঁড়াল। ফুলমণির স্বামী হাঁপানীর রোগী, তার উপর এই দুর্ভিক্ষের বছর সে পেটের জ্বালায় ফুলমণিকে একশো টাকা আর পাঁচ মণ চাল নিয়ে হেফাজদ্দি শেখ পাইকারকে বেচবার ফন্দি করছিল ; কিন্তু ফন্দির ফাঁস এড়িয়ে ফুলমণি পালিয়ে এসেছে বাপের বাড়ি। কুৎসিত কদাকার হেফাজদ্দির তুলনা দিয়ে পটুয়ার মেয়ে ফুলমণি বলেছে, ওর চেয়ে যমদূতেরা কার্তিক।

তার মানে ?

বাঁকা চোখে চেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে ফুলমণি বললে, পটুয়ার ছেলে ছড়া-পাঁচালি গান কর, এর মানে যদি না বুঝ তবে আমার নয়—তোমার মরণ ভাল।

ফুলমণির এমন রূপ কিছু ছিল না, যা ছিল তাও হাঁপানীর রোগী স্বামীর হাতে পড়ে বিশেষ করে এই বছরে একেবারেই গিয়েছে। তবে ফুলমণির রূপে যে দুটি ছিল অপরূপ, সে দুটি এতেও যাবার নয়—যায়ও নাই। ভাসা-ভাসা ডবডবে চোখ আর পাতলা বাঁকানো দুটি ঠোঁট—বিশেষ করে চোখ দেখলে মনে হয়, মেয়েটার চোখে যেন কিসের ঘোর লেগে রয়েছে, চোখের দিকে তাকালে ওই ঘোরের ছোঁয়াচ লেগে যায়।

সেলের গরাদে ধরে নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নাথু। এতক্ষণে সে নড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে এ-পাশ ও-পাশ দেখলে একবার ; তারপর পিছন ফিরে সেলের ভিতরটা একবার ভাল করে দেখলে। সমস্ত ঘরটা একবার ঘুরলে। আবার এসে সে গরাদে ধরে দাঁড়াল। তারপর হাঁকতে লাগল, সিপাহীজী—সিপাহীজী—সিপাহীজী !

কেয়া ?

কয়লা—কয়লা, এক টুকরো পোড়া কয়লা।

কয়লা ? কয়লা কেয়া হোগা ?

ছবি আঁকেগা—ছবি।

আরে! কেয়া, তুমি পাগলা হো গিয়া? যাও, যাও, বইঠো, আরাম করো, নিদ্‌ যাও।

চলে গেল ওয়ার্ডার।

সিপাহীজী—এ সিপাহীজী—! এ সিপাহীজী–ইঃ। এ—হো সিপাহীজী—হোঃ—

ওয়ার্ডারটা ফিরে এসে এক টুকরো পোড়া কয়লা ছুঁড়ে দিয়ে গেল। নাথু সাগ্রহে কুড়িয়ে নিয়ে একটা কোণে বসে ছবি আঁকতে আরম্ভ করলে। চোখ আঁকতে লাগল। 'সুরভিমঙ্গল' গান গেয়ে ভিক্ষে করে দিন কাটালেও নাথু পটুয়ার ছেলে। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত, নাথু চিত্রকর; জাতিতে পটুয়া, ধর্মে ইসলাম। তুলি একেবারে না-ধরা নয়। ছবি আঁকার খেয়ালটাও তার পাগলামি নয়। সে পাগল হয়ে যায় নি। ফুলমণির চোখ দুটো মনে পড়ে বুকে তার নেশা জেগে উঠেছে। খেয়াল হয়েছে, যদ্দিন বাঁচবে,—ফুলমণির চোখ দুটো বসে বসে দেখবে। বড় বড় ডবডবে দুটো চোখ!

ওই চোখের সে কি নেশা! পটুয়ার ছেলে নাথু, ছড়া মঙ্গলগান অনেক জানে। ফুলমণির চোখের কথা বলতে গেলে একটি কথা তার জিভের ডগায় আপনি এসে পড়ে;—'মুনিজনের মন-ভুলানো'। কথা বলতে বলতে ফুলমণির চোখের পাতা ঢলে নেমে আসত, চোখ দুটি হত তখন আধখানা চাঁদের মত; অঘোরে ঘুমোলে ফুলমণির চোখ হত যেন রমজানের চাঁদের ফালি। আর তার দুই পাতলা বাঁকা ঠোঁট—মনে হত, অহরহই যেন মুচকে হাসছে, যে হাসির মানে ঠিক বুঝা যায় না, শুধু আন্দাজ করা যায়। ফুলমণির চোখ দেখে যে নেশা লাগে, সে নেশার ঘোরে মিঠে হাওয়ার আমেজ লাগিয়ে দেয় ওই বাঁকানো পাতলা ঠোঁটের মুচকি হাসি।

মুনি-ঋষির তপস্যা যায়, রাজার রাজ্যনাশ হয়, মোহিনীর মোহে শিব ছোটেন পাগলের মত; স্বর্গের দেবতাদের অভিশাপ ভিন্ন এ নেশার ঘোর কাটে না। নাথু তো ছার মানুষ। আপসোস নাই, খেদ নাই, মোহিনী মায়ায় ভুলেছিল নাথু।

সকালে উঠে খোদাতায়লা রসুলে আল্লার নাম নিচ্ছিল, দয়াময় হরিকে ডাকছিল—ছিষ্টি রক্ষা কর, মেঘ দাও, জল হোক—দুনিয়া ঠাণ্ডা হোক, চাষবাস হোক, শুকনো মাটিতে দুর্বো গজাক, মানুষ বাঁচুক, গোরু-বাছুর বাঁচুক, আমার মা-সুরভি ঘাস খেয়ে বাঁচুক।

কামধেনুর পাঁজরা বেরিয়েছে, বাঁটে আর দুধ নাই। ভিক্ষেয় গিয়ে চাল যা মেলে, তার দু মুঠোতে কামধেনুর পেট ভরে না, বাকি দু মুঠোয় নাথুর পেটেরও জ্বালা ঘোচে না। না, যেদিন যায় সে সেই ভাল-মায়ের বাড়ি, সেদিন সেখানে কিছু মেলে। দু আঁটি খড়, কিছু ভুষি, কিছু চালও খেতে পায় তার সুরভি, সেও আঁচল ভরে মুড়ি পায়, সের-খানেক চালও মেলে। ভাগ্যবানের সংসার, রাজা-জমিদারের বাড়ি, মা-লক্ষ্মীর অচলা বাস সেখানে, দুনিয়ার অভাব সেখানে ঢুকতে পায় না। নদী শুকিয়েছে, নালা শুকিয়েছে, পুকুর শুকিয়েছে, ডোবা ফেটে কাঠ হয়েছে, তাই বলে গঙ্গায় কি জলের অভাব? না, সাগর-সমুদ্রে চড়া পড়েছে? কিন্তু এক বাড়িতে নিত্য তো যাওয়া যায় না। বসে বসেই ভাবছিল নাথু। হঠাৎ এল ওই সর্বনাশী। ফুলমণি এল—হাতে এক মুঠো কাঁচা ঘাসপাতা।

সুরভির মুখে ঘাসের মুঠোটি ধরে দিয়ে, দু হাতে তার গলা জড়িয়ে মুখের পাশে মুখ রেখে সুরভিকে বললে, মাঠে গেলাম সাঁয়ো ঘাস তুলতে সাঁয়ো ঘাস পেলাম না, তোমার জন্য নিয়ে এলাম খুঁটে খুঁটে এই ঘাস মুঠাটি। খাও তুমি। মধ্যে মধ্যে চোখের পাতা যখন সে তুলছিল, তখন নাথুর চোখের উপর পড়ছিল তার দৃষ্টি; যখন চোখের পাতা নামছিল, তখন সে চোখে লাগছিল আধখানা চাঁদের নেশা।

মোহিনী মায়া।

নাথু ভুলে গেল—আল্লাতায়লা পয়গম্বর দয়াময় হরির কাছে কি বলছিল, সে সব কথা। পেটে ভুখের আগুনের দাহ যেন আর বুঝতে পারলে না। সে উঠে গিয়ে ধরলে ফুলমণির হাত।

ফুলমনি উঠে হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়াল, একটু হেলে ঘাড় বেঁকিয়ে তেরচা চোখে চেয়ে বললে, ছি, ছি! পাতলা ঠোঁটে তার সেই মিহি হাসির আমেজ।

নাথু বললে, আমাকে নিকা করবে? বল?

ফুলমণি বললে, সেই হেঁপো রুগী আসছে হেফাজদ্দিকে নিয়ে। এক শো টাকা আর পাঁচ মন চাল আমার দাম। পারবে দিতে?

বলে সে চলে গেল।

মুনির তপস্যা যায়, রাজার রাজত্ব যায়, সে কি তাদের লোকসান মনে হয়? যদি হবে, তবে তারা মাতে কেন? নাথুর আপসোস নাই। সে কামধেনুকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ভাল-মায়ের বাড়ির উঠানে।

আমার মা-সুরভিকে কিনবেন মা?

বেচবে তুমি?—মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

বেচব মা। মায়ের আমার দশা দেখেন। আমার পেট দেখেন, পিঠে গিয়ে ঠেকেছে।

আর বলতে লজ্জা হল নাথুর। বলতে পারলে না ফুলমণির কথা।

আমি তো দু-একবার আগে বলেছি তোমাকে। তখন তো রাজী হও নি। তা বেশ, দিতে যদি চাও—যদি মনে কোন দুঃখ না রেখে দিতে পার, তবেই আমি নিতে পারি।

এই মা-সুরভির গায়ে হাত দিয়ে বলছি মা, হিয়ে খোলসায় দিব আমি। সেবার আমাকে আড়াই শো টাকা দিতে চেয়েছিলেন—সেই দাম দিবেন!

সে বাজারে এ বাজারে তফাত আছে বাবা। দুর্ভিক্ষের বাজারে দশ টাকার জিনিসটা পাঁচ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

স্তব্ধ হয়ে রইল নাথু। এক শো টাকা, পাঁচ মন চাল—দুয়ে হবে এক শো পঞ্চাশ। আড়াই শো টাকার অর্ধেক কত? দু শোর অর্ধেক এক শো, পঞ্চাশের অর্ধেক—

মা বললেন, আচ্ছা, তাই পাবে তুমি। যখন বলেছি নিজে মুখে, তখন তাই দোব। কিন্তু দেখো বাবা, মনে কোন দুঃখ রেখো না।

না না না না। কুনও দুঃখ করব না। কখুনও না। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি মা, না না না।

মায়ের ছেলে ইংরিজী-পড়া বাবু। তিনি বললেন, খেপেছ না কি? আ-ড়া-ই-শো—টাকা?

কামধেনু টাকা পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না বাবা।

কামধেনু? সে আবার কি? ও-সব বাজে কথা।

না না, ও-কথা বলতে নেই। জান কি, সন্তান প্রসব না করে গোরুটি দুগ্ধবতী হয়েছে ?

হেসে বাবুটি যে কথা বলেছিলেন, সে কথা আজও কানের কাছে বাজে নাথুর—'ও-রকম হয় ; ওকে বলে, প্রকৃতির খেয়াল। খবরের কাগজে পড় নি, জোয়ান ছেলে হঠাৎ মেয়ে হয়ে গেল, মেয়ে দেখতে দেখতে বেটাছেলে হয়ে গেল ? কিন্তু তারা তো শিখণ্ডী নয়, অর্জুনও নয়।'

মা রাগ করে নিজের বাক্স থেকে টাকা বার করে দিয়েছিলেন নাথুকে।

টাকা নিয়ে নাথু বাড়ি ফিরল।

পথে কে কেঁদেছিল ?

মনে পড়ে না।

জেলখানায় বসে নাথু ফুলমণির চোখের ছবি আঁকতে আঁকতে কখন ছবি আঁকা ছেড়ে স্থির হয়ে বসে দেওয়ালের দিকে চেয়ে ছিল। দেওয়াল ভেদ করে, শহর পথ মাঠ ঘাট পেরিয়ে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ সে আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। বিস্মিত হয়ে ভাবছিল সে, কই, কান্নার কথা তো মনে পড়ছে না ?

মনে পড়ে বড় বড় ডবডবে দুটি চোখ।

খুব জোরে হেঁটে বাড়ি ফিরেছিল সে।

কোন আপসোস হয় নি তার। ফুলমণিকে নিকা করে সারারাত তাকে নিয়ে জেগে ছিল। আপসোস হল মাসখানেক পর। ফুলমণির নেশাটা যেন কমে এসেছে তখন। মাসখানেক পর সে ভাল-মায়ের বাড়িতে এসে দাঁড়াল। ঠুন-ঠুন করে মন্দিরায় আওয়াজ তুললে।

মা-সুরভিমঙ্গল করবেন মা ? বাড়ির বাছাদের দুধে ভাতে রাখবেন। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে। আহা আহা, গান গোধন-মহিমা মা গো, গোধন-মহিমা —

মা বললেন, এস, ভাল আছ ?

কেঁদে ফেললে নাথু !—না মা, ভাল নাই।

কি হল ?

কি হবে মা? পাতকীর জীবনে সুখ থাকে মা?

চুপ করে থাকেন মা। একটু থেকে চোখ মুছে নাথু আরম্ভ করে গান, "ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে দিতে নারে সীমা"। গান শেষ করে ভিক্ষা নিয়ে নাথু বলে, একবার মা-সুরভিকে যে দেখব মা।

দেখবে বইকি। যাও, দেখ। তুমি তো জান সব।

সুরভিকে দেখে নাথু যেন কেমন হয়ে গেল। এক মাসেই গায়ে ভরে উঠেছে সুরভি। সাদা রোঁয়াগুলি যেন চিকচিক করছে রোদের ছটা পেয়ে। কাঙালের ঘরের মেয়ে বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়ে যেমন রূপে জৌলুসে ফেটে পড়ে, তেমনই চেহারা হয়েছে সুরভির। সুরভি ফিরে তাকালে নাথুর দিকে।

সে চোখ দেখে নাথু ভুলে গেল ফুলমণির চোখ।

তার ইচ্ছে হল, বুক ফাটিয়ে কাঁদে।

ইচ্ছে হল, দড়িটা খুলে সুরভিকে নিয়ে ছুটে পালায়।

হঠাৎ নিজেই সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল! জনহীন মাঠের পথে এসে সে কাঁদলে—খুব জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদলে।

বাড়ি গিয়ে সেদিন ঝগড়া হল ফুলমণির সঙ্গে।

রাত্রে ঘুম হল না। মাঝরাত্রে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়াল।

রাত্রের অন্ধকারে গিয়ে নিঃসাড়ে গোয়ালের দরজা খুললে, কিন্তু—

ভয়ে সে ঘেমে উঠল। ফিরে গিয়ে বসল নিজের দাওয়ার উপর। শেষরাত্রে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন আবার গেল। সেদিন রাত্রে সে মাঠের ধার পর্যন্ত এসে ফিরে গেল।

আবার গেল পরদিন। ভাল-মায়ের বাড়ির ঝি বললে, ওমা, এ যে এবার নিত্যি আসতে লাগল গো!

মা ধমক দিলেন। নাথু লজ্জায় মরে গেল। সেদিন সে সুরভিকে দেখে ফিরে মাটে পুকুরপাড়ে গাছতলায় গামছায় খুঁট খুলে মুড়ি বার করে বসে রইল সামনের দিকে চেয়ে। অনেকক্ষণ পরে এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরে না চিবিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। বহুক্ষণ ধরে মুড়ি খাওয়া শেষ করে ঝোলার ভিতর থেকে লাল খেরুয়ার থলিটি বার করলে।

নাড়লে-চাড়লে। তারপর বাড়ি ফিরল। পথে 'কাঁদর' অর্থাৎ সেই ছোট নদীটির ধারের ঘাটে এসে থমকে দাঁড়ল। অনেকক্ষণ ভেবে সে নদী পার না হয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকল। ঘন জঙ্গল, কত রকমের গাছ, কত রকমের লতা। খুঁজতে লাগল নাথু একটা কিছু।

পটুয়াদের পটের শেষ অংশে আছে ধর্মরাজের দরবার। চিত্রগুপ্ত হিসাব রাখেন পাপ-পুণ্যের। রথে চড়ে পুণ্যাত্মা যায় স্বর্গে। ফুলে ফলে ভরা বাগান, কূলে কূলে ভরা নদী, মণি-মাণিক্য-সাজানো বাড়ি-ঘর। পাপীরা যায় নরকে। আবছা অন্ধকার। নানা ভয়াবহ দৃশ্য। তার মধ্যে আছে একটি জলভরা কুণ্ড। প্রথমটার জল স্থির। দ্বিতীয়টার সে জলে ঢেউ উঠছে—নীচে থেকে যেন কিছু ঠেলে উঠছে। তৃতীয়টার দেখা যায়, জলের উপরে মাথা তুলে উঠেছে সাপ, লিকলিক করছে তার জিভ। নাথুর মনে হল, ঠিক তাই, ঠিক তাই।

গো-চিকিৎসক নাথু। ওষুধও চেনে, বিষও চেনে। জঙ্গলে খুঁজছিল সে বিষ। মারাত্মক বিষ। এক পা এগোয়, থমকে দাঁড়ায়, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে খোঁজে। ওটা কি? হাঁ, এই যে! জঙ্গল থেকে বেরুল সে সন্ধ্যের মুখে।

ফুলমণির ডবডবে ঢলঢলে চোখে, পাতলা বাঁকা ঠোঁটে সেদিন অনেক চুমা খেয়েছিল নাথু। কোন আপসোস হয় নাই তার—এক বিন্দু না।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল নাথু। পাগলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে কয়লাটা। আর সে স্মরণ করতে পারছে না। ভয়ঙ্কর স্মৃতি। উঠে দাঁড়িয়ে গরাদটা ধরে গোরুর মত শব্দ করতে লাগল—প্রায়শ্চিত্তরত গো-হত্যাকারীর মত।

* * *

ডিগ্রীর অর্থাৎ সেলের পাশে পাশে যে ওয়ার্ডার রাউণ্ড দিচ্ছিল, সে ছুটে এল। ওদিক থেকে চীফ ওয়ার্ডার, যার চার্জে তখন জেলখানা, সেও হন্তদন্ত হয়ে এল। কেয়া হুয়া হ্যায়? কেয়া?

নাথু অকস্মাৎ হাম্বা-হাম্বা করে গোরুর ডাক ডাকতে আরম্ভ করেছে, চোখ দুটো রাঙা লাল।

শেলের দরজা খুলে চীপ ওয়ার্ডার বললে, পানি লে আও—পানি। ঢাল্—মাথায় ঢাল্। ফাঁসীর আসামী। আজই হুকুম হয়েছে, এখন দু দিন অনেক রকম করবে ও। মাথায় জল ঢাল্! দরকার হলে কুয়োতলায় নিয়ে যা। জেল-হাসপাতালের ডাক্তারকে খবর দে।

মুখের কাছে মুখ এনে নাথু বললে—যে কয়েদীটি তার মাথায় জল ঢালছিল, তাকেই বললে, পঁচিশ টাকা দোব, কাল রাত্রে বাবুদের যে গাইটা মরেছে, তার চামড়াখানা ছাড়িয়ে আমাকে দিবি।

কয়েদী বিরক্ত হয়ে বললে, কি বলছ যা-তা?

বাবুদের গাঁয়ের ভাগাড় তো তোর। ঐ চামড়াটি আমার চাই।

ওয়ার্ডার এগিয়ে এল। ধমক দিলে, এই!

কম্পাউণ্ডার মেজার-গ্লাসে ওষুধ নিয়ে এসে ঢুকল।

দীর্ঘ ঘুমের পর সকালে শান্ত দৃষ্টিতে সেলের দরজার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে উঠে বসল নাথু। অ্যায়, খোদাতায়ালা, রসুলে আল্লা। লা-এলাহা ইল্লাল্লা। হে ভগবান, হে গোবিন্দ! মাফ কর। আমার সকল পাপ, সকল গোহান মাফির মঞ্জুর হোক। আমার ফাঁসি হোক। মা-সুরভিকে আমি বিষ দিয়ে মেরেছি। কেউ সন্দেহ করে নাই, করবার উপায় ছিল না, গভীর রাত্রে গিয়ে সুরভির ডাবায় বিষ রেখে এসেছিল। নিজে দু দিন খায় নি। তার জন্যে আমার ফাঁসি হোক। এ ছাড়া আর কোনও পাপ নাথু করে নাই। মুচীদের কাছে সুরভির চামড়াখানি সে কিনেছিল। কিনেছিল, তার ইচ্ছা ছিল ওই চামড়খানি নিয়ে ঘর থেকে সে চলে যাবে। ফকির সন্ন্যাসী হয়ে যাবে!

এল হেফাজ্জদি পাইকার। চামড়ার কারবার করে। মুচীদের কাছে খবর পেয়ে এল।

চামড়া কিনেছিস?

হ্যাঁ।

ব্যবসা করছিস নাকি? আমার সঙ্গে কারবার কর্। কিনে রাখবি চামড়া। আমি আসব মাঝে মাঝে। আমার ঘোড়া আছে।

হেসেছিল নাথু। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে হেফাজদিকে বলেছিল, শুধু মরা চামড়া কিনবে, না, হাড়-মাস চামড়া সব—মানে জ্যান্ত কিনবে? ফুলমণিকে চাই?

দিবি?

হ্যাঁ।

কত?

দু শো।

তাই।

রাত্রে এস গাড়ি কিংবা ডুলি নিয়ে।

ফুলমণিকে বেচে সেই টাকায় তার চামড়ার ব্যবসা। ফুলমণির পাপ। ফুলমণির জন্য সে মহাপাপ করেছে। সকল পাপের মূল ফুলমণি। কিন্তু তবু ফুলমণির জন্যে সে কাঁদে। কতদিন সে কেঁদেছে।

বেশ চলছিল। টাকা পয়সা অনেক হয়েছিল তার। দেশ গ্রাম ছেড়ে বাজারে বড় রেল-জংশনে আস্তানা গেড়েছিল। ডাঁই করে রাখত চামড়া। চালান দিত এখানে ওখানে। শান্তশিষ্ট মানুষ। রোজ সকালে উঠে বলত, আমার গোনাহ মাফির মঞ্জুর হোক আল্লা। পাপ খণ্ডন কর ভগবান। ধীরে ধীরে সব সে ভুলেও আসছিল।

হঠাৎ—হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে গেল।

একটা শীর্ণ লোক একগাছা দড়ি হাতে এসে দাঁড়িয়ে গোরুর মত ডাকতে লাগল—হাম্বা—অ্যা-ম্-বা। গোরু-মারা! গোহত্যাকারী! লোকটা গোহত্যা করেছে, তাই ওই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। মানুষের ভাষার বদলে, গোরুর ভাষায়—মানুষের কাছে নিজের পাপের স্বীকারোক্তি জানিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। সুরভিমঙ্গল গান ছিল নাথুর একদিনের পেশা। সে জানে, সব জানে।

লোকটা গোরুর ডাক ডেকে দোরে দাঁড়াতেই নাথু চমকে উঠল!

লোকটা আবার ডাকলে, অ্যা-ম্-বা—

স্থান কাল পাত্র সব গোলমাল হয়ে গেল নাথুর। মুহূর্তে পাগল হয়ে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার উপর। বহুকষ্টে লোকজনে মিলে নাথুকে টেনে তুললে। লোকটার বুকের উপর বসে দুই হাতে সে তার গলাটা নির্মমভাবে চেপে ধরেছিল; লোকটার জিভ বেরিয়ে

এসেছে, চোখ দুটো হয়ে উঠেছে রক্তের ড্যালা। মরে গিয়েছে লোকটা।

ফাঁসিতে তার দুঃখ নাই। গোহত্যাকারীকে মেরে ফাঁসি যেতে কোনও আক্ষেপ নাই তার। তবে ফাঁসিটা গোরুর আঁতে হলেই তার আর কোন খেদ থাকত না।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা—রসুল আল্লা মহম্মদ, হে ভগবান, মা-সুরভি তোমাদের মরজি সব।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে এপাশ ওপাশ চেয়ে কালকের কয়লাটা তুলে নিল। কি করবে সে এ কদিন? কি নিয়ে থাকবে? কাল দুটো চোখ এঁকেছিল। সে দুটোর দিকে তাকিয়ে আজ সে চমকে উঠল। ফুলমণির চোখ তো হয় নাই। এ যে গোরুর চোখ হয়েছে। সুরভির চোখ! তা বেশ হয়েছে। ওরই পাশে আজ ফুলমণির ডবডবে ঢলঢলে চোখ দুটি আঁকবে। ও-চোখের নেশা বেঁচে থাকতে ছাড়তে পারবে না নাথু।

সমাপ্ত

শ্রেষ্ঠ-গল্প পর্যায়ের অন্যান্য বই

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প
বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প
মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ গল্প
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রতি বছরের সেরা গল্প

১৯৫৩র সেরা গল্প
সম্পাদক—নবেন্দু ঘোষ

১৯৫৪র সেরা গল্প
সম্পাদক—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়